মেমোয়ার্স অফ মিডনাইট

সিডনি সেলডন

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

গল্প শুরুর আগে....................2

অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক....................142

সমস্যার পাহাড়....................270

একেবারে উলঙ্গ....................376

প্রতিনিধি দল....................472

অ্যারেস্ট....................529

গল্প শুরুর আগে

কাউলুন, মে, ১৯৪৯–মনে হবে এটা বুঝি একটা অ্যাকসিডেন্ট। তুমি তার ব্যবস্থা করতে পারবে কী?

কথাগুলো অপমানের মতো বিঁধছে। লোকটা বুঝতে পারল, তাকে রাগিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছে করেই কথাগুলো বলা হচ্ছে। রাস্তার যে-কোনো অ্যামেচারের কাছে এই প্রশ্ন করলে সেটা মানানসই হত। সে উত্তর দিতে চাইল হাসতে হাসতো, নিজের ওপর আগাধ আস্থা আছে আমার। আমি এটা ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি কী চাইছেন? অ্যাকসিডেন্টটা ঘরের মধ্যে হোক? আমি কি মেয়েটিকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব? নাক ভেঙে দেব তার? সে এখন মারসেইলসে আছে। নাকি তাকে বেশি মদ খাইয়ে মাতালিনী করে দেব। বাথটবে ডুবে মরবে সে। অবশ্য হেরোইনের ওভারডোজ দেওয়া যেতে পারে অথবা মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়বে। কেউ তার মৃত্যুর কারণ জানতে পারবে না। নাকি আপনি চাইছেন, খেলাটা বাইরে হোক? ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট, বিমান দুর্ঘটনা, সমুদ্রে জাহাজ ডুবে যাওয়া–কোনটা আপনার পছন্দ?

এসবই সে বলতে পারত, কিন্তু বলেনি। তার কারণ হল, উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটিকে সে ভয় পায়। ওই লোকটি সম্পর্কে সে অনেক হাড় হিমকরা গল্পকথা শুনেছে। গল্পগুলো বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে বলল–হ্যাঁ স্যার, আমি দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করতে পারি। এবং কেউ সেই রহস্যটা উদঘাটন করতে পারবে না।

কথাগুলো বলে সে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ।

১৮৪০ সালে একদল চিনা ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এই বাড়িটা তৈরি করেছিল। এই বাড়িটার অবস্থিতি কাউলুন নামে একটি প্রাচীর আচ্ছাদিত শহরের মধ্যে। এই বাড়ির তিনতলাতে চলেছে কথোপকথন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেওয়ালগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাইরে আর-এক সারি দেওয়াল আছে। কোনো অচেনা আগন্তুক চট করে এখানে ঢুকতে পারে না। এখানে কারা ঘোরাঘুরি করে? দুবৃত্তের দল, যারা মদ খায়, ধর্ষক এবং ড্রাগ আসক্তরা। চারপাশে সরু অলিন্দ, অন্ধকার সিঁড়ি। বিষণ্নতার ছাপ। ট্যুরিস্টদের সাবধান করে দেওয়া হয়। পুলিশরাও টু টাউ সিন স্ট্রিটের এই অন্ধকার গলতার ভেতর প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। শহরের উপকণ্ঠে এ এক আশ্চর্য গোলকধাঁধা! জানালায় গেলে শহরের দৃশ্যপট পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। নানা ভাষার কিচিরমিচির শুনতে পাওয়া যায়। এরা সবাই ওই প্রাচীর আচ্ছাদিত শহরের বাসিন্দা।

শেষ অব্দি উনি বললেন ঠিক আছে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি, কোনটা সহজ পদ্ধতি এবং নিরাপদ–তোমাকেই তা ঠিক করতে হবে।

–স্যার, যাকে সরিয়ে দিতে হবে, সে কি কাউলুনে আছে?

লন্ডনে। তার নাম ক্যাথেরিন, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।

.

একটি লিমুজিন, পেছনে পেছনে আর একটি গাড়ি আছে, দুজন সশস্ত্র বডিগার্ড। মানুষটিকে লাস্টকার ওয়েডর হাউসে নিয়ে গেল। জায়গাটা সিম সাঁ সুই অঞ্চলে। বু হাউস খুলে দেওয়া হয় বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। রাষ্ট্রপ্রধানরা মাঝে মধ্যে এদেশে ভ্রমণ করতে আসেন। আসেন চলচ্চিত্র জগতের মহানায়কেরা, করপোরেশনের প্রেসিডেন্টরা। প্রশাসক তাদের সেবা করতে পেরে গৌরব এবং আনন্দবোধ করে। ছ বছর আগে একটি তরুণী মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে যায়। সে একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধির সাথে তার খদ্দের সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। পরদিন সকালে অ্যাবারডিন বন্দরে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। কে বা কারা রহস্যজনকভাবে মেয়েটিকে দু টুকরো করে ফেলেছে। কথায় বলে ৪ হাউসে সবকিছু পাওয়া যায়। অস্পর্শিত কুমারী কন্যা, পুরুষ, সমকামী, তারা মানুষ এবং মনুষ্যতর জীবদের সন্তুষ্টি দিতে পারে। এখানে দশম শতাব্দীর কিছু বিশেষ খেলা এখনও চলে। তার নাম ইশিনপো। ব্লু হাউসকে নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বর্গ বলা যেতে পারে।

লোকটি এক জোড়া যমজ কন্যাকে ডাক দিলেন। আহা, স্বর্গের দুই রুপসী বুঝি। তাদের অসামান্য লাবণ্যবতী শরীরের সুষমা দেখার মতো। কোনো ব্যাপারে ছুতমার্গ নেই। গতবার যখন উনি ৪ হাউসে এসেছিলেন, যে আরাম আর সন্তুষ্টি পেয়েছিলেন। এবার কি তা ছাড়িয়ে যাবে? বাথটবে সুগন্ধিত ঈষদুষ্ণ জল। টাইল ভিজে গেছে। তিনি আনন্দ পেলেন উত্থিত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। তারপর...

তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। সন্তুষ্টি এবং আরামের সর্বোচ্চ শিখর অব্দি পৌঁছে গেছেন। এবার ওঁনাকে মডিরোডে যেতে হবে। লিমুজিন এগিয়ে চলেছে। লিমুজিনের বন্ধ জানালা দিয়ে উনি আকাশের দিকে তাকালেন। যে শহর কখনও ঘুমোয় না, তার আলোেগুলো জ্বলছে। চিনারা এই শহরটির নামকরণ করেছে নটি ড্রাগনের শহর বলে। তার মনে হল, তিনি বোধহয় এই শহরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। কিন্তু এই শহরটাকে দেখলে কেন এত বিষণ্ন বলে মনে হয়? তার মনে তো বিষণ্নতার কোনো জায়গা নেই!

.

ওঁনারা মডি রোডে পৌঁছে গেলেন।

তাওবাদী পাদরি অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখে মনে হয়, তিনি বুঝি পুরোনো পার্চমেন্ট কাগজ দিয়ে তৈরি এক ভৌতিক মূর্তি। তার পরনে বিবর্ণ প্রাচ্যদেশীয় জোব্বা। তার সাদফিনফিনে দাড়ি বাতাসে উড়ছে।

তিনি দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন। হাতে হাত রেখে ঝকানি দিলেন। কাঠের তৈরি একটা কাপে কাঠি দিয়ে কীসব করলেন। তারপর নেমে এল নীরবতা। তাওবাদী পাদরি মশাই কারও সাথে আলোচনা করলেন। আগন্তুকের দিকে তাকালেন। থামা থামা ইংরেজিতে বললেন–ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনি আপনার সবথেকে খতরনাক শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

ভদ্রলোকের মনে আনন্দের বিচ্ছুরণ। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি জানেন, এই ব্যাপারের অন্তরালে কোনো সত্য লুকিয়ে নেই। একে উপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সামনে। তিনি কিছু বললেন না। কারণ আজ তার জন্মদিন।

তাওপন্থী ভদ্রলোক বললেন–ফেংশুই আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

শয়তান লোকটি চোখ বন্ধ করলেন। কাজে সফল হতে হলে সকলের আশীর্বাদ দরকার।

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। তিনি এখন লিমুজিনে বসে আছেন। হংকং এয়ারপোর্ট কাইট্রাকের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সেখানে তার নিজস্ব উড়ানপাখি অপেক্ষা করছে, তাকে সাবধানে এবং নিরাপদে এথেন্সে নিয়ে যাবে বলে।

.

০১.

আওয়ানিনা, গ্রিস; জুলাই ১৯৪৮।

প্রতি রাতে এমনই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। মেয়েটির মনে হয়, সে যেন হ্রদের জলে তলিয়ে যাচ্ছে। তীব্র আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসে। ঝড় উঠেছে। একজন পুরুষ এবং একজন নারী তাকে বরফ ঠান্ডা শীতল জলে ডুবিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছে। প্রত্যেক রাতে ঠিক এমন সময়েই শিহরিতা অবস্থায় মেয়েটির ঘুম ভাঙে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার সমস্ত শরীর ভিজে যায় ঘামে।

সে জানে না, তার অতীত জীবনে এমন কোনো দৃশ্য আছে কিনা। সে ইংরেজি বলতে পারে, কিন্তু সে জানে না তার পরিচয় কী। কোথা থেকে সে গ্রিসে এসেছে, কীভাবে এই ছোট্ট কারমেলাইট কনভেন্টে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

সময় এগিয়ে চলে। আজ তার অস্তিত্বে অতীতের কোনো স্মৃতির বিচ্ছুরণ নেই। নেই কোনো অচেনা অজানা অনুভূতি। কেবল কিছু কিছু ভৌতিক সত্তা মাঝে মধ্যে মিছিল করে এগিয়ে যায়। সে দ্রুত মুখের দিকে তাকায়। শনাক্তকরণের চেষ্টা করে বা পরীক্ষা করে। তারপর? অযাচিত কিছু মুহূর্ত। আবার সেই দ্বিধা দ্বন্দ্বের সমুদ্রে সাঁতার কাট।

প্রথমদিকে সে নিজেকে প্রশ্ন করত। কারমেলাইট সন্ন্যাসিনীদের সাথেও কথা বলত। তারা সর্বত্যাগী, তাঁরা সহনশীলা। তারা নৈঃশব্দ্যের পরিবেশ বজায় রাখতে চাইতেন। শেষ অব্দি মেয়েটিকে শুধুমাত্র সিস্টার থেরেসার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হল। ওই প্রবীণা ভদ্রমহিলা এখানকার মাদার সুপিরিয়র।

–আপনি কি জানেন আমি কে?

না, তোমার আসল পরিচয় আমার জানা নেই। সিস্টার থেরেসা বলেছিলেন। আমি কীভাবে এখানে এসেছি?

আওয়ানিনা নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। সেই গ্রামটির অবস্থান পাহাড়ের সানুদেশে। গতবছর প্রচণ্ড ঝড়ের সময় তোমাকে পাওয়া গেছে একটা ছোট্ট নিমজ্জমান নৌকোতে। নৌকোটা প্রায় ডুবতে বসেছিল। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে আমাদের দুজন সিস্টারের চোখে তুমি ধরা পড়েছিলে।

–কিন্তু, আমি আগে কোথায় ছিলাম?

–আমি জানি না, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। এই উত্তরে মেয়েটি শান্ত হতে পারেনি। বারবার সে মাথা নেড়ে প্রশ্ন করেছে কেউ কি আমার অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি? কেউ কি আমার আসল পরিচয় জানতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেনি?

সিস্টার থেরেসা মাথা নেড়ে বলেছেন, এখনও পর্যন্ত কেউ তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি।

এই উত্তর শুনে মেয়েটির মনের মধ্যে জেগেছে হতাশা। সে আবার বলেছে- খবরের কাগজের পাতার তারা কি আমার নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা ছাপেনি?

–তুমি তো জানো, বাইরের পৃথিবীর সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয় না। আমরা ঈশ্বরের কারুণ্যের কথাই মনে রাখি। হে আমার প্রিয় কন্যা, তার করুণা না থাকলে তুমি কি আজ বেঁচে থাকতে?

সংক্ষিপ্ত সংলাপ শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে মেয়েটি মাঝে মধ্যেই কেমন অসহায় বোধ করত। নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকত সে। মাস এগিয়ে গেছে। সে তার হারানো আত্ম শক্তি আবার ফেরত পেয়েছে। চেহারাটা হয়ে উঠেছে লাবণ্যবতী।

এখন সে বড়ো বড়ো পা ফেলে এখানে-সেখানে যেতে পারে। অবশ্য কনভেন্টের চার দেওয়ালের মধ্যে পুষ্পিত উদ্যানেই তার বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। কনভেন্টের এই

জগৎ বিস্তীর্ণ। এখানে একটা অলৌকিক আভা আছে। বিকেল বেলা সুগন্ধি বাতাস বয়ে যায়, লেবু এবং দ্রাক্ষার গন্ধ নিয়ে।

এখানকার বাতাবরণ শান্ত, স্নিগ্ধ এবং মনোরম। তবে মেয়েটির মনে শান্তি নেই কেন? সে ভাবে আমি হারিয়ে গেছি। কেউ আমাকে ভালোেবসে না। কিন্তু কেন? আমি কি কোনো খারাপ কাজ করেছি? আমি কে? বারবার এই প্রশ্নটা তাকে আঘাত করে।

চোখ বন্ধ করলেই কিছু ছবি সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। ছবিগুলোর অন্তরালে কী আছে, সে জানে না। একদিন সকালে একটা অদ্ভুত দৃশ্যকল্প দেখতে পেল সে। দেখল, একটি ঘরের মধ্যে সে বসে আছে। উলঙ্গ অবস্থায় এক পুরুষ এসে তাকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে। এটা কি স্বপ্ন? নাকি এমন একটা ঘটনা, তার হারানো জীবনে ঘটে গিয়েছিল। ওই পুরুষটি কে? ওই পুরুষটির সঙ্গে কি তার বিয়ে হয়েছিল? তার কি স্বামী ছিল? তার হাতে বিয়ের আংটি নেই। আসলে এখানে তার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। সিস্টার থেরেসা তাকে একটি ব্ল্যাক অর্ডার দিয়েছেন। এটি সম্মানের যোগ্য। দিয়েছেন একটি স্মারক, ছোট্ট সোনালি পাখি, চোখ দুটি রক্তরুবির। ডানা দুটি দুপাশে প্রসারিত।

মেয়েটির কেবলই মনে হয়, তার কোনো নাম নেই। সে এই জগতে এক অজানা আগন্তুক। কেউ তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না। কোনো মনোবিশারদ তার সাথে কথা বলে না। তার মনের এই অশান্ত অবস্থার অবসান কী করে হবে? কী করে সে তার হারানো অতীতের কথা জানতে পারবে?

–তখনও ওই মূর্তিগুলো আসে। অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া ছবি। অতি দ্রুত চোখের সামনে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার মন শান্ত হল। মনে হল, সে বুঝি বিরাট একটা জিগস ধাঁধার সামনে বসে আছে। খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলোর আলাদা কোনো অনুভূতি নেই। একদিন একটা অদ্ভুত ছবি দেখল সে। অবশ্যই মনে মনে। স্টুডিয়োতে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সকলের গায়ে সামরিক পোশাক। এটি কি কোনো চলচ্চিত্র? আমি কি একজন অভিনেত্রী ছিলাম? নাকি আমার ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কী সেই দায়িত্ব?

একজন সৈন্য এসে তার হাতে প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ রেখেছে। সে হেসে বলেছে একদিন এই উপহারের জন্য তোমাকে কড়া মাশুল দিতে হবে।

দু রাত কেটে গেছে। মেয়েটি আবার সেই একই পুরুষকে স্বপ্নে দেখেছে। এয়ারপোর্টে গিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। পুরুষটির সাথে আর তার দেখা হবে না। বিচ্ছেদের বেদনা করুণ রাগিণীতে বেজে উঠেছে।

এই স্বপ্ন দেখার পর সে সব অর্থে তার মানসিক শান্তি হারিয়েছে। এখন সে আর শুধু স্বপ্ন দেখে না। এখন চারপাশে সে অনেক মানুষকে দেখতে পায়। তার অতীত হাসতে থাকে। আমাকে জানতেই হবে, কী আমার আসল পরিচয়।

একদিন মাঝরাতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। অবচেতন মন থেকে কে যেন বলে উঠল- হ্যাঁ, আমি আমার আসল নামটা খুঁজে পেয়েছি। আমি হলাম ক্যাথেরিন, আমি হলাম ক্যাথরিন আলেকজান্ডার।

.

০২.

এথেন্স, গ্রিস।

মানচিত্রে চোখ মেলে দিলে আমরা কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সাম্রাজ্য দেখতে পাব না। তবে মানুষজন বলে থাকে, তিনি এখানকার সবথেকে শক্তিশালী মানুষ। সারা পৃথিবীর দু-তিন জন ধনীর মধ্যে তিনি অন্যতম। তার ক্ষমতার হাত যে কত দূর বিস্তৃত কেউ তা জানে না। তার কোনো রাজকীয় পদক নেই। নেই কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব। তবে তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কার্ডিনাল, রাষ্ট্রদূত এবং রাজাদের নিয়মিত কেনাবেচা করেন। তার নিজস্ব গুপ্তচর সর্বত্র ছড়ানো আছে। তিনি অন্তত বারোটি দেশকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি হলেন এক শক্তিশালী পুরুষ। মনের ভেতর আকাঙ্ক্ষার তেজ আছে। শরীরটা সুগঠিত। চেহারা খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু প্রসারিত। কাঁধের ওপর পৌরুষের ছাপ আছে। গায়ের রং তামাটে। গ্রিকদেশীয় মানুষদের মতো উন্নত নাক। চোখ দুটিতে অলিভ-কালোর আভা। মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি বুঝি তৃষিত বাজপাখি। যখন কোনো সমস্যা হয়, তখন তাকে। সব থেকে বেশি আনন্দিত দেখা যায়। আটটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। বিশ্বের অন্যতম শিল্পসংগ্রাহক। একাধিক নিজস্ব উড়ানপাখি আছে তার। বারোটি অ্যাপার্টমেন্টের মালিক। বিশ্বের নানা প্রান্তে নিজস্ব ভিলা আছে তার। এককথায় তিনি সৌন্দর্যের উপাসক। তিনি জানেন, রূপসী মেয়েদের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। অত্যন্ত অনুগত প্রেমিক হিসেবে তার সুনাম আছে। তাঁর বৈষয়িক অভিযানের মতোই চিত্তাকর্ষক তার প্রেমের উপাখ্যান।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে ভাবতে ভালোবাসেন। কোলোনাকি এবং পাসারাতে তিনি যে ভিলা কিনেছেন, সেখানে সর্বদা সাদা-নীল গ্রিক পতাকা উড়তে দেখা যায়। তার নিজস্ব দ্বীপ আছে। কিন্তু তিনি করে দেন না। তিনি সাধারণ মানুষের উপর প্রযুক্ত আইনের পরোয়া করেন না। কারণ তার রক্তে ঈশ্বরের রক্ত প্রবহমান।

যারা ডেমিরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁরা সকলেই তার সাহায্যপ্রার্থী। কেউ হয়তো একটা ব্যবসা করতে চাইছেন, অর্থ দরকার। কেউ চাইছেন, দান হিসেবে কিছু টাকা। অথবা কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছেন। ডেমিরিস কাউকেই ফেরান না। তিনি মানুষের সাথে কথা বলতে ভালোবাসেন। তাঁর বিশ্লেষণী মন আছে, আছে সন্দিগ্ধ দুটি চোখ। তিনি জানেন, কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। তার জীবনের উদ্দেশ্য হল বন্ধুদের কাছে ডাকবে, শত্রুদের আরও কাছে।

এইভাবেই তিনি জীবনের চলার পথে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। একটা অদ্ভুত সমোহনী ক্ষমতা আছে তার। আছে আভিজাত্য ভরা চাউনি। তিনি পৃথিবীর রাজা–এমন একটি মনোভাব পোষণ করেন। তিনি জানেন, অপরাধীর চোখে অত্যাচারের ছায়া কাঁপে না। তিনি আরও জানেন, সকলের দিকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়।

তিনি সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করেন। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ আছে, যার বাংলায় প্রতিশব্দ হল সকলের প্রতি সমান আচরণ করা। এই শব্দটির কাছাকাছি আর একটি শব্দ আছে। তার অর্থ, সকলকে অবিশ্বাস করা। ডেমিরিস এই দুটি শব্দের প্রতি অগাধ

আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি জানেন, সকলকে ভালোবাসতে হবে। আর ভালোবাসার মানুষ যে কোনো মুহূর্তে শক্ত হতে পারে। তাতে কী? ডেমিরিসের মনে আঙ্কিক বিশুদ্ধতা আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ছাড়া তিনি কোনো কিছুকেই গ্রহণ করেন না। ডেমিরিস শান্তভাবে কাজ করতে পারেন। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তাঁর প্রতিভার সর্বাত্মক বিকাশ ঘটে যায়। তিনি মাকড়সার মতো জাল বিছাতে পারেন। এইভাবেই তিনি বৈরিতার সম্পর্ক শেষ করেন। শত্রুদের হত্যা করেন, নিঃশব্দে এবং নিপুণভাবে।

ডেমিরিস সময় কাটাতে ভালোবাসেন বন্ধু এবং শত্রুদের মধ্যে। শুভানুধ্যায়ীদের সাহচর্য পছন্দ করেন। তাদের হত্যা করেন। তাদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের ব্যক্তিত্ব, কেমন, সেটা দেখে নেন। তারা কতখানি শক্তিশালী, তার প্রতি দৃকপাত করেন। খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন তাদের দুর্বলতার দিকচিহ্নগুলিকে।

এক সন্ধ্যায় একটি নৈশভোজের আসরে ডেমিরিসের সাথে দেখা হয়ে গেল একজন মোশন-পিকচার-এর প্রোডিউসারের। ভদ্রলোক কথাচ্ছলে তাকে অবজ্ঞা করে সম্বোধন করেন। ডেমিরিস কিন্তু কিছুই বলেননি। ইতিমধ্যে দু-বছর কেটে গেল। ভদ্রলোক তখন । আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক অভিনেত্রীকে তার পরবর্তী ছবির জন্য সই করিয়েছেন। এই ছবিটা শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করল না। কেননা ডেমিরিস এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। দেখা গেল, ওই সুন্দরী অভিনেত্রী তার প্রমোদ তরণীর বাসিন্দা হয়েছে।

ডেমিরিস হাসতে হাসতে বলেছিলেন, চলো আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করি।

মেয়েটি রাজি হয়েছিল। মধুচন্দ্রিমায় দিন কাটিয়েছিল। যদিও বিয়ে হয়নি। তাদের শুধু ছবিটি বন্ধ হয়ে গেল। প্রযোজক দেউলিয়া হয়ে গেলেন।

ডেমিরিস এইভাবেই অদ্ভুত খেলা খেলতে ভালোবাসেন। কোনো ব্যাপারে অযথা তাড়াহুড়ো করেন না। অনুমান শক্তি আছে তার। নিখুঁত প্রকল্পনা রচনা করতে পারেন। এবং শেষ অব্দি প্রকল্প শেষ করেন সুন্দরভাবে। মনে হয়, তার বুঝি কোনো শত্রু নেই। কারণ তার শত্রু হবার মতো সাহস কার আছে! তবে জীবনে চলার পথে অনেক মানুষকেই তিনি শত্রু হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

সব ব্যাপারে নজর দেবার মতো অদ্ভুত সহজাত ক্ষমতা আছে তার। তিনি কখনও কোনো ক্ষতচিহ্নকে ছোটো করে দেখেন না। কারও কাছে সাহায্য পেলে সেটা মনে রাখেন। এক সময় একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী তাকে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে সেই মৎস্যজীবীকে তিনি বেশ কটি জাহাজ কিনে দিয়েছিলেন, একদা এক বারাঙ্গনা তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষ অব্দি দেখা গেল সে এক বিরাট অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হয়েছে। বেচারি জানতেও পারেনি, কে এই কাজটি করল।

ডেমিরিসের জীবনকাহিনী শোনার মতো। পিরায়ুসের এক স্টিভোডারের ছেলে হিসেবে পৃথিবীর বুকে তার আগমন ঘটে গিয়েছিল। চোদ্দোজন ভাইবোন ছিলেন তারা সব মিলিয়ে। টেবিলে যথেষ্ট খাবারের দানা থাকত না।

প্রথম চেতন প্রহর থেকেই কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বুঝতে পেরেছিলেন, ব্যবসা ছাড়া উন্নতি হবে না। স্কুলের পড়াশোনার পর এটা-সেটা করে টাকা আয় করার চেষ্টা করেন।

ষোলো বছর বয়সে যথেষ্ট পয়সা জমিয়ে তিনি একটা খাবারের দোকান খুললেন ডক অঞ্চলে। সঙ্গে নিলেন এক বৃদ্ধ পার্টনারকে। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসাটা ফুলে ফেঁপে আকাশ ছুঁল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডেমিরিসের সাথে প্রতারণা করলেন। ডেমিরিস দশ বছর অপেক্ষা করার পর সেই লোকটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এইভাবে তখন থেকেই ডেমিরিসের মনে ভবিষ্যৎ উচ্চাশার আগুন জ্বলতে থাকে। সমস্ত রাত তিনি দু চোখের পাতা এক করতে পারতেন না। অন্ধকারে তার চোখ দুটি জ্বলে উঠত। মনে মনে তিনি এই শপথবাক্য উচ্চারণ করতেন–আমাকে যথেষ্ট বড়োলোক হতে হবে। আমাকে নাম করতে হবে। একদিন পৃথিবীর সব জায়গায় আমার নাম পৌঁছে যাবে!

ঘুম আসত না। সারা রাত এইভাবেই অনিদ্রার সাথে সহবাস করে কেটে যেত। কিন্তু কীভাবে বড়োলোক হবার দরজাটা খুলে যাবে ডেমিরিস তা জানতেন না। শুধু জানতেন, একদিন স্বপ্ন সফল হবেই!

ডেমিরিসের সতেরোতম জন্মদিন। সৌদি আরবের তৈলখনি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পড়লেন। হঠাৎ ভবিষ্যতের ম্যাজিক দরজাটা তার সামনে খুলে গেল। তিনি সরাসরি বাবার · কাছে গেলেন। বললেন আমি সৌদি আরবে যাব, তেলের খনিতে কাজ করব।

–তেলের খনি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

–কিছুই জানি না আমি, ওখানে গিয়ে শিখব।

একমাস কেটে গেল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তখন তার লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছেন।

.

ট্রান্সকনটিনেন্টাল অয়েল করপোরেশন। বিদেশ থেকে যেসব কর্মচারী আসছে, তাদের সাথে দু-বছরের শর্ত করা হচ্ছে। ডেমিরিসকেও এই শর্তে সই করতে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন সৌদি আরবে বছরের পর বছর কাটাতে। এখানকার বাতাসে টাকা ওড়ে। এখানে বসে একটা সুস্থির ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে হবে। চোখ বন্ধ করলে আরব্য উপন্যাসের গল্পকথা মনে পড়ত তার। আরব দেশ, প্রাচ্য দেশের রহস্য, রোমাঞ্চ আর কুহক মায়ার প্রতীক। এখানে যৌনবতী রমণীদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাদের সূর্যদীপ্ত তামাটে শরীর, থেকে উঠে আসে ভালোবাসার স্বেদ। তবে বাস্তব কি এতটাই সুন্দর!

গরমকালের এক প্রত্যুষে ডেমিরিস ফাদিলিতে এলেন। চারপাশে ধু-ধু মরুপ্রান্তর। ইতস্তত দুএকটা বাড়ি চোখে পড়ছে। দু-একটা ছোটোখাটো পাহাড়। হাজার হাজার নীচু শ্রেণীর মানুষ কাজ করছে। সকলেই আরবদেশীয়। চোখে মুখে কালো কাপড় ঢাকা মেয়েরা হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, সর্বত্র দুর্গন্ধ আর ময়লার হাতছানি।

.

ডেমিরিস একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এখানে ম্যানেজার জে জে ম্যাকইনটায়ারের অফিস।

ম্যাকইটায়ার ওই যুবা পুরুষটির দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তুমিও এখানে এলে?

-হ্যাঁ, স্যার।

–এর আগে তুমি কোনো দিন তেলের খনিতে কাজ করেছ বাবা?

এক মুহূর্তের জন্য কী যেন ভেবে নিলেন ডেমিরিস, মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ অব্দি বললেন–না, স্যার।

ম্যাকইনটায়ার ঢোক গিলে বললেন–তুমি কি এই জায়গাটাকে ভালোবাসতে পারবে? অনেক দূর থেকে এসেছ। খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। কোনো মহিলার সাথে কথা বলতে পারবে না। কারও দিকে তাকালে তোমার চোখ গেলে দেওয়া হবে। রাতে শুয়ে শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখবে। কিন্তু পয়সাটা ভালোই।

আমি এখানে থাকতে এসেছি। সব কিছু নিজে দেখব। ডেমিরিস বলেছিলেন। উৎকণ্ঠা এবং ব্যগ্রতা ঝরছিল তার কণ্ঠস্বরে।

মনে রেখো, এটি কিন্তু মুসলমানদের দেশ। এখানে অ্যালকোহল পাবে না। চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হবে। প্রথমবার ডান হাত, দ্বিতীয়বার বাঁ হাত। তৃতীয়বার তোমার একটা পা কেটে নেওয়া হবে। কাউকে হত্যা করলে তোমার শিরচ্ছেদ করা হবে।

–আমি কাউকে মারতে আসিনি।

ম্যাকইনটায়ার বললেন ঠিক আছে, চাকরিটা পাকা হল।

.

কম্পাউন্ডটি ছিল টাওয়ার অব ব্যাবেল। বারোটি বিভিন্ন দেশের মানুষ কথা বলছে। যে যার ভাষা বলার চেষ্টা করছে। ডেমিরিস সকলের কথা শো◌োনার চেষ্টা করলেন। একটির পর একটি ভাষা শিখতে থাকলেন। মনে হত, এই শূন্য দেশে ওরাই তার আপনার লোক। এখানে অনেক কিছু আছে। আবার কিছুই নেই। একটির পর একটি বৈদ্যুতিক কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। বড়ো বড়ো বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আরও অনেক কিছু লাগবে। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা। তার জন্য মুটে মজুর এবং আরও লোক। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র। সেদিনের তরুণ ডেমিরিসের মনে হয়েছিল, এখানে একশোটা কাজ আছে। একশ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। নানা ধরনের রোগ। মশা মাছির যুগপৎ আক্রমণ। ধুলো ধোয়া আর অন্ধকার। আমাশা, কলেরা আরও কত কী। এখানে সর্বত্র মৃত্যুর হাহাকার, তারই মাঝে বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদ। তরল সোনা! আহা, কেন এই বৈপরীত্য!

কিছু কিছু মানুষ ড্রিলিং-এর কাজে যুক্ত ছিলেন। এসেছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। সার্ভেয়ার এবং ইনজিনিয়াররা। ডেকে আনা হয়েছে অয়েল কেমিস্টদের। তারা সকলেই মার্কিন দেশের বাসিন্দা। উঁচুপদে তাদের একাধিপত্য, তবে খাটাখাটনির কাজে স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বেশির ভাগ সময়টাই বাইরে কাটান। হাতে কলমে কাজ শেখার চেষ্টা করেন। প্রশ্ন করতে থাকেন। যদিও উত্তর কোথায় পাবেন, তা জানেন না। গরম বালি জল শুষে নিচ্ছে। ডেমিরিস বুঝতে পারলেন, ড্রিল করার দুটো পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৌতূহল বশে একদিন একজন ড্রিলারের কাছে পৌঁছে গেলেন। বেচারি ড্রিলার, একশো তিরিশ ফুট ডিরিক নিয়ে কাজ করছিল।

ডেমিরিস জানতে চাইলেন- আমি বুঝতে পারছি না, কেন এখানে দু-ধরনের পদ্ধতি চালু আছে?

ড্রিলার জবাব দিয়েছিলেন–একটাকে কেবল টুল বলা হয়, অপরটি রোটারি। আমাকে এখন রোটারি পদ্ধতিতে কাজ করতে হচ্ছে। দুটো পদ্ধতির মধ্যে দারুণ সাদৃশ্য আছে।

–ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন কী?

-হ্যাঁ, তোমাকে গর্ত খুঁড়তে হবে। ধীরে ধীরে গর্তের দৈর্ঘ্য বাড়াতে হবে। শেষ অব্দি গর্তটা নীচে অনেক দুর জায়গায় পৌঁছে যাবে। এটাই হল ডিরিক পদ্ধতি। আমি জানি, ডিরিক সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। তাই তো?

না, স্যার।

–সপ্তদশ শতকের এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম শুনেছ কী?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

না।

–চিনারা বহু বছর আগে এইভাবে মাটি খুঁড়ে জল বের করত। তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল একেবারে বিজ্ঞানসম্মত। আজকের দিনে পঁচাশিভাগ খননের কাজ তাদেরই পদ্ধতিতে করা হয়।

ব্যাপারটা কী? জানার জন্য ডেমিরিস আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

মানুষটি বলতে থাকেন এখানে ছোট্ট একটি গর্ত করা হয়। অনেকটা এই ধরনের গর্ত। তারপর একটি স্টিলের রডকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মেশিনের সাহায্যে রডটিকে আরও নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রডটি ফিরে এলে বুঝতে পারা যায়, ওখানে তরল সোনা আছে কিনা।

ডেমিরিস খুশি হয়েছেন। ব্যাপারটা জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। উনি বললেন আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল খুবই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু এখন এখানে এসে বুঝতে পারছি, এর মধ্যে জটিল ব্যাপার কিছু নেই। তবে মাথাটা পরিষ্কার রাখতে হবে। মনটাও তরতাজা থাকবে। তা না হলে ঠিক মতো কাজটা হবে না। ড্রিলিং করার সময় রোটারি কী কাজ করে?

প্রত্যেকটি শ্রমিকের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। ড্রিল পাইপ ফুটো হয়ে গেছে, সেটিকে সারিয়ে ফেলে, আরও কত হাজার রকমের কাজ!!

–স্যার, মনে হচ্ছে এবার আমাদের ভাগ্যের চাকাটা ঘুরবে। আমরা বোধহয় নিজেরাই একটা তেলের খনি কিনে নেব।

ধন্যবাদ, এবার কি আমি কাজে যেতে পারি?

.

একদিন সকালে ডেমিরিস মন দিয়ে কাজ করছিলেন। তৈলকূপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তিনি দেখলেন, ড্রিলার মাটিতে গর্ত করছে না। তার বদলে এখানে সেখানে আঁচড় কাটছে।

ডেমিরিস জানতে চেয়ে ছিলেন আমাকে মাফ করবেন, এটা কী ধরনের কাজ হচ্ছে?

এই কথা শুনে ড্রিলারের ভুরু দুটি কুঁচকে দিয়েছিল। এই পদ্ধতিকে বলে কোরিং পদ্ধতি। আমরা পাথরের টুকরোগুলোকে বিশ্লেষণ করব। দেখ, তার মধ্যে তেল থাকার সম্ভবনা কতখানি।

বাঃ, বেশ ভালো পদ্ধতি তো!

.

কাজ এগিয়ে চলেছে সহজ স্বাভাবিকভাবে। ডেমিরিস এখন আরও পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছেন। মাঝে মধ্যেই তিনি ড্রিলারের সঙ্গে সময় কাটান। তিনি জানেন, এই ড্রিলারের হাতে আসল চাবিকাঠি। কোথায় কোথায় গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। সে ব্যাপারগুলো ভালোভাবে

পর্যবেক্ষণ করেন। ড্রিলারদের একটা আশ্চর্য অনুমান শক্তি আছে। ওপর থেকে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারে। মাটির নীচে কোথায় তরল সোনা আছে।

–এটা কী ধরনের কাজ, আমায় বুঝিয়ে বলবে?

–একে প্রস্তাবিত ছিদ্র করা বলা হয়। আমরা এই ছিদ্র করি নানা কাজের জন্য। এর মাধ্যমে কোম্পানির অনেক অর্থ বাঁচানো যেতে পারে।

কতকিছু শেখবার আছে, ডেমিরিস ভাবতে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই রহস্যময় জগতে তিনি এক অজানা আগন্তুক।

এভাবেই কথাবার্তা এগিয়ে চলে। প্রশ্নোত্তরের পালা। ডেমিরিসের কেবলই মনে হয়, এত অসংখ্য প্রশ্ন রয়ে গেছে, সব কটির উত্তর তিনি এখনও জানতে পারেননি।

একদিন কথায় কথায় ডেমিরিস জানতে চাইলেন-একটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলবে ভাই, তোমরা কী করে বোঝ, কোথায় ড্রিল করতে হবে?

আমাদের সঙ্গে অনেক ভূতাত্ত্বিক আছেন। তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তারা এই ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের দিন এগিয়ে চলেছে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি খনি অঞ্চলে চলে আসেন। কাজ করতে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না। সূর্য ডোবা পর্যন্ত একনাগাড়ে তাঁর কাজ চলতে থাকে। কত কিছু করার আছে। ড্রাইভিং তাঁর প্রধান কাজ।

এর পাশাপাশি তেল উৎখননের আরও অনেকগুলি কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। ভাবতে অবাক লাগে, গনগনে আগুন-আঁচে তার ক্লান্তি আসে না। দিনরাত তাকে বিষাক্ত বিষ নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়।

জে জে ম্যাকইনটায়ার ডেমিরিসের কাছে সত্যি কথাই বলেছিলেন- খাবার অত্যন্ত বাজে। থাকার ব্যবস্থাও ভালো নয়। রাত্রিবেলা কিছুই করার থাকে না। ডেমিরিসের কেবলই মনে হয়, কেউ বুঝি তার সমস্ত শরীরে অসংখ্য ফুটো করে দিয়েছে। সেই ফুটোগুলো বালি দিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তবে মরুভূমিকে আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ বলে মনে হলেও তার একটা স্বতন্ত্র প্রাণস্পন্দন আছে। এই প্রাণস্পন্দন আমাদের সকলকে অনুভব করতে হয়। বালি ঢুকে পড়ে তার শরীরের সর্বত্র। জামাকাপড় বালিতে বালিতে কেমন যেন হয়ে যায়। সে সময় অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

মাঝে মধ্যে বালির ঝড় ওঠে। দিনের পর দিন একই রকম ঝড় চলতে থাকে। দিন বললে ভুল হবে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে থাকে তার অস্তিত্ব। এই সময় অনেক মানুষ পাগল হয়ে যায়। হয়ে যাওয়ারই কথা। বাতাবরণ এমন হলে মানুষ বেঁচে থাকবে কেমন করে?

ডেমিরিস কিন্তু এর মধ্যেও কাজ করতে থাকেন। এই ব্যাপারে তার অদম্য উৎসাহ। মাঝে মধ্যেই তিনি যেচে গিয়ে প্রশ্ন করেন, আজ কী কাজ করতে হবে?

অফিসাররা তার উৎসাহ দেখে অবাক হয়ে যান। তারা অনেক সময় বারণ করেন। কিন্তু তরুণ ডেমিরিসের হাতে বেশি সময় নেই। তিনি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

সৌদি আরবের এই অঞ্চলে এসেছেন। তাকে অল্প সময়ের মধ্যে আরও সচেতন হয়ে উঠতে হবে। আরও কর্তব্যনিষ্ঠ। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যে সম্পর্কে তিনি এখনও শিক্ষানবিশ। তার ইচ্ছা, সব কিছু জেনে তবেই আরব মুলুক ত্যাগ করবেন তিনি।

নানা জায়গাতে নিত্যনতুন তৈলকূপ খননের কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির এই অফুরান ভাণ্ডারে কত লক্ষ ডলার লুকিয়ে আছে ভাবতে অবাক লাগে! নতুন করে তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গেল আবু হাদরিয়া এবং কাতিফ ও হারাদে। সেখানে শুরু হল কর্মযজ্ঞ। নিস্তব্ধ প্রহর সচকিত হয়ে উঠল। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছে কাজের খোঁজে।

.

সেই সময় দুজন নতুন আগন্তুক এলেন। এক ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ এবং তার স্ত্রী। হেনরি পটার, ষাট বছর বয়স হয়েছে। তার বউ সাইবিল, তিরিশ বছরের এক তরতাজা তরুণী। সাইবিল পটারকে এক অসাধারণ রূপবতী রমণী হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে কী? আপাত দৃষ্টিতে সেখানে মনে হয় তার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই। সবথেকে বিশ্রী তার গলার খরখরে আওয়াজ। ফাদিলিতে থাকার সময় তাকে অনন্যা সুন্দরী বলা হত। হেনরি পটারকে সব সময় নিত্যনতুন তৈল খনি উদ্ভাবনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বেচারি সাইবিল, তার যৌবন দিন কাটে একা একা। নিদারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

ডেমিরিসের ওপর একটি নতুন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল। তাকে এখন মাঝে মধ্যেই পটার দম্পতির কোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে। ঘরদোর আগোগাল হয়ে পড়ে আছে। ডেমিরিসকে বলা হয়ছে, সবকিছু গুছিয়ে দিতে।

সাইবিল পটার তার খ্যানখ্যানে গলায় অভিযোগ করলেন, এমন বাজে জায়গা আমি কোথাও দেখিনি। জীবনটা আমার একেবারে নরক হয়ে গেল। হেনরি তো কাজপাগল মানুষ। এইসব পাণ্ডববর্জিত জায়গাগুলো বেছে বেছে নির্বাচন করে। আমি জানি না কীভাবে এখানে থাকব!

ডেমিরিস বলেছিলেন, আপনার স্বামী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। আপনি কি জানেন কোম্পানির কাছে এই কাজটা কতখানি দরকারি?

ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে সাইবিলের চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠল। সাইবিল তীক্ষ্ণ ঝাঝালো কণ্ঠস্বরে বললেন আমার স্বামী কিছুই করছেন না। তুমি কি বুঝতে পারছ, আসল কাজে সে কতটা ফাঁকি দেয়?

ঢোঁক গিলে ডেমিরিস জানালেন না, ম্যাডাম, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কৌতুকের চিহ্ন লেগে আছে সাইবিলের কণ্ঠস্বরে।

সাইবিল জানতে চাইলেন–তোমার নাম কী?

–ডেমিরিস, ম্যাডাম। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস।

বন্ধুরা তোমাকে কী নামে ডাকে? এত বড়ো খটমট নাম। উচ্চারণ করতে গেলে তো চারটে দাঁত ভেঙে যাবে।

আন্তরিক হবার চেষ্টা করছেন সাইবিল। ডেমিরিস তার আচরণে অন্য কিছুর পরশ পাচ্ছেন কী?

কোস্টা।

-ঠিক আছে কোস্টা, মনে হচ্ছে আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু হতে পারব। আমাদের দুজনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সাধারণ, তাই নয় কি?

আপনি কী বলতে চাইছেন?

আবার দুষ্টু হাসির চিহ্ন ফুটে ওঠে সাইবিলের ঠোঁটের গোড়ায়। সাইবিল বললেন–পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব।

ডেমিরিস আমতা আমতা করতে থাকেন আমাকে কাজে যেতে হবে।

বেশ কয়েকটি সপ্তাহ কেটে গেছে। সাইবিল পটার মাঝে মধ্যেই এই তরুণকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তিনি বোধহয় ডেমিরিসের কাছে কিছু প্রার্থনা করছেন। কিন্তু কী? নিঃসঙ্গতার সাহচর্য? শারীরিক উত্তাপ? নাকি আরও কিছু?

একদিন সাইবিল বললেন–হেনরি আজ সকালে চলে গেল। কবে যে ড্রিলিং-এর ভূতটা ওর ঘাড় থেকে নামবে? এই করে করে বাড়িতে ড্রিলিং-এর কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। লোকটা!

এই অভিযোগের কোনো জবাব ছিল না ডেমিরিসের কাছে। ডেমিরিস জানেন, ওই ভূগোলবিশারদদের কাঁধে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির কাছে তিনি অপরিহার্য মানুষ। ডেমিরিস তখনও পর্যন্ত পটারের স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে পড়তে চাননি। এই কাজে মন দিলে, নিজের আসল কাজটাকে অবহেলা করা হবে। তবে ডেমিরিস জানেন না, কীভাবে তাকে ফাঁদে ফেলা হবে। তিনি তখনও জানেন না, পরবর্তীকালে কোন্ কাজটা তার জীবনের সবথেকে বড়ো কাজ হয়ে দেখা দেবে। তিনি কেবল জানেন, তেলের খনির মধ্যে একটা চমৎকার ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে। ডেমিরিসের আপ্রাণ ইচ্ছে, তিনিও ওই ভবিষ্যৎ দিশারীর অংশীদার হবেন।

.

তখন মধ্যরাত। হঠাৎ সাইবিল পটারের ডাক এল ডেমিরিসের কাছে। ডেমিরিস পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলেন কমপাউন্ডের ধারে। দরজাতে শব্দ করলেন।

সাইবিল পটারের মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কাম ইন।

ডেমিরিস ভেতরে প্রবেশ করলেন। সাইবিলকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলার পরনে পাতলা ফিনফিনে রাতপোশাক। দুর্ভাগ্যবশত ওই পোশাক তাঁর উত্থিত যৌবনের কোনো কিছুই আচ্ছাদিত করতে পারেনি।

আমতা আমতা করে ডেমিরিস বলতে থাকেন ম্যাডাম, আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? নাকি আমি ভুল শুনেছি?

–ভেতরে এসো কোস্টা। এমন ইতস্তত ভাব করছ কেন? দেখ তো বিছানার ধারের এই আলোটা কাজ করছে না কেন?

ডেমিরিস চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন। ল্যাম্পের কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি সেটা পরীক্ষা করে বললেন–ম্যাডাম, এখানে তো কোনো বালবই নেই।

সহসা তার মনে হল, নরম তুলতুলে দুটি বুক তাকে আদরের আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। মিসেস পটার... কোনো রকমে সেঁক গিলে ডেমিরিস উচ্চারণ করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ঠোঁট দুটি তখন বন্দি হয়েছে মিসেস পটারের ঠোঁট দুটির সাথে। পটার উন্মত্ত আক্রোশে ডেমিরিসকে টানতে টানতে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। হায় ভাগ্য! ডেমিরিস বুঝতে পারলেন, পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে, যার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

অতি দ্রুত ডেমিরিসকে উলঙ্গ করা হল। তখন শ্রীমতী পটারের মুখ থেকে সুখী শিকারের শব্দ বেরিয়ে আসছে।

হায় ঈশ্বর, তোমার এটা কত বড়ো! দেখ, তোমার খোকা আমার মুঠোর মধ্যে কেমন লাফালাফি করতে শুরু করেছে।

একটু বাদে চরম শিহরণের মুহূর্ত এসে গেল। সবকিছু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাইবিল বলতে থাকেন, ওঃ ডার্লিং, আমি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি!

–ডেমিরিস অনেকক্ষণ সেখানে শুয়েছিলেন। একা একা এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এ আমি কী করলাম? যদি পটার আমার এই গোপন অভিসারের খবর পান, তাহলে কী হবে? তাহলে আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে।

মনে মনে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন ডেমিরিস। তাকে এই অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে সাইবিল পটার হিহি করে হেসে উঠেছেন–মনে রেখো সোনা, তোমার আমার এই অভিসারের ব্যাপারটা পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না। দেখো, কী কায়দা করে এটাকে আমি লুকিয়ে রাখব।

.

কয়েক মাস ধরে শরীরের খেলা চলতেই থাকে। ডেমিরিস কিছুতেই সাইবিলকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। ভাগ্যটা তার ভালোই বলতে হবে। সাইবিলের স্বামী বেচারাকে বছরের বেশির ভাগ দিন বাইরে বাইরে থাকতে হয়। নতুন নতুন বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। ডেমিরিস সেই সুযোগটাই নিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমি কি সাইবিলকে প্রতারণা করছি? ব্যাপারটা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যদি এটা শুধু দেহের সংযোগ হত, তা হলে ভুলে যেতে এক মুহূর্তে লাগত না।

কিন্তু সাইবিল সত্যি সত্যি ডেমিরিসকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছেন। সাইবিলের নিঃসঙ্গ দাম্পত্য জীবনে। ডেমিরিস তার অদম্য পৌরুষ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

–এখানে তোমার মতো একজন পুরুষের দেখা পাওয়া যাবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! চলো, তুমি আর আমি ইংল্যান্ডে ফিরে যাই।

একদিন হাসতে হাসতে সাইবিল বলেছিলেন। এই কথা শুনে ডেমিরিসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তিনি জবাব দিয়ে ছিলেন–ম্যাডাম, আমি তো গ্রিসের বাসিন্দা।

ডেমিরিসের উলঙ্গ শরীরের এখানে-সেখানে হাত চিরুনি চালাতে চালাতে সাইবিল বলেছিলেন- এখন আর নও। তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবে। আমি হেনরিকে ডিভোর্স করব। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

সাইবিলের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে, ডেমিরিস ঢোক গিলতে থাকেন। তার মনে সহসা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তিনি কোনোক্রমে বলেন- সাইবিল, আমার হাতে কোনো পয়সা নেই...

এবার সাইবিলের লালাভ দুটি ঠোঁট নেমে এল ডেমিরিসের বুকের ওপর–সেটা কোনো সমস্যা নয় সোনা। আমি জানি, তুমি টাকা আয় করতে পারবে। তুমি হবে আমার প্রিয়তম।

কী করে জানলেন?

সাইবিল বিছানার ওপর বসলেন–গতরাতে হেনরি আমাকে সবকিছু বলেছে। হেনরি একটা বিরাট নতুন তৈলখনি আবিষ্কার করেছে। হেনরি ভীষণ চালাক। এই ব্যাপারে সে খুবই উত্তেজিত। ডাইরিতে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে রেখেছে। বলেছে, তার এই রিপোর্টটা সকালবেলায় পোস্ট করতে হবে। আমার হাতে রিপোটটা আছে। তুমি একবার দেখবে নাকি?

এই কথা শুনে ডেমিরিসের হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে। এমনই একটা সোনার সুযোগের সন্ধানে এতদিন তিনি মগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন–হ্যাঁ, আমি একবার দেখব।

সাইবিল বিছানা থেকে উঠে গেলেন। টেবিলের কাছে গেলেন। একটা ম্যানিলা এনভেলপ বের করলেন। সেটা হাতে নিয়ে বিছানাতে ফিরে এলেন।

–এটা খোলো।

কিছুক্ষণের জন্য ডেমিরিসের মনে সতোর উদয় হয়েছিল। তিনি ইতস্তত করতে থাকেন। কাঁপা কাঁপা হাতে এনভেলপটা খুলে ফেললেন। ভেতরের কাগজগুলো বাইরে নিয়ে এলেন। ভেতরের এই সাদা কাগজের মধ্যেই হয়তো কালো অক্ষরে লেখা আছে ডেমিরিসের ভবিষ্যৎ সোনালি জীবনের সম্ভাবনা। মোট পাঁচটি পাতা। প্রত্যেকটি পাতার ওপর ডেমিরিস চোখ বোলালেন। প্রত্যেকটি শব্দ আলাদাভাবে পড়তে চেষ্টা করলেন।

–এই খবরগুলো তোমার কাছে দরকারি কী?

কথাগুলো ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল। নতুন একটি তৈলখনি সম্পর্কে এক বিজ্ঞানীর অভিমত। এই খনিটি আবিষ্কৃত হলে মানবসভ্যতার ইতিহাস একেবারে পালটে যাবে।

ডেমিরিস তবুও তার আনন্দ মুখের ভাবে প্রকাশ করলেন না। তখনও পর্যন্ত তিনি সাইবিলকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। আসলে ডেমিরিসের চরিত্রটাই হল এ ধরনের। পৃথিবীর কোনো মানুষকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তার মনের আকাশে সব সময় সন্দেহের মেঘের আনাগোনা।

তিনি আমতা আমতা করে বলতে থাকেন- হতে পারে, হতে পারে...

–তাহলে? তুমি এই প্রকল্পে যোগ দেবে কী? সাইবিল জানতে চাইলেন, তাহলে আমাদের হাতে অপরিমাপ্য অর্থ আসবে। আসবে না?

ডেমিরিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–ব্যাপারটা অত সোজা নয় ম্যাডাম।

-কেন?

ডেমিরিস বোঝাবার চেষ্টা করেন অনেক টাকা লাগবে। ওই জায়গাটা কিনতে হবে। এত টাকা কে দেবে? বলা যেতে পারে, এটা একধরনের জুয়া খেলা।

চকিতে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কথা মনে পড়ে গেল বেচারি ডেমিরিসের। তিনশো ডলার! ফুঃ, এ দিয়ে কোনো কাজ হয় কী?

–তা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না সোনামণি। আমার স্বামী যথেষ্ট বড়োলোক। আমি একটা চেক লিখব। পাঁচ হাজার ডলার হলে কাজ হবে কী?

নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস! তিনি বললেন- হ্যাঁ, ওই টাকাটা পেলে আপাতত কাজ করা যেতে পারে।

–ভেবে দেখ, এই টাকাটা আমি লগ্নি করতে চাইছি। আমাদের যৌথ জীবনের নিরাপত্তার জন্য। ডার্লিং, তুমি আমার কথার আসল অর্থ কী বুঝতে পারছ তো?

ডেমিরিস অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো বসেছিলেন। তারপর তিনি বললেন–সাইবিল, এই রিপোর্টটাকে আপনি দু-একদিন এখানে রাখতে পারবেন কী?

-হ্যাঁ, আমি শুক্রবার পর্যন্ত এটা রেখে দেব। আশা করি, তার মধ্যেই কাজটা তোমার হয়ে যাবে ডার্লিং।

ডেমিরিস মাথা নাড়লেন–হ্যাঁ, শুক্রবার..অনেক সময় আমার হাতে থাকবে।

.

পাঁচ হাজার ডলার ডেমিরিসের হাতে এসেছে। না, এটা দান নয়, এটা নেহাতই একটা ঋণ–ডেমিরিস টাকাটা পেয়ে মনে মনে প্রবোধ দিলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ভাগ্যের চাকা এবার সত্যি সত্যি ঘুরতে শুরু করেছে। যেখানে সম্ভাব্য তৈলখনিটির অবস্থান, ডেমিরিস সেখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। তারপর, জায়গাটা কিনেই

ফেললেন। কয়েকটা মাস এগিয়ে গেল। কাজ শুরু হল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তখন এক কোটিপতিতে পরিণত হয়েছেন।

তিনি কিন্তু কথা রেখেছেন। সাইবিল পটারের হাতে পাঁচ হাজার ডলার তুলে দিয়েছেন। আর সঙ্গে দিয়েছেন একটা নতুন রাতপোশাক। তারপর গ্রিসে ফিরে গেছেন। সাইবিলের সাথে আর কখনও ডেমিরিসের দেখা হয়নি।

.

০৩.

একটা তত্ত্ব আমাদের মানতেই হবে। প্রকৃতি কোনো কিছুই নষ্ট করে না। প্রতিটি শব্দ আমরা উচ্চারণ করি, প্রতিটি কথা আমরা বলি, তারা মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও থেকে যায়। একদিন অবশেষে সবকিছু অবিকৃতভাবে ফিরে আসে।

রেডিয়ো আবিষ্কৃত হবার আগে কী হয়েছে? মানুষ তখন জগৎ সম্পর্কে কী ভাবত? মানুষ কি জানত ইথার নামে কোনো তরঙ্গ আছে? আমরা কি জানতাম, আমাদের গান এবং কবিতা এভাবেই একদিন ফিরে ফিরে আসবে? মানুষ একদিন আরও উন্নত হবে। সে হয়তো সময় ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ফিরে যাবে আগের দিনগুলোতে। লিংকনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ শুনতে পাবে। সেক্সপিয়ারের গলাও শুনতে পাবে সে, পাহাড়ের ওপর যে তত্ত্বকথা শোনানো হয়েছিল।

.

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার তার অতীত জীবনের নানা শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু এই শব্দগুলো এমন জড়ানো যে তার আসল অর্থ কী, সেটা সে বুঝতে পারে না। এই শব্দগুলো তার উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দেয়।

-ক্যাথি, তুমি কি জানো তুমি একজন বিশেষ স্বভাবের মেয়ে। তোমার সাথে আমার যখন প্রথম দেখা হয়েছিল...।

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। আমি ডির্ভোস চেয়েছি। আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি।

-তোমার সাথে যে খারাপ ব্যবহার আমি করেছি, তার জন্য আমি আন্তরিক অনুতপ্ত। ব্যাপারটা তোমাকে বলতে এসেছি...

–সে কিন্তু আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে।

–কে তোমাকে মারতে চেয়েছে?

–আমার স্বামী।

এভাবেই শব্দের অন্তহীন মিছিল এগিয়ে চলে। শব্দের ঝড় ওঠে। ক্যাথেরিনের কেবলই মনে হয়, সে বুঝি একটা ক্যালিডোস্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ রেখেছে, একটির পর একটি প্রতিচ্ছবি তৈরি হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। জীবনটা কি এক চলমান ক্যালিডোস্কোপ?

কনভেন্টের পরিবেশ কিন্তু চমৎকার। এককথায় একে এক শান্ত স্নিগ্ধ স্বর্গ বলা যেতে পারে। কিন্তু সহসা ক্যাথেরিনের মনে হল, তাকে বোধহয় কোনো বদ্ধ কামরায় জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। সে কনভেন্টের বাসিন্দা হতে চায়নি। হতে পারে তার একটা বর্ণ উজ্জ্বল অতীত আছে। হতে পারে অতীতটা খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু সেখানে ঘটনার প্রবাহ আছে।

ক্যাথেরিন জানে না, সে এখন কী করবে বা কোথায় যাবে।

অদ্ভুত নিয়মে এই কনভেন্টের মধ্যে কোনো আয়না রাখা হয়নি। সন্ন্যাসিনীরা যাতে তাদের রূপ-যৌবন সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে, তাই এই কঠিন কঠোর নির্দেশনামা। কিন্তু একটা টলটলে পুকুরের জল আছে বাগানের পাশে। ক্যাথেরিন সেই জলের দিকে সহসা তাকায় না। তাকালে হয়তো অবাক হয়ে যাবে সে। জলে তার মুখের প্রতিচ্ছবি পড়বে। সেই ছবি দেখলে মনটা হু হু করবে।

একদিন সকালবেলা সে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে হল তার, জলের কাছে মুখ আনল। আহা, এত সুন্দর একটি মুখ! সূর্যতাপে দৃপ্ত, একরাশ কালো চুলের বন্যা, শরীরের কোথাও খুঁত নেই, উজ্জ্বল দুটি চোখ ধুসরতায় আচ্ছাদিত। কিন্তু সেই চোখে বিষণ্নতার বেদনা।

একটু বাদে আর একটা মুখ ভেসে উঠল সেখানে। একটা মস্ত বড়ো মুখ। এক সুন্দরী রমণীকে দেখা যাচ্ছে। তখনও তিরিশ বছর বয়স হয়নি তার। এই রমণী কে? তার অতীত নেই এবং ভবিষ্যৎ নেই। সে একজন হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। এই মুখটি কি

ক্যাথেরিনের? কাউকে দরকার, যে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, ক্যাথেরিন চিন্তা করতে থাকে, যার কাছে আমি মনের সব কিছু খুলে বলতে পারব। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ক্যাথেরিন কখন পৌঁছে গেছে সিস্টার থেরেসার অফিসে।

–সিস্টার!

–এসো, এসো। সিস্টারের আন্তরিক সম্ভাষণ।

–আমি...মনে করছি একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেব। হয়তো ডাক্তারই বলতে পারবেন আমার আসল পরিচয়, তাই নয় কি?

সিস্টার থেরেসা ক্যাথেরিনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

– এখানে বসো।

ক্যাথেরিন শক্ত চেয়ারের ওপর বসতে বাধ্য হল। সামনে পুরোনো দিনের একটা ডেস্ক রয়েছে।

সিস্টার থেরেসা বলতে থাকেন–ভগবানই তোমার চিকিৎসক। ঠিক সময়ে তিনি সব কথা বলবেন। এখানে আমরা তো বাইরের কোনো লোককে আসার অনুমতি দেব না। এটাই এখানকার নিয়ম।

ক্যাথেরিনের মনে হঠাৎ স্মৃতির বিচ্ছুরণ। একটা আবছা মূর্তি চোখে পড়ল। কনভেন্টের ধারে বাগানের পাশ দিয়ে কে এগিয়ে চলেছে!

কে যেন বারবার তাকে বলছে–তুমি এখানকার বাসিন্দা নও। তোমাকে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে।

সমস্যা হল, সে কোথায় থাকবে?

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে, ধোঁয়াশায় ভরা।

শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন মরিয়া হয়ে বলে বসল- সিস্টার থেরেসা, আমাকে ক্ষমা করবেন, মনে হচ্ছে কারোর সাহায্য দরকার। আমি আর পারছি না। কতদিন এইভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটাব বলতে পারেন?

ক্যাথেরিনের শব্দগুলো সিস্টার থেরেসাকে আঘাত করেছে। তিনি ভালোভাবে ক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকালেন। তার মুখ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন–তুমি কি এই জায়গা থেকে চলে যেতে চাইছ? কিন্তু তুমি যাবে কোথায়?

–আমি জানি না, ভবিষ্যতের কোনো কিছুই আমি জানি না।

–ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করব। আমরা এ বিষয়ে আবার কথা বলব।

–অনেক, অনেক ধন্যবাদ সিস্টার।

.

ক্যাথেরিন চলে গেল। সিস্টার থেরেসা তার ডেস্কে এসে বসলেন। এখনও অনেকক্ষণ তাকে ঘাড় গুঁজে কাজ করতে হবে। তবুও মনের মধ্যে ক্যাথেরিনের সমস্যাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব একটা সহজ নয়। শেষ অব্দি তিনি একটুকরো কাগজ নিলেন। কলম নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করলেন।

তিনি লিখেছিলেন–শ্রদ্ধেয় মহাশয়, এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা আপনাকে জানানো উচিত বলেই আমি মনে করছি। আমাদের কোনো এক বন্ধু বলছে, মেয়েটি কনভেন্ট ছেড়ে যেতে চাইছে। এই অবস্থায় আমি কী করব, তাড়াতাড়ি আমাকে জানান।–

.

উনি এই নোটটা পড়লেন। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসলেন। এই শব্দগুলোর মধ্যে একটা হারানো সংকেত লুকিয়ে আছে। তা হলে? ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার আবার মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসতে চাইছে? ব্যাপারটা খুবই খারাপ। আমি তো তার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছি। সাবধানে এবং খুবই সাবধানে।

এখন কী হবে? কনভেন্ট থেকে ক্যাথেরিনকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ডেমিরিস সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার সিস্টার থেরেসার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

.

পরদিন সকালবেলা ডেমিরিসের সোফেয়ার তাকে আওয়ানিনাতে নিয়ে গেল। গ্রামের পথ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবলেন। আহা, যখন প্রথম দেখা হয়েছিল, ক্যাথেরিনের শারীরিক সৌন্দর্য দেখে তিনি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ক্যাথেরিনকে তখন খুবই উজ্জ্বল স্বভাবের এক তরুণী বলে মনে হত। সব সময় উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। এত উৎসাহ এল কোথা থেকে? তার মধ্যে সবই ছিল,... ডেমিরিস চিন্তার জগতে ভেসে গেলেন। তারপর? তারপর কী যেন হয়ে গেল। ক্যাথেরিনের সাথে এক পাইলটের বিয়ে হল। এই বিয়েটাই ক্যাথেরিনের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। একরাতের মধ্যে ক্যাথেরিনের বয়স দশ বছর বেড়ে গেল। সে একটা থলথলে কদর্য মহিলাতে পরিণত হল। ডেমিরিস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, হায়, এইভাবে একজন মানুষের জীবন নষ্ট হয় কী করে?

.

সিস্টার থেরেসার অফিসে ডেমিরিস প্রবেশ করলেন।

এই ব্যাপারে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু ওই মেয়েটি এখানে আর থাকতে চাইছে না। এমন আচরণ করছে, যাতে অন্য আবাসিকদের অসুবিধা হচ্ছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে সিস্টার থেরেসা বলতে থাকেন।

–আপনি ঠিক কাজই করেছেন, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বললেন, মেয়েটি কি তার ফেলে আসা দিনযাপনের কথা কিছু বলেছে আপনাকে?

সিস্টার থেরেসা মাথা নাড়লেন। না, এখনও পর্যন্ত কিছু বলেনি। তিনি জানলার কাছে হেঁটে গেলেন। দেখা গেল বাগানে সন্ন্যাসিনীরা কাজ করছেন।

মেয়েটি বোধহয় এখানে কোথাও আছে।..

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসও জানালার কাছে চলে গেলেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তিনজন সন্ন্যাসিনীকে দেখা গেল। তারা পেছন ফিরে কাজ করছেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। একটু বাদেই তার কাঙ্ক্ষিত মুখটা চোখে পড়ল।

নিঃশ্বাস আটকে গেল ডেমিরিসের। আহা, সে এখনও সুন্দরী! কিন্তু কীভাবে এই ঘটনা ঘটল?

–কোথায় সে?

মাঝের মেয়েটি বোধহয়। সিস্টার থেরেসা বললেন।

ডেমিরিস ঘাড় নাড়লেন–হ্যাঁ।

সিস্টার থেরেসার শব্দগুলো তার কান বিদ্ধ করছে।

–আপনি এখন কী সিদ্ধান্ত নেবেন?

ডেমিরিস বললেন আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব।

.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে এখন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। তার চেহারার মধ্যে এই পরিবর্তন এল কী করে? কেউ ভাবতেই পারবে না, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটি আর এই মেয়েটি একই! ডেমিরিস চিন্তা করলেন। তখনই তার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এসে গেল। এই ব্যাপারটা ঠিক মতো রূপায়িত হবে কি?

সেই সন্ধ্যায় তিনি সিস্টার থেরেসার কাছে একটি গোপন নোট পাঠালেন।

.

এটা একটা অলৌকিক ঘটনা! ক্যাথেরিনের মনে হল। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নটা সফল হতে চলেছে। সিস্টার থেরেসা তাকে ছোট্ট সেলের বাইরে নিয়ে এলেন। বললেন, তোমার জন্য খুশির খবর আছে।

ক্যাথেরিনের চোখ দুটি বড়ো হয়ে উঠেছে অনুগ্রহ করে খবরটা বলবেন কি?

সিস্টার থেরেসা বাছা বাছা শব্দ দিয়ে বললেন–ভালো খবর। আমি তোমার সম্পর্কে আমার এক বন্ধুকে লিখেছিলাম। তিনি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছেন।

ক্যাথেরিনের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে সাহায্য? আমাকে? আপনি সত্যি বলছেন?

-হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত ভালো স্বভাবের মানুষ। তার কথা মতো চললে তুমি কনভেন্ট ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখতে পারবে। এই শব্দগুলো ক্যাথেরিনের শিরদাঁড়াতে একটা অদ্ভুত শিহরণের জন্ম দিয়েছে। সে আবার বাইরের জগতের পা রাখতে পারবে? কিন্তু সিস্টারের এই বন্ধুটি তাকে সাহায্য করতে চাইছে কেন?

সিস্টার থেরেসা বললেন তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সোমবার সকালে তার গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে।

পরবর্তী দু-রাত ক্যাথেরিনের চোখের তারায় ঘুম ছিল না। অদম্য উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপেছে সে। সে ভেবেছিল, কনভেন্টের চার দেওয়ালের মধ্যেই তার যৌবন-সূর্য অস্তমিত হবে। এখানেই একদিন মরতে হবে তাকে। বাইরের পৃথিবীর রূপ-স্বাদ-কর্ণ-গন্ধ কোনো কিছুই আর পাবে না সে। এখন সেই পরিবেশটা একেবারে পালটে গেছে। কিন্তু? এই কনভেন্ট ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখলে ব্যাপারটা কেমন হবে? অনিশ্চয়তার আবরণ? আরও অন্য কিছু কী? ক্যাথেরিনের মনে হল, সে বুঝি উলঙ্গ হয়েছে। সে জানে না, তার আসল পরিচয় কী? হে ঈশ্বর, তুমি আমার ওপর সর্বক্ষণ কড়া নজর রেখো কিন্তু।

.

সোমবার ঠিক সময়ে কনভেন্ট গেটে লিমুজিন এসে দাঁড়াল। তখন ঢং ঢং করে ঘড়িতে সকাল সাতটা বেজেছে। ক্যাথেরিন সারারাত ঘুমোতে পারেনি। তার অচেনা ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে।

সিস্টার থেরেসাকে দেখা গেল। তিনি ক্যাথেরিনের হাতে হাত রেখে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আর তখন? তখন বাইরের পৃথিবী ক্যাথেরিনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমরা সকলে তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। যদি কখনও মনে হয় এই কনভেন্টে আবার তোমাকে ফিরে আসতে হবে, তাহলে কথা দিচ্ছি, তুমি বিন্দুমাত্র ইতস্তত কোরো না। কনভেন্টের দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

–আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ, সিস্টার। আপনার কথাগুলো আমি মনে রাখার চেষ্টা করব।

কিন্তু মনে মনে ক্যাথেরিন জানে, আর কোনোদিন সে কনভেন্টের মধ্যে ফিরে আসবে না। সে এখন এক মুক্ত বিহঙ্গী। নীল আকাশে তার দুটি সবল ডানা মেলে দেবে।

.

লিমুজিনে চড়ে শুরু হল যাত্রা। আওয়ানিনা থেকে এথেন্স, ক্যাথেরিনের মনে নানা আবেগের সঞ্চারণ। আহা, কনভেন্টের বাইরে পৃথিবী এত বর্ণময়! কিন্তু এখানে কি কোনো সমস্যা আছে? ভবিষ্যতের কথা সে জানে না। অতীতে কী ঘটেছিল? অতীতটা

তার কাছে ফিরে আসছে না কেন? স্বপ্ন এবং তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা এবং আবেগ–এই সবের অবসান কখন হবে?

.

বিকালবেলা একটা গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ছোটো একটা জনবসতি দেখা যাচ্ছে। সুখী সম্পৃক্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত তারা এথেন্স শহরের উপকণ্ঠে একটি জায়গায় পৌঁছে গেল। তারপর ঢুকে পড়ল জনাকীর্ণ শহরের মধ্যে।

ব্যাপারটা ক্যাথেরিনের কাছে খুবই অবাক লাগছে। কিন্তু এই শহরের দৃশ্যাবলি তার এত চেনা লাগছে কেন! ক্যাথেরিনের কেবলই মনে হতে লাগল, সে বোধহয় আগে এই শহরের বাসিন্দা ছিল, অন্তত এই শহরে কিছুদিনের জন্য এসেছিল। তা না হলে এমন মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হবে কী করে!

ড্রাইভার পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে। পনেরো মিনিট বাদে তারা একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। সেখানে বিরাট একটি বাংলো বাড়ি। তারা লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে সাজানো গোছানো বাড়িটি। রাস্তা এগিয়ে গেছে। দুপাশে আকাশছোঁয়া সাইপ্রাস গাছের সারি। শেষ অব্দি ভূমধ্যসাগরীয় একটি ভিলার সামনে এসে গাড়িটা থেমে গেল। আশেপাশে অসাধারণ ভাস্কর্যের উপস্থিতি। নগ্ন নারীমূর্তির আহ্বান।

ড্রাইভার এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ক্যাথেরিন বাইরে পা রাখল। দেখা গেল একজন ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভদ্রলোক গ্রিক ভাষায় বলল–শুভ সকাল, ক্যালিমেহেরা।

আপনি কি সেই মানুষ যাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি?

না-না, আপনার জন্য শ্রীযুক্ত ডেমিরিস লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছেন।

–ডেমিরিস? ক্যাথেরিনের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা। না, কোনো দিন এই নামটি সে শোনে নি। ভদ্রলোক খামোখা আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন কেন? আচরণের মধ্যে রহস্যের গন্ধ আছে কী?

ক্যাথেরিন ওই আগন্তুকের সঙ্গে বিরাট অলিন্দ পার হল। তারপর বেশ কয়েকটি ঘরও পার হতে হল তাকে। সর্বত্র বৈভবের চিহ্ন। ইতালিয়ান মার্বেলের ছড়াছড়ি।

লিভিং রুমটা বিরাট, সিলিং-এ কারুকাজ। চারদিকে নীচু আরামদায়ক কৌচ পাতা আছে। আছে সুন্দর চেয়ার। একটা বিরাট ক্যানভাসও চোখে পড়ল। গয়্যার আঁকা ছবি। দেওয়ালটা পুরো জুড়ে রেখেছে। তারা লাইব্রেরির দিকে এগিয়ে চলেছে।

লোকটি হঠাৎ বলতে শুরু করে ভেতরে যান, ডেমিরিস আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

লাইব্রেরির সর্বত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের চিহ্ন আঁকা। দেখা গেল, মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা বইয়ের ওপর সোনার জলে নাম লেখা। বিশাল ডেস্কের আড়ালে একজন মানুষ বসে আছে। ক্যাথেরিন প্রবেশ করল। তিনি চোখ তুলে তাকালেন। উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, ক্যাথেরিনের আচরণের মধ্যে কোনো কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে কি? ক্যাথেরিন কি

আমাকে চিনতে পেরেছে? না, পারেনি। যাক, ঈশ্বরের দোহাই, আমার পরিকল্পনা ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে।

আসুন, আসুন, আমি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস। আপনার নাম কী?

ইচ্ছে করেই এই প্রশ্নটা করলেন ডেমিরিস। নামটা কি মনে আছে? ব্যাপারটা জানতে হবে।

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।

চমকে উঠেছিলেন ডেমিরিস, কিন্তু তার আচরণের মধ্যে এই চমকানো ভাবটা ছিল না। তিনি বললেন–স্বাগতম, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। আপনি আরাম করে বসতে পারেন।

তিনি সামনের চেয়ারে বসলেন। কালো লেদার কৌচের ওপর। আহা মেয়েটি এত কাছে এসে বসেছে! এখনও সে আকর্ষণীয়া। ডেমিনিস ভাবলেন। ক্যাথেরিন কালো পোশাক পরেছে। কিন্তু এই পোশাকও তার সৌন্দর্যের রূপচ্ছাকে আবৃত করতে পারেনি। যাক, শেষ অব্দি ভালোভাবেই মেয়েটির মৃত্যু হবে।

–আপনাকে দেখে আমার কী যে ভালো লাগছে, ক্যাথেরিন আমতা আমতা করে বলতে থাকে, কিন্তু আপনি আমার ব্যাপারে হঠাৎ সদয় হয়ে উঠলেন কেন?

ডেমিরিস হাসলেন। অমায়িক হাসি।

ব্যাপারটা খুবই সহজ। মাঝে মধ্যে আমি সিস্টার থেরেসাকে সাহায্য করি। ওই কনভেন্টে সাহায্য করি। ওই কনভেন্টে কিছু টাকাপয়সা দিই। যখন যতটা পারি আর কি। উনি আপনার সম্বন্ধে আমাকে লিখেছিলেন। উনি অনুরোধ করেছিলেন, যদি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমি রাজি হয়েছি, ব্যাপারটা খুবই সহজ। এর মধ্যে আর কিছু নেই।

–ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য। ক্যাথেরিন বলেছিল। আসলে কীভাবে কথা চালিয়ে যাবে, বুঝতে পারেনি সে।

মিস্টার থেরেসা কি বলেছেন, আমি আমার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি?

হ্যাঁ, উনি আপনার সম্পর্কে সব কথা বলেছেন।

ডেমিরিস ইতস্তত করলেন। কত দূর পর্যন্ত আপনার মনে আছে?

আমার নামটা মনে পড়েছে। কিন্তু কোথা থেকে আমি এসেছি, তা ভুলে গেছি। আমার আসল পরিচয় কী, তাও মনে পড়ছে না। ক্যাথেরিন আমতা আমতা করতে থাকে। তারপর বলে, এথেন্সে এমন কেউ কি আছে, যে আমার পূর্ব পরিচয় জানে?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মনের ভেতর হঠাৎ বিপদঘণ্টা বেজে উঠল। এই শেষ শব্দগুলো ভয়ংকর। তবুও তিনি বলতে থাকেনহতেই পারে, হতেই পারে। ঠিক আছে, কাল সকালে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আমাকে এখন একটা মিটিং-এ যেতে

হবে। আমি আপনার জন্য একটা সুইটের ব্যবস্থা করেছি। আমার মনে হয় সেখানে থাকতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

–আমি জানি না, কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।

ডেমিরিস হাত নাড়লেন–নানা, ধন্যবাদ দিতে হবে না। আপনি বিশ্রাম নিন। মনে করুন এটা আপনার নিজের বাড়ি। কোনো ব্যাপারে ইতস্তত করবেন না, যা দরকার হবে আপনার, তাই চেয়ে নেবেন। কেমন?

–অনেক, অনেক ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত...।

বন্ধুরা আমাকে কোস্টা বলে ডাকে।

.

ক্যাথেরিনকে একটা সুন্দর সাজানো বেডরুমে নিয়ে যাওয়া হল। সাদা সিল্কের চাদরে আচ্ছাদিত বিশাল খাটটি। সর্বত্র অহংকারের চিহ্ন। আছে সাদা কৌচ, আমচেয়ার। প্রাচীনকালের টেবিল এবং আলো। দেওয়ালে ইমপ্রেসানিস্ট যুগের ছবি ঝুলছে। আহা, এই ছবিতে সূর্যোদয়ের দৃশ্য! সমুদ্র সৈকতে মানুষের আনন্দ উতরোল! জানালা দিয়ে ক্যাথেরিন তাকাল। দূরে ওই তো সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তার গর্জন শোনা যাচ্ছে।

হাউস কিপার বলল–মিঃ ডেমিরিস আপনার জন্য কয়েকটা পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। এখুনি পোশাকগুলো নিয়ে আসা হবে। আপনি যেটা পছন্দ করবেন, সেটাই রেখে দেওয়া হবে। অবশ্য আপনি অনেকগুলো পোশাকও পছন্দ করতে পারেন।

ক্যাথেরিন নিজের সম্পর্কে সচেতন। এই প্রথম তার মনে হল, কনভেন্টের পোশাকটাই এখন তার পরনে রয়েছে। ব্যাপারটা ভাবতে খুবই খারাপ লাগে।

ছোট্ট একটা ধন্যবাদ ছুঁড়ে দিয়ে সে নরম বিছানাতে গা এলিয়ে দিল। মনে হল, সব কিছু যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলেছে। এই আগন্তুক কে? কেন তিনি এত সদয় হয়ে উঠেছেন আমার প্রতি? চোখ বন্ধ করার আগে ক্ষণকালের জন্য ক্যাথেরিন এমনটাই ভেবেছিল।

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। একটি ভ্যান এসে ভিলার প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়াল। ভ্যান ভরতি নানরকমের পোশাক। একজন ক্যাথেরিনের ঘরে ঢুকে পড়েছে।

সে বলল–আমি মাদাম ডিমাস। দেখি কোন পোশাকটা আপনার গায়ে ঠিক মতো ফিট করবে। আপনি কি অনুগ্রহ করে এই পোশাকটা খুলে ফেলবেন ম্যাডাম?

কী বলছেন?

আপনি কি পোশাকটা একবার খুলবেন? আমরা দেখব আপনার শরীরের সাথে কোন পোশাকটা, ঠিকমতো খাপ খায়।

ক্যাথেরিন চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করল। অন্য এক জনের সামনে শেষবারের মতো সে কবে উলঙ্গ হয়েছে?

ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে নিজেকে পোশাক বিমুক্ত করতে থাকে। তার গতিতে এখন মন্দাক্রান্তা ছন্দ। নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সে। অবশেষে যখন সে মাদাম ডিমাসের–সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল, ডিমাস তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল। এটাই তার পেশা। ক্যাথেরিনকে দেখে সে খুশি হয়েছে। চোখের তারার দ্যুতি সেই গল্পটা বলে দিল।

বাঃ, চমৎকার ম্যাডাম! আপনার শরীর তো খুবই সুন্দর। মনে হচ্ছে, যে-কোনো পোশাকেই আপনাকে ভালো লাগবে।

দুজন মহিলা সহকারিনী এসে গেছে। তাদের হাতে ধরা বাক্স। সেখানে নানা রকমের পোশাক। কত কী আছে! অন্তর্বাস থেকে শুরু করে ব্লাউজ, স্কার্ট এবং পায়ের জুতো পর্যন্ত।

মাদাম বলে উঠল- কী আপনার পছন্দ খোলসা করে বলুন। আমরা সেটাই পরাবার চেষ্ট করব।

ক্যাথেরিন বাধা দেবার চেষ্টা করে আমার কাছে এত টাকা নেই। আমি এত দামি পোশাক কিনতে পারব না।

মাদামের ঠোঁটের কোণে টুকরো হাসি–মনে হয় না টাকাটা কোনো সমস্যা হবে। মিঃ ডেমিরিস সব দায়িত্ব নিয়েছেন।

–কিন্তু কেন? স্বগতোক্তির মতো ক্যাথেরিন বলে ওঠে।

অবশেষে সে ফেব্রিকের তৈরি পোশাক পছন্দ করল। এ জাতীয় পোশাক কি সে একবার পরেছিল? ধূসর স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন? সিল্কের পোশাকও তার ভারি পছন্দ হয়েছে। এবং সুতির তৈরি ব্লাউজগুলোও চমৎকার। আসলে এই পুরো কালেকশানটা এত সুন্দর যে সব কটা পোশাকই পরে ফেলতে ভীষণ-ভীষণ ইচ্ছে হল তার।

.

তিনজন মেয়ে খুব চটপটে এবং পেশাদার। দু ঘণ্টা বাদে ক্যাথেরিনের গায়ে ছ-ছটি পোশাক তুলে দেওয়া হল। আনন্দে ক্যাথেরিন কি পাগল হয়ে যাবে? কিন্তু ক্যাথেরিন, জানে না, এখন তাকে কী করতে হবে।

আমি সব কটা পোশাক পরব? ক্যাথেরিন ভাবল। কিন্তু যাব কোথায়? অথচ কোথাও তো তাকে যেতেই হবে। শহরের মধ্যে এবং সেটা এথেন্সে যখন সে একবার এসেই পড়েছে, অনেক কিছু তাকে জানতে হবে। শেষ অব্দি ক্যাথেরিন ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে উঠে দাঁড়াল, এসো-এসো হে আগন্তুক, দেখাই যাক, তোমার আসল পরিচয়টা আমি উদঘাটন করতে পারি কিনা!

.

ফ্রন্টহলের দিকে ক্যাথেরিন এগিয়ে গেল। একজন বাটলার তাকে এসে বলল, মিস, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

–হ্যাঁ, আমি শহরের মধ্যে যেতে চাই, তুমি কি আমার জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আনতে পারবে?

তার আর দরকার হবে না মিস। আপনার ব্যবহারের জন্য একটা লিমুজিন গাড়ি রাখা আছে। আমি এখুনি একজন ড্রাইভারকে ডেকে আনছি।

ক্যাথেরিন ইতস্তত করতে থাকে তোমাকে ধন্যবাদ। শ্রীযুক্ত ডেমিরিস কি রাগ করবেন, ক্যাথেরিন তার অনুমতি না নিয়ে শহর পরিভ্রমণে গেছে বলে? কিন্তু তার হাতে সময় কোথায়?

কিছুক্ষণ বাদে ক্যাথেরিনকে ডিমলার লিমুজিনে বসে থাকতে দেখা গেল। গাড়িটা ধীরে ধীরে এথেন্সের দিকে এগিয়ে চলেছে।

.

ক্যাথেরিন এই জনাকীর্ণ শহরের শব্দঅরণ্যে হারিয়ে গেল। চারপাশে ধ্বংসের অবশেষ, অসংখ্য স্মারক চিহ্ন। মনে হয় এই শহরটা যেন একটা মৃত অতীতকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইছে।

ড্রাইভার একটির পর একটি গল্প বলে চলেছে। ড্রাইভার বলল দেখুন মিস, এটা হল পারথেলন। এটা হল অ্যাকরোপোলিশের ওপরদিকটা।

ক্যাথেরিন সব দিকে তাকিয়ে দেখছে। সাদা মার্বেল পাথরের বাড়িগুলো যেন কোন অব্যক্ত কথা বলতে চাইছে। তাতে লেখা আছে–জ্ঞান এবং বুদ্ধির দেবী অ্যাথেনার প্রতি উৎসর্গীকৃত। কথাগুলো উচ্চারণ করল ক্যাথেরিন।

ড্রাইভার হেসে ওঠে- আপনি কি গ্রিক ইতিহাসের ছাত্রী মিস?

ক্যাথেরিনের চোখে কৌতুকের দ্যুতি–আমি জানি না। সত্যিই কি জানি আমি?

আর একটা ধ্বংস স্তূপের পাশ দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে।

উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে ড্রাইভারটি। সে গ্রিকদেশের সব কথা শোনাবে ক্যাথেরিনকে। সে বলল, এটা হল হেরোডেস অ্যাটিকাসের থিয়েটার। দেখুন, দেওয়ালগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় এখানে পাঁচ হাজার দর্শক বসে নাটক দেখত।

–৬২৫৭, ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে বলল।

অনেক আধুনিক হোটেল চোখে পড়ছে। আকাশছোঁয়া অফিসবাড়ি। চারপাশে ধ্বংস এবং নির্মাণের ছবি পাশাপাশি। অতীত ও বর্তমানের সহাবস্থান। লিমুজিন একটা বিশাল

উদ্যানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। এই জায়গাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে। নৃত্যরত ঝরনার সাথে দেখা হল। সেখানে ইতস্তত চেয়ার টেবিল ছড়ানো আছে। নীল কার্পেট পাতা।

আমি এই জায়গাটায় আগে এসেছি, সহসা ক্যাথেরিনের মনে হল। তার হাত ঠান্ডা হয়ে এল। তখন আমি সত্যি সুখী এবং সম্পৃক্ত ছিলাম।

.

প্রত্যেকটি কাফের ধারে এক-একটি ব্লক। প্রত্যেকটি অঞ্চলে সুখী জীবনের ছবি। সর্বত্র ফুল ফুটেছে। ফুল বিক্রি করছে ফেরিওয়ালারা। কত রকমের ফুল হলদে, সবুজ, নীল, আরও কত কী!

শেষ পর্যন্ত লিমুজিন এসে থামল সিনটাগমা স্কোয়ারে।

হোটেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্যাথেরিন বলল–তুমি কি গাড়িটাকে একবার দাঁড় করাবে?

ড্রাইভার গাড়িটা দাঁড় করালো। ক্যাথেরিনের মনে হল, তার নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। সে হোটেলটাকে চিনতে পেরেছে। একদা এই হোটেলে সে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছে।

সে কথা বলার চেষ্টা করল। তার গলা দিয়ে স্বর বেরিয়ে আসছে ক্ষীণভাবে–আমি এখানে নামব। দু-ঘন্টা বাদে তুমি কি আমাকে নিতে আসবে?

–অবশ্যই মিস। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিল।

ক্যাথেরিন বাইরে এল। বাইরে উষ্ণ বাতাস বইছে। তবুও তার পা কাঁপছে।

–আপনি কি ঠিক আছেন মিস? ড্রাইভার জানতে চাইল।

এ প্রশ্নের জবাব ক্যাথেরিন নিজেই জানে না। তার মনে হল, সে বোধহয় এক অচেনা অজানা জগতে প্রবেশ করতে চলেছে। যেখানে চারদিকে শুধুই আতঙ্ক আর শঙ্কা।

.

জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে ক্যাথেরিন হেঁটে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ কোথায় চলেছে? মনে হচ্ছে, তাদের কথা বলা বুঝি কোনোদিন শেষ হবে না। কনভেন্টের নৈঃশব্দ ভেঙে গেছে। সবকিছুই অবাস্তব এবং অসম্ভব বলে মনে হয় ক্যাথেরিনের কাছে। ক্যাথেরিন প্ল্যাকার্ড দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে। এথেন্সের সেই পুরোনো অঞ্চল, যদিও এটি শহরের কেন্দ্রস্থল। এখানে কী আছে? এখানে আছে পুরোনো দিনের বাড়ি, ছোটো ছোটো কুটির, কফিশপ, আর আছে ভেঙে পড়া এক-একটি স্থাপত্য শিল্প। ক্যাথেরিন জানে না, সে কোথায় যাবে। কোনো এক অনির্দেশের ডাকে তার পা দুটো এগিয়ে চলেছে। সে শহরের দিকে তাকাল। মনে হল, এই হোটেলটা তার অত্যন্ত চেনা! এখানে সে কতদিন থেকেছে! এখানে নানা ধরনের গ্রিক মেনু দেওয়া হয়।

–তুমি কী খাবে? তারা জিজ্ঞাসা করেছিল।

–আমি কী খেতে চাইছি, আমি জানি না।

তারা হেসেছিল।

একজন ওয়েটার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল–আপনাকে কীভাবে সেবা করতে পারি?

সে কিন্তু বিশুদ্ধ গ্রিক ভাষায় প্রশ্ন করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ক্যাথেরিন। তার মানে? আমাকে দেখেই কি মনে হচ্ছে, আমি গ্রিস দেশের বাসিন্দা?

ক্যাথেরিন অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কেউ যদি সামনে থাকত তাহলে ভালো হত। সে জানে, তাকে কোথায় যেতে হবে।

সব কিছু ভীষণ চেনা মনে হচ্ছে। হায় ঈশ্বর! আমি এরকম আচরণ করছি কেন? আমি কি স্বপ্ন এবং জাগরণের মধ্যে ভেসে চলেছি?

ক্যাথেরিন একটি কাফের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল। এই কাফের গায়ে লেখা আছে। ট্রেনিকাস। আবার স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন। এখানেই কিছু একটা ঘটেছিল, এমন কিছু, যা তার জীবনের গতিপথকে একেবারে পালটে দিয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাটা ক্যাথেরিন মনে করতে পারছে না।

সে আবার জনাকীর্ণ রাস্তায় এসে পড়ল। এখন সে কোথায় যাবে? ক্যাথেরিন একটি শপিংমলে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এখানে আমি রোজ বাজার করতাম। ক্যাথেরিন তাকিয়ে

থাকল। তার চোখের সামনে নীল পর্দা ভেসে উঠছে। কী যেন সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না!

তার মনের ভেতর একটা কণ্ঠস্বর। গ্রিক দেশের মানুষরা এমন কথাই বলে থাকে। তুমি আরও সাহসী হয়ে ওঠো। পুরোনো গ্রিক ট্রাজিডিগুলোর কথা মনে আছে কি? আমরা কী দেখেছি? দেখেছি আবেগের উতরোল। পরিমাপ করা যাবে না, এমন আনন্দ। দুঃখের পরিপূর্ণ সাগর। আমরা জানি, কীভাবে আরও সুসভ্য হয়ে উঠতে হয়।

ক্যাথেরিন ভাবল, কে বলল এই কথাগুলো? আমি, নাকি আমার বিবেক?

.

রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ ব্যস্ত সমস্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে কিন্তু ক্যাথেরিনের দিকে এগিয়ে আসছে। তার চোখ দুটি ক্যাথেরিনের দিকে নিবদ্ধ। একটু বাদে বোঝা গেল সে ক্যাথেরিনকে চিনতে পেরেছে। সে বেশ লম্বা এবং তার গায়ের চামড়া বাদামি রঙের। ক্যাথেরিন এই মানুষটিকে আগে দেখেছে কি?

লোকটি বলে ওঠে- হ্যালো!

বড়ো একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ক্যাথেরিন বলল–হ্যালো। তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

লোকটা বলে- হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনি।

ক্যাথেরিনের মনে হল তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। সে বোধ হয় অতীতের সব কথা এবার জানতে পারবে। সে জিজ্ঞাসা করল- সত্যি!

লোকটি বলে- হ্যাঁ। তুমি কি জানো আমি কে?

ক্যাথেরিন ভাবতে থাকে, তার সব কথা লোকটাকে বলবে কিনা।

লোকটি বলে–হ্যাঁ, আমাদের কথা বলা উচিত।

কী আশ্চর্য, লোকটি কি মনের ভাষা পড়তে পারে।

ক্যাথেরিন তখন আতঙ্কের শিখরে পৌঁছে গেছে। এইভাবে বোধহয় তার সত্তার রহস্য উন্মোচন হবে। তখনই তার মনে ভয় জেগেছে। কেউ যদি আমার আসল পরিচয় জেনে ফেলে তাহলে কী হবে? একটা ক্লেদাক্ত অতীত ভেসে উঠবে কী?

লোকটি আরও সামনে এগিয়ে এসেছে। সে বলল–অনেক দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

তখন তারা একটা উন্মুক্ত হোটেলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ক্যাথেরিন ঢোঁক গিলে বলে, আমিও খুশি হয়েছি।

একজন ওয়েটার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

–তুমি এখন কী পান করবে? লোকটি জানতে চায়।

ক্যাথেরিন মাথা নেড়ে বলে কিছুই না।

কোথা থেকে প্রশ্ন-উত্তর শুরু হতে পারে, সেটাই খুব সমস্যা।

ভদ্রলোক বলে উঠল–তুমি খুব সুন্দরী, এটাই বোধহয় ভাগ্য। তুমি কি তা মানবে?

ক্যাথেরিন উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাবে। নিঃশ্বাস চেপে সে বলে কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল?

ভদ্রলোক বলল–সেটা কি খুবই গুরুত্বপর্ণ? প্যারিস অথবা রোমে, ঘোড়দৌড়ের আসরে অথবা ডিনার পার্টিতে।

এবার লোকটি এগিয়ে এসে ক্যাথেরিনের হাতে চাপ দিল আমার জীবনে আমি তোমার মতো এত রূপসী মহিলা কোথাও দেখিনি! তোমার দাম কত?

ক্যাথেরিন অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে লোকটিকে পর্যবেক্ষণ করল। বুঝতে পারল না, লোকটি কী বলতে চাইছে। তারপর সে রেগে গেল। কটমট করে তাকাতে থাকল।

–এত রাগ করছ কেন? তোমার দাম যাই হোক না, আমি মিটিয়ে দেব।

ক্যাথেরিন উঠে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে ছুটতে শুরু করেছে সে। একটু বাদে তার চলার গতি থামিয়ে দিল। তার চোখে জল এসেছে। এই জলের অক্ষরে লেখা আছে অপমানের ইতিহাস।

একটা ছোটো টার্নার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। সেখানে কী লেখা আছে? মাদাম পিরিস–ভবিষ্যৎ বক্তা। ক্যাথেরিন সেখানে থমকে দাঁড়াল। আমি মাদাম পিরিসকে চিনি। এখানে আমি আগে এসেছিলাম। আবার হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে। তার হারানো চেতনা ফিরে এসেছে।

দরজা খুলে সে ভেতরে প্রবেশ করল। হা ঈশ্বর, এখানে এত অন্ধকার কেন? সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কিন্তু কোণে একটা বার দেখা যাচ্ছে। টেবিল চেয়ার সাজানো রয়েছে। এক ওয়েটার এগিয়ে এল, গ্রিক ভাষায় জানতে চাইল–কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

–ঝরঝরে গ্রিক ভাষায় ক্যাথেরিন জবাব দিল-মাদাম পিরিসের সাথে কোথায় দেখা হবে?

–মাদাম পিরিস?

ওয়েটার একটা খালি টেবিলের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। ক্যাথেরিন সেখানে এগিয়ে গেল। চেয়ারে বসে পড়ল। সবকিছু, সবকিছু তার মনে পড়েছে।

একটু বাদে কালো পোশাক পরা এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তার মুখে সময় এঁকেছে বলিরেখা।

–আপনাকে আমি...তিনি কথা বললেন, ক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে! তুমি ফিরে এসেছ?

আপনি কি আমাকে চেনেন? ক্যাথেরিন জানতে চাইল।

এবার ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন–না না তুমি মারা গেছে। ঈশ্বরের দোহাই, এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

এই কথা শুনে ক্যাথেরিন গোঙাতে শুরু করে। উঠে দাঁড়ায়, বাইরে যাবার চেষ্টা করে। তবুও বলে, বলুন না, বলুন না আমাকে কি আপনি....

–যাও, বাইরে যাও, শ্রীমতি ডগলাস!

–আমি জানতে চাইছি...

এবার ওই ভদ্রমহিলা আর কোনো কথা বললেন না। তিনি ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন তার বুকের ওপর। মনে হল পালাতে পারলে বাঁচেন বুঝি!

.

তারপরেও ক্যাথেরিন অনেকক্ষণ সেখানে বসেছিল একা। ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসে। বৃদ্ধার শেষ সম্বোধনটা তার মনে গেঁথে গেছে শ্রীমতি

ডগলাস। তার মানে, এটা আমার আর একটা পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয়টার অন্তরালে কী আছে?

মনে হল যেন লকগেট খুলে গেছে। এখুনি বন্যার উন্মত্ত জলরাশি এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন তার চোখের সামনে সব আলোকিত দৃশ্য হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলেছে। আহা, ছোট্টবেলায় দেখা সেই ক্যালিডোস্কোপ। আমি শ্রীমতি ল্যারি ডগলাস। এবার ক্যাথেরিনের মনে পড়ল তার স্বামীর সুন্দর চেহারাটা। এক সময় এই পুরুষটিকে সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। কোথায়?

আরেকটি ছবি মনে পড়ল তার। ক্যাথেরিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ক্যাথেরিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা দুটো তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে, পা দুটি বুঝি দেহের ভার আর বহন করতে পারবে না। মনের মধ্যে জেগেছে উৎকণ্ঠা।

অনেকটা জল খেলো সে। একটু আগে ল্যারিকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন ল্যারি আবার ফিরে এসেছে। ল্যারি বলেছিল–আমি জানি তোমার সাথে কত খারাপ ব্যবহার করেছি। ক্যাথি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করো, এখনও। আমি অন্য কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি। আমি একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। তুমি কি দ্বিতীয়বার মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবে? আমি তোমাকে একটা দারুণ সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব। তার নাম আওয়ানিনিনা।

তারপর আতঙ্কের গল্পের সূত্রপাত।

ছবিগুলো কাঁপছে, ছবিগুলো দুলছে, ছবিগুলো একে অপরকে আক্রমণ করতে চাইছে। ল্যারির সাথে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিল সে। দূরে আরো দূরে দেখা যাচ্ছে ধূসর কুয়াশা। আহা, এটাই বোধহয় পৃথিবীর সেরা জায়গা। সে হাত দুটো ছড়িয়ে আছে। তারপর? তাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। কয়েকজন ট্যুরিস্ট এসে তাকে উদ্ধার করে।

তারপর? অন্ধকার গুহা।

হোটেলের ক্লার্ক কী বলেছিল? বলেছিল, যারা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চায় তাদের পক্ষে এটাই হল আদর্শ জায়গা।

তারপর? সেই বৃহৎ অন্ধকার। ল্যারির মুখ। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

সে কানে হাত চাপা দিল। কোনো শব্দ এখন সে প্রবেশ করতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত সে কি বেঁচে গিয়েছিল? হোটেলে ফিরে এসেছিল? ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন। মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যেত কেন? ল্যারি এবং তার উপপত্নী রান্নাঘরে মিলিত হচ্ছে, এমন একটা দৃশ্য, কী কথা বলছে তারা? কীভাবে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে? বাতাস কেটে কেটে সেই শব্দ বয়ে আসছে।

–কেউ জানতে পারবে না?

–ব্যাপারটা আমি দেখব।

–না, এভাবে হবে না।

–ঠিক আছে, ও যখন ঘুমিয়ে পড়বে...।

একটা ভয়, একটা অতিঙ্ক, একটা তীব্র অনুভূতি–সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। তখনই মনে হয়েছিল, সে বুঝি হ্রদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। একজন নারী এবং একজন পুরুষ জোর করে তাকে বরফ শীতল জলের মধ্যে চুবিয়ে দিচ্ছে। ঝড় উঠেছে, উথালপাথাল হাওয়া। হেল্প! হেল্প! বলে সে চিৎকার করেছিল। তারপর? তারপর ঘুমটা ভেঙে যায়। চারদিকে শুরু অমনিশার ঘন অন্ধকার!

ক্যাথেরিন রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। তার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়া করছে। নাঃ, দুঃস্বপ্ন নয়, এমন ঘটনা সত্যিই তার জীবনে ঘটেছিল। তার স্বামী এবং উপপত্নী মিলে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে।

তাহলে? এই আগন্তুক কে? কে তাকে কনভেন্টে রেখে এসেছিল? না, সেই সোনালি পাখিটাকে মনে পড়ছে রক্ত রুবির মতো চোখ, দুপাশে দুটি ডানা, যা সে আকাশের বুকে মেলে দেবে।

মুখের কাছে মুখ এনে কে যেন বলল–এখন কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দুষ্টু লোকেরা মারা গেছে।

ক্যাথেরিনের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। কোনোমতে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এবার তাকে সেই জায়গাটাতে পৌঁছোতে হবে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের পাঠানো গাড়িটা বোধহয় এখন এসে গেছে। ক্যাথেরিনের মনে হল, এই জনারণ্যে থাকলে সে আবার হারিয়ে যাবে। এখন ডেমিরিসের ওই প্রাসাদবাড়িটাই হতে পারে তার একমাত্র নিরাপদ আবাসস্থল।

.

০৪.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস জানতে চাইলেন–তোমার সাহস তো কম নয়! তুমি মেয়েটিকে বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি দিলে কী করে?

ডগলাস আমতা আমতা করে বলতে থাকে–স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি তো এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ রেখে যাননি। তাই...

ডেমিরিসের মনে হল, এতটা রাগ না দেখালেও চলবে। তিনি বললেন–ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মেয়েটা বোধহয় এখনই চলে আসবে, তাই না?

–কোনো সমস্যা হয়েছে কী স্যার?

–না।

ডগলাস চলে গেল। ডেমিরিস জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাগানের দিকে তাকালেন। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার যদি এথেন্সের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাহলে কী হবে? কেউ হয়তো তাকে দেখে ফেলবে। না ব্যাপারটা কখনোই হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে আমার পরিকল্পনাটা একেবারে ভেস্তে যাবে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি তাকে ভোগ করব। আমি তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাব। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আমার অধিকারে থাকবে। মনে হচ্ছে, লন্ডন শহরটা তার পক্ষে নিরাপদ হতে পারে। সেখানে তার ওপর নজর রাখা সম্ভব হবে। আমি আমার অফিসে তার জন্য একটা কাজ ঠিক করব।

***

এক ঘণ্টা কেটে গেছে, ক্যাথেরিন বাড়িতে ফিরে এসেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বুঝতে পেরেছেন, ক্যাথেরিনের মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন জেগেছে। মনে হচ্ছে, কেউ নিশ্চয়ই কালো পর্দাটা তুলে দিয়েছে। ক্যাথেরিন আবার জাগ্রত সত্তায় ফিরে এসেছে। একটা ভারি সুন্দর সিল্কের পোশাক ক্যাথেরিনের পরনে। সঙ্গে সাদা ব্লাউজ পরেছে মানানসই। ডেমিরিসের মনে হল, তার আচরণের মধ্যে কেমন পরিবর্তন এসেছে। চেহারাটাও পালটে গেছে। তার মানে? এখন ক্যাথেরিনকে কী বলা যেতে পারে? গ্রিক ভাষায় বলে নস্টেমি, ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? বাংলাতে আমরা যৌনবতী বলতে পারি।

মিঃ ডেমিরিস...

–কোস্টা।

–আমি জেনে গেছি আমি কে, এবং কী ঘটেছে।

কথা দুটো সাংঘাতিক, কিন্তু ডেমিরিসের মুখে কোনো ছায়া পড়ল না। ডেমিরিস জানতে চাইলেন–সত্যি? বসুন, বসুন, সবটা আমাকে খুলে বলুন।

ক্যাথেরিন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে বসতেও পারছে না, কার্পেটের ওপর দিয়ে পায়চারি করছে। একবার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই পেছনে সরে আসছে। তারপর বলতে থাকে আমার স্বামী এবং তার আদরিণী রক্ষিতা নোয়েলে, তারা দুজনে মিলে আমাকে মারতে চেয়েছিল। ক্যাথেরিন একমুহূর্ত চুপ করল। ডেমিরিসের মুখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কেমন যেন শোনাচ্ছে না? আমি কি ঠিক বললাম? আমি জানি না!

ডেমিরিস ভাবলেশহীন–বলতে থাকুন, বলতে থাকুন।

কনভেন্টের কয়েকজন সন্ন্যাসিনী আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরাই আমাকে উদ্ধার করেন। আমার স্বামী আপনার হয়ে কাজ করেছেন? তাই না?

ক্যাথেরিন সোজাসুজি জানতে চাইল। ডেমিরিস ইতস্তত করতে থাকেন। কী উত্তর দেবেন? কতটা জেনে ফেলেছে এই মেয়েটা!

-হ্যাঁ, সে ছিল আমার একজন পাইলট। তাই আপনার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে। এবং সেই কারণেই...

এবার ক্যাথেরিন সবকিছু বুঝতে পেরেছে।

তার মানে আপনি জানতেন আমি কে। তাহলে সকালে আমার আসল পরিচয় বলেননি কেন?

–আমি ভেবেছিলাম একথাটা জানলে আপনি উন্মাদ হয়ে উঠবেন। ডেমিরিস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। আমি চেয়েছিলাম ব্যাপারটা আপনি নিজেই উদ্ঘাটন করুন। তাহলে আপনার স্বায়ুর ওপর বেশি চাপ পড়বে না।

–আপনি কি জানেন আমার স্বামী এবং তার আদরিণী রক্ষিতার কী হয়েছে? তারা। কোথায় আছে?

ডেমিরিস ক্যাথেরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন তাদের শাস্তি হয়েছে।

এই কথা শুনে ক্যাথেরিনের মুখে এক ঝলক লজ্জার আলপনা ডেমিরিস সন্তর্পণে লক্ষ্য করলেন। ক্যাথেরিন মুখে একটা শব্দ করল। সে বোধহয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে চেয়ারের ওপর পড়ে গেল।

–আমি ভাবতে পারছি না...

ক্যাথেরিন, রাষ্ট্র তাদের অপরাধের শাস্তি দিয়েছে। তাদের ফাঁসি হয়েছে। এতে তোমার-আমার কী করার আছে?

কিন্তু কেন?

কারণ তারা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

ক্যাথেরিন জিজ্ঞাসা করে আমি বুঝতে পারছি না। এর জন্য রাষ্ট্র তাদের ফাঁসি দেবে কেন? এই তো আমি বেঁচে আছি।

এবার ডেমিরিস বলতে শুরু করেন ক্যাথেরিন, গ্রিক দেশের আইনকানুন খুবই কড়া। এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী তোমার স্বামী এবং নোয়েলে পেজকে সনাক্ত করে। তারা পরিষ্কার বলে, ওরা দুজন তোমাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল। জুরিরা এই কথা বিশ্বাস করেছেন। তারা সকলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওই দুজনকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ক্যাথেরিন বিড় বিড় করে বলতে থাকে সত্যি সত্যিই কি তাই!

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস রেগে গেলেন। তিনি ক্যাথেরিনের কাঁধে হাত রেখে বললেন– অতীতটাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন ম্যাডাম। অতীতের স্মৃতি নিয়ে আমরা কেউ পথ চলতে পারি কী? ওঁনারা দুজনে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, আর তাই তার দাম চোকাতে হয়েছে।

ডেমিরিসের কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের সুর।

–আমি জানি এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বিব্রত। কিন্তু আমি আপনার কথা ভাবছি। আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কী ভাবছেন?

ক্যাথেরিনের মনে হল, সে কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। ল্যারির কথা মনে পড়ল, ল্যারির সুন্দর মুখ, ল্যারির হাসি, ল্যারির আলিঙ্গন, ল্যারির চুম্বন।

ক্যাথেরিন...

ক্যাথেরিন বলল–আমি দুঃখিত।

–আপনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী পরিকল্পনা করেছেন?

–জানি না। জানি না আমি কী করব! আমি কি এথেন্সেই থাকব?

ডেমিরিস বলল–না, এথেন্সে থাকাটা আপনার উচিত হবে না। এখানে থাকলে শুধুই অতীতের স্মৃতি আপনাকে তাড়া করবে। আমার মনে হয় আপনি গ্রিস দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

–কিন্তু আমি কোথায় যাব?

ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দেবেন কি? ডেমিরিস বললেন, লন্ডনে আমার অফিস আছে। আপনি ওয়াশিংটনে উইলিয়াম ফ্রেজার নামে এক ভদ্রলোকের কাছে কাজ করেছিলেন। এই ব্যাপারটা কি আপনার মনে আছে?

উইলিয়াম! হঠাৎ ক্যাথেরিনের সব কিছু মনে পড়ল। এটা ছিল তার জীবনের সব থেকে সুখী সময়।

–হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

–আপনি তার প্রশাসনিক সহকারিণী ছিলেন, তাই তো? লন্ডনে আপনি আমার অফিসে একই কাজ করতে পারবেন।

ক্যাথেরিন ইতস্তত করতে থাকেন–জানি না পারব কিনা! তবে আমি অকৃতজ্ঞ হতে পারব না এটাও সত্যি। কিন্তু....

আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটে চলেছে । ডেমিরিস সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলতে থাকেন, বেশ কিছুটা সময় দরকার। তা নাহলে আপনি মনের সাথে লড়াই করবেন কেমন করে? আসুন, আপনার ঘরে একটা সুন্দর সুস্বাদু নৈশভোজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল সকালে আমরা দুজনে বসে শান্ত মাথায় সবকিছু আলোচনা করব, কেমন?

এবার কৃতজ্ঞতায় ক্যাথেরিনের চোখে জল এসেছে–আপনি সত্যিই সহৃদয় মানুষ! পোশাকগুলোও চমৎকার হয়েছে।

ডেমিরিস ক্যাথেরিনের হাতে হাত রাখলেন। একটু চাপ দিয়ে বললেন–আপনি যে খুশি হয়েছেন এতে আমি অসীম আনন্দ পাচ্ছি।

**

ক্যাথেরিন বেডরুমে বসে আছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। চতুর্দিকে রঙের খেলা, রঙের সীমাহীন উচ্ছ্বাস। অতীতের কথা বলে কী হবে? ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি না থাকলে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা হত না। ডেমিরিস এখন আমার জীবনরেখা। ডেমিরিসের সাহায্য ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারব না। ডেমিরিস আমাকে একটা চাকরি দিচ্ছেন। লন্ডন শহরে। আমি কি চাকরিটা গ্রহণ করব?

চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। দরজায় কার করাঘাত। কে যেন বলল–আমরা আপনার নৈশ আহার নিয়ে এসেছি মিস।

ক্যাথেরিন চলে যাবার পর কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস অনেকক্ষণ একা বসেছিলেন। এইমাত্র যে সংলাপটা শেষ হল তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভাবছিলেন। নোয়েলে! আহা একসময় নোয়েলের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক ঘটে গিয়েছিল। নোয়েলের হাতে তিনি তার জীবনের সমস্ত আবেগ এবং অভিমান উৎসর্গ করেছিলেন। নোয়েলে পেজকে সত্যি সত্যি তিনি ভালোবাসতেন। কিছুদিনের জন্য নোয়েলে তার রক্ষিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নোয়েলের মতো সুন্দর স্বভাবের কোনো মহিলার সাথে এর আগে তার দেখা হয়নি। শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং ব্যবসা সম্পর্কে মেয়েটির জ্ঞান ছিল প্রশংসা করার মতো। একসময়ে ননায়েলে তার জীবনে অপরিহার্য চরিত্র হয়ে ওঠে। নোয়েলে সম্পর্কে কোনো কথা শোনার জন্য তখন তিনি উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করতেন। নোয়েলের সব কিছু তখন তার কাছে সীমাহীন বিস্ময়ের আধার বলে মনে হত। একেই বোধহয় আমরা

একধরনের তাড়না বলতে পারি। মেয়েটি সুন্দরী এবং রূপবতী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনে অনেক মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ডেমিরিস এসেছেন, কিন্তু এমন আবেদনময়ী মহিলা খুব বেশি দেখেননি। যে সব মেয়েরা সুন্দরী হয়ে থাকে, তাদের মাথাটা তত কঁকা হয়। কিন্তু নোয়েলে হলেন সেই বিরলাতমাদের একজন যার মধ্যে একই সঙ্গে বুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে গেছে।

আহা, নোয়েলের সাথে কাটানো কত সম্পৃক্ত প্রহর! নোয়েলের সাথে ভাগ করে নেওয়া কত মুহূর্ত! নোয়েলেকে সব অর্থে আমার প্রেমিকা বলা যেতে পারে কী? নোয়েলের চোখে আমি ছিলাম একজন প্রেমিক এবং পথ প্রদর্শক। ডেমিরিস চোখ বন্ধ করলেন। পুরোনো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। কিন্তু ল্যারি ডগলাস? এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষটিকে তিনি কি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন? একটা ছোট্ট ভুলের মাশুল নোয়েলেকে জীবন দিয়ে দিতে হল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস সব ব্যাপারটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। আহা, তার দেহটা শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাসারাতে, সমাধি স্থলে। এটি হল আদিয়ানে তার ব্যক্তিগত দ্বীপে। সকলে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুদিন আলোচনা করেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, ডেমিরসই কলকাঠি নেড়েছিলেন, যাতে মৃত্যুর পর শান্তিতে থাকতে পারে বেচারা মেয়েটি। মাঝেমধ্যে যাতে সমুদ্রের শান্ত শীতল বাতাস এসে তার কষ্ট উপশম করতে পারে। আহা, ডেমিরিসের নিজস্ব বেডরুমে এখনও নোয়েলের একটি ছবি টাঙানো আছে। নোয়েলে ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাসির মধ্যে দুষ্টুমি। সময় স্মৃতিচিহ্ন এঁকেছে, তবুও হাসির তীক্ষ্ণতা নষ্ট করতে পারেনি।

ডেমিরিস এখনও নোয়েলেকে মনে রেখেছেন। কতদিন হয়ে গেল? এক বছরের

কাছাকাছি! তার মানে? স্মৃতি কি চিরদিন বেঁচে থাকে?

নোয়েলে, আমি তো তোমাকে সব কিছু দিতে চেয়েছিলাম। আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি! হে কুকুরীর বাচ্চা, আমি তোমাকে ভালোবাসি!

ল্যারি ডগলাস! ল্যারি ডগলাসকেও জীবন দিয়ে দাম দিতে হল। কিন্তু ব্যাপারটা ডেমিরিসের কাছে অবাক বলে মনে হয় না। প্রতিশোধের নানা কথা তিনি ভেবে রেখেছিলেন। তিনি ডগলাসের স্ত্রীকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেমনভাবে ডগলাস নোয়েলেকে অধিকার করেছিল। হা ক্যাথেরিন তার অতীত স্মৃতির মধ্যে একমাত্র ক্যাথেরিন বেঁচে আছে। অতএব...

**

-কোস্টা।

কে ডাকছে? গভীর কণ্ঠস্বর। মেলিনা লামব্রো এদিকে এগিয়ে আসছে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মেলিনা লামব্রোকে বিয়ে করেছিলেন। এক প্রাচীন অভিজাত গ্রিক পরিবারের কন্যা। দীর্ঘাঙ্গীনী। দেখলে মনে হয় তার মধ্যে রাজকীয় আভিজাত্য আছে। আছে এমন এক ব্যক্তিত্ব সহজে যাকে স্পর্শ করা যায় না।

-কোস্টা, ঘরে যে মেয়েটি আছে সে কে?

মেলিনার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরছে।

–সে হল আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। সে লন্ডনে আমার অফিসে যোগ দেবে।

আমি তাকে দেখেছি, দেখে ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

–সত্যি!

-হ্যাঁ। মেলিনা ইতস্তত করতে থাকে। মনে হচ্ছে, যে পাইলট তোমার হয়ে কাজ করত, এই মেয়েটি হল তার বউ। কিন্তু তা কেমন করে হবে? তারা তো মেয়েটিকে হত্যা করেছিল?

–হ্যাঁ, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বলতে থাকেন, মেয়েটিকে তারা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

মেলিনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তাকে আরও সাবধান হতে হবে। মেলিনাকে বোকা মনে করার মতো কোনো কারণ নেই। মেয়েটিকে বিয়ে করা তাঁর জীবনের সবথেকে বাজে সিদ্ধান্ত। ডেমিরিস ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন।

.

দশ বছর আগে মেলিনা লামব্রো এবং কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিয়ে নানা জায়গাতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এরই পাশাপাশি ব্যবসায়িক মহল উল্লসিত হয়ে

উঠেছিল। এথেন্স থেকে রিভেয়ারা, নিউ পোর্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল গুজব। কেন তারা এইভাবে বিয়েতে আবদ্ধ হলেন? কী আকর্ষণ? মাত্র এক বছরের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত?

.

ছোট থেকেই মেলিনা তার নিজস্ব ইচ্ছেকে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি নাবিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পরিবারের এক সোফেয়ার তাকে সমুদ্র বন্দরে বসে থাকতে দেখে। শেষে অবধি অনিচ্ছুক মেলিনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বারো বছর বয়সে তিনি একটি সার্কাস দলের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিলেন।

সতেরো বছর বয়সে মেলিনা অসাধারণ রূপবতী হয়ে ওঠেন। হাতে অঢেল পয়সা, কারণ তিনি মিহালিস লামব্রোর কন্যা। মিহালিসের নাম সবাই জানে। শহরের সব থেকে ধনী ব্যক্তি, খবরের কাগজের পাতায় তার নামে নিয়মিত গসিপ প্রকাশিত হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে বান্ধবী-বন্ধু পালটাচ্ছেন তিনি, ভাব জমাচ্ছেন যুবরাজ এবং যুবরানিদের সঙ্গে। সব সময় কল্পিত জগতের বাসিন্দা হয়ে বসবাস করতে চাইছেন। তবে মেলিনার চরিত্রে তখনও পর্যন্ত কাদা লাগেনি। অকলঙ্কিতা ছিলেন তিনি। স্পাইরস নামে মেলিনার এক ভাই ছিলেন, মেলিনার থেকে দশ বছরের বড়ো, তারা একে অন্যকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন। মেলিনার তেরো বছর বয়সে, মা-বাবার মৃত্যু হয়, তারা নৌকোডুবিতে মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকেই স্পাইরস তার আদরের বোনটিকে বুড়ো করতে থাকেন।

স্পাইরস সব সময় মেলিনার পাশে নিরাপত্তার ব্যূহ রচনা করতেন। মেলিনা তখন উনিশ বছরে পৌঁছে গেছেন, স্পাইরস মেলিনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনি মেলিনার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মেয়েটিকে ঝড়ঝাঁপটা থেকে রক্ষা করতে হবে।

সব সময় তিনি মেলিনার কানে মন্ত্র দিতেন–তোমাকে আরও সাবধানী হতে হবে। মনে রেখো, পৃথিবীর সর্বত্র শ্বাপদ শয়তানরা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তোমার বয়স কম, তোমার হাতে অপরিমাপ্য অর্থ আছে, তুমি খুবই সুন্দরী, সর্বোপরি তুমি একটা বিরাট বংশের নাম বহন করছ।

-ব্রাভো, আমার প্রিয় দাদা! আমি সব জানি, আশি বছর বয়স হলেও বোধহয় তুমি আমাকে ছোট্ট খুকিটি ভাববে। তাই তো? এইভাবে কুমারী হয়েই আমি চোখ বুজবো নাকি?

–এত চিন্তা কোরো না মেলিনা। ঠিক সময় তোমার জীবনে ঠিক মানুষের আবির্ভাব ঘটবে।

.

তার নাম কাউন্ট ভাসিলিস ম্যানোস। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একটি পুরোনো অভিজাত গ্রিক পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। মেলিনাকে দেখে উনি প্রেমে পাগল হলেন। কিছুদিন বাদেই বিবাহের কথা বলতে শুরু করলেন।

স্পাইরস বলেছিলেন–আমার মনে হয় মেলিনা, তুমি ম্যানোসকে বিয়ে করো। ম্যানোস মাটির ওপর পা রেখে হাঁটতে জানেন। ম্যানোস সত্যি সত্যি তোমাকে ভালোবাসেন।

মেলিনার মধ্যে অতটা ঔৎসুক্য জাগেনি। তিনি শুধু বলেছিলেননা, ম্যানোসকে আমি স্বামী হিসেবে মানতে পারছি না। তার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি, তিনি শুধু ব্যবসার ব্যাপারে বকর বকর করেন। আমি আরও–আরও রোমান্টিক একটা ছেলের সন্ধান করছি।

রেগে গিয়েছিলেন দাদা। বলেছিলেন-বিয়ের মধ্যে বাস্তব আছে, কঠিন কঠোর বাস্তব। রোমান্সের পাখি একদিনে শেকল ছিঁড়ে উড়ে যায়। তুমি এমন একজন স্বামীকে নির্বাচন করবে, যার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হবে সুদৃঢ়, যিনি নিজের শক্তসমর্থ পায়ের ওপর হাঁটার। ভরসা রাখবেন, যিনি তোমার সমস্ত খামখেয়ালিপনাকে মেনে চলবেন।

শেষ পর্যন্ত কাউন্ট ম্যানোসের প্রস্তাবটা মেলিনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মেলিনার এই আগ্রহ কাউন্টকে উৎসাহী করে তোলে।

কাউন্ট বলেছিলেন–তুমি আমাকে বিশ্বের সুখীতম সম্রাটে পরিণত করেছ। আমি তোমার সাহচর্যে নতুন জীবন লাভ করলাম। আমি একটা নতুন কোম্পানি তৈরি করতে চলেছি। আমি এর নাম দেব মেলিনা ইন্টারন্যাশনাল।

মেলিনা আরও খুশি হতেন, যদি কাউন্ট এসে তার হাতে বারোটি রক্তাক্ত গোলাপের অভিবাদন রাখতেন।

বিয়ের দিন ঘোষণা করা হল। এক হাজার নিমন্ত্রিতের কাছে কার্ড পাঠানো হল। বিয়েটা কীভাবে জাঁকজমকের সঙ্গে হতে পারে, তাই নিয়ে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হল।

ঠিক এই সময় কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মেলিনা লামব্রোর জীবনে প্রবেশ করেন।

তারা অনেকবার নানা জায়গাতে মিলিত হন। ক্রমশ, শহরের এখানে-সেখানে এই যুগলকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

কোথায় তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল? মনে হচ্ছে কোনো এক পার্টিতে। পার্টির শক্তি বলেছিলেন ইনি হলেন মেলিনা লামব্রো, আর উনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস।

ডেমিরিস তার কালো চোখে মেলিনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–আপনি এই পার্টিতে কতক্ষণ থাকবেন?

–কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে আছে।

–মিস, আপনি কি একটু বাইরে যাবেন? আমার মনে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার এই অপরূপ সৌন্দর্য সুধা পান করি।

মেলিনা হেসেছিলেন–মিথ্যে মিথ্যে আমার সম্পর্কে বানানো কথা বলছেন কেন ডেমিরিস? আমি তো অত সুন্দরী নই।

ডেমিরিস মাথা নেড়ে বলেছিলেন- আপনার সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি যা বলেছি, তাতে সামান্য সত্যি আছে, বেশির ভাগটাই বলতে পারিনি।

একটুবাদে কাউন্ট ম্যানোস গভীর কথাবার্তায় জড়িয়ে গেলেন। সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মেলিনা ডেমিরিসের কথাই ভেবে গেলেন। ডেমিরিস সম্পর্কে অনেক কথাই তিনি শুনেছেন। তবে কখনও তাকে জীবনসাথী করার কথা চিন্তা করেননি। তিনি শুনেছেন, ডেমিরিসের হাতে অঢেল অর্থ আছে, তিনি বিপত্নীক এবং একজন মস্তবড়ো ব্যবসাদার হবার সবকটি গুণ ডেমিরিস করায়ত্ত করেছেন। আরও শুনেছেন, নারী সম্পর্কে ডেমিরিসের উৎসাহ অন্তহীন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি যে আমার দিকে নজর দিয়েছেন, এতেই আমি খুশি। মেলিনা ভেবেছিলেন।

বিয়ের দেবতা আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে হেসেছিলেন, সেই হাসি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের হয়ে উঠেছিল।

**

পার্টির পরের দিন, বাটলার ব্রেকফাস্ট রুমে এসে বললেন মিস লামব্রো, আপনার জন্য একটি প্যাকেট এসেছে। শ্রীযুক্ত ডেমিরিসের সোফেয়ার এই প্যাকেটটি দিয়ে গেলেন।

–ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো।

শেষপর্যন্ত কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মেলিনার জীবনে প্রবেশ করলেন। হ্যাঁ, কী পাঠিয়েছেন তিনি? কী হতে পারে? মেলিনা ভাবতে থাকেন। দামি অলংকার? দাম দেওয়া যায় না

এমন প্রাচীন স্মারক চিহ্ন? আমি কি এটা এখনই ডেমিরিসের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেব?

প্যাকেটটি ছোটো এবং অদ্ভুত আকৃতির। সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত। ভারি সুন্দর! মেলিনা খুলেছিলেন। একটা কার্ড, লেখা আছে–মনে হয় এটা আপনার ভালো লাগবে, কনস্ট্যানটিন।

এটা কী? একটা বই, মেলিনার অত্যন্ত প্রিয় সাহিত্যিক, নিকোস কাজনজাকিস-এর টোডরাবা। কিন্তু আমার মনের খবর উনি রাখলেন কী করে?

মেলিনা একটা ছোট্ট ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এর জন্য সেটুকুই যথেষ্ট।

পরদিন সকালে আরেকটা প্যাকেট এল। কী আছে সেখানে? এক বিখ্যাত গীতিকারের গান, উনি হলেন ডেলিয়াস। লেখা আছে–টোডারাবা বইটি পড়তে পড়তে এই গান শুনবেন। তাহলে সময়টা ভালো কেটে যাবে।

তারপর থেকে প্রত্যেকদিন উপহার আসতে থাকে। প্রিয় ফুল, প্রিয় সুগন্ধি, প্রিয় বই, প্রিয় রেকর্ড। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বোধহয় জানতেন, কীভাবে মেলিনাকে খুশি করা যায়। না হলে মেলিনার ব্যক্তিগত আবেগ এবং অনুভূতি সম্পর্কে তিনি এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন কী করে?

মেলিনা টেলিফোন করেছিলেন, ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। ডেমিরিস বলেছিলেন, আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আপনাকে খুশি করার মতো ক্ষমতা অথবা সাহস কোনো কিছুই আমার নেই।

এর আগে হয়তো অন্য কাউকে উনি একই সংলাপ বলেছিলেন।

–মেলিনা, আপনি কি আমার সাথে লাঞ্চে যাবেন?

এই প্রশ্নের জবাব কী হতে পারে?

মেলিনা ভেবেছিলেন, এই মানুষটিকে দুঃখ দিয়ে কী হবে?

তারপর? শেষ অবধি সব কিছু কেমন ঘটে গেল। কাউন্ট ম্যানোসের কানে সব কথা পৌঁছে গেছে। উনি ভাবীপত্নীর সঙ্গে ডেমিরিসের এই সখ্যতা মোটেই পছন্দ করছেন না। তাই নিয়ে সামান্য মন কষাকষি। কিন্তু কী হবে ভবিষ্যতে!

***

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ফ্লোকা রেস্টুরেন্টটি ভাড়া করেছিলেন। জায়গাটা ভারি সুন্দর! মেলিনার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। মেলিনাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। –শেষ অবধি আপনি এসেছেন, আমি ভেবেছিলাম হয়তো আপনার মনের পরিবর্তন ঘটেছে।

না। আমি কথা রাখার চেষ্টা করি।

মেলিনার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি অপলক চোখে, বলেছিলেন–আমিও কথা রাখব। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাইছি।

মেলিনা মাথা নেড়েছিলেন। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। কিছুটা বিরক্ত এবং কিছুটা উল্লসিত।

–ডেমিরিস, আপনি আমাকে জানেন না, আমি অন্য একজনের বাগদত্তা।

–ম্যানোস? হাত নেড়ে ডেমিরিস বলেছিলেন–ম্যানোস আপনার উপযুক্ত পাত্র নয়।

–ঠিক আছে, কিন্তু কেন?

–আমি তার ওপর কড়া নজর রেখেছি। তার বংশের সকলে উন্মাদ। তিনি হেমোফিলিয়াক রুগি। তাঁকে ব্রাসেলসে একবার ধরা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। তিনি টেনিস নিয়ে মৃত্যুর খেলা খেলতেন।

মেলিনা জিজ্ঞাসা করল–আপনি?

–আমি টেনিস খেলি না।

–তাই! তাই বোধহয় আপনাকেই বিয়ে করতে হবে।

–নিশ্চয়ই তা নয়। কারণটা আমি বলছি। আমি আপনাকে বিশ্বের সুখীতমা রমণীতে পরিণত করব। এটাই আমার অঙ্গীকার।

শ্রীযুক্ত ডেমিরিস....

ডেমিরিস বলেছিলেন–কোস্টা।

করমর্দন করার ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মেলিনা হাত বাড়িয়ে দেননি। মেলিনা বলেছিলেন–আমি এখানে একটা কথা বলতে এসেছি। প্লিজ কাল থেকে আমাকে আর কোনো উপহার পাঠাবেন না। আমি আপনাকে আর কোনোদিন দেখতে চাই না।

অভাবিত এই আক্রমণে ডেমিরিস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ মেলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন–আপনাকে দেখে তো মনে হয় না আপনি এত নির্মম প্রকৃতির।

-তা হয়তো নয়।

–তাহলে? আপনি আমার হৃদয় ভেঙে দিলেন!

–আমার মনে হয় না যে আপনার মনটা কাঁচ দিয়ে তৈরি আর সেটা এত সহজে ভেঙে যাবে। বাজারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান আছে।

–হ্যাঁ ছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত। আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি, পরে আপনার সঙ্গে সত্যি সত্যি দেখা হয়েছে।

ডেমিরিসের কণ্ঠস্বরে ঝরছে শিশুর উত্তেজনা।

মেলিনা হেসে ফেলেছিলেন।

–আমি কিন্তু এই ব্যাপারটায় খুবই আন্তরিক। অনেক বছর আগে আমি লামব্রো পরিবারের কথা জেনেছিলাম। আপনারা অত্যন্ত ধনী পরিবার। আমরা দরিদ্র ঘরের সন্তান। আমার কিছুই ছিল না। দিন আনি দিন খাই অবস্থা। আমার বাবা ছিলেন একজন স্টেভেডার, তাঁকে স্পাইরসের কাছে কাজ করতে হত। আমাদের চোদ্দো জনের বিরাট পরিবার। সব সময় সবকিছুর জন্য লড়াই করতে হত।

কিন্তু এখন আপনি তো যথেষ্ট ধনী।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি যতটা ধনী হতে চাই ততটা এখনও হতে পারিনি।

কীভাবে আপনি অর্থ সংগ্রহ করলেন?

–ক্ষুধা, আমি সবসময় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, এখনও।

মেলিনা তাকালেন ডেমিরিসের চোখের দিকে। হ্যাঁ, সেখানে যে ভাষা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে কোনো প্রতারণা নেই।

–আপনার রূপকথার মতো জীবনের গল্পটা আমাকে বলবেন? কীভাবে সবকিছু শুরু হয়েছিল।

–সত্যি সত্যি আপনি সব কিছু জানতে আগ্রহী?

মেলিনা বললেন–হ্যাঁ, আমি সত্যিই জানতে চাইছি।

–তখন আমার সতেরো বছর বয়স। আমি একটা ছোট্ট তেল কোম্পানিতে চাকরি করতাম। মধ্য প্রাচ্যে। কিন্তু আমার কিছুই ছিল না। একদিন এক ভূতত্ত্ব বিশারদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি একটা বিরাট তেল কোম্পানিতে কাজ করেন। আমি সেই রাতে স্টিক অর্ডার দিয়েছিলাম, তিনি খালি সুপ খাচ্ছিলেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, এর কারণ কী। উনি বলেছিলেন, ওঁর পেছনের দিকের দাঁত নেই। তিনি নকল দাঁত কিনতে পারছিলেন না, পকেটে পয়সা নেই। আমি নতুন দাঁত কেনার জন্যে ওঁর হাতে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছিলাম। একমাস বাদে উনি মাঝরাতে আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, একটা নতুন তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গেছে। মালিককে তখনও পর্যন্ত কিছু বলেননি। পরদিন সকালে আমি চারপাশ থেকে টাকা ধার করতে শুরু করলাম। সবকিছু বেচে দিলাম। বিকেল বেলা আমার নতুন আবিষ্কারে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে দেখা গেল এটাই পৃথিবীর অন্যতম বড়ো তেলের খনিতে পরিণত হয়েছে।

মেলিনা প্রত্যেকটি কথা শুনছিলেন, ঔৎসুক্য ঝরে পড়ছিল তার অভিব্যক্তির মধ্যে। এ যেন সিনেমার গল্প! মাঝেমধ্যে বাস্তব কত রঙিন হয়ে ওঠে।

–এটাই হল শুরু। এবার ট্যাঙ্কারের দরকার, নাহলে তেল পরিবহন করব কী করে? তখন আমার এসব কিছুই ছিল না। তারপর আমি একটা ফ্লিটের মালিক হলাম। রিফাইনারি স্থাপন করলাম। এয়ারলাইনের অধিকারী হলাম। আরও আরও কত কী!

দেখা গেল, তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করছেন। কেন? জীবনটা গল্পের থেকে ভয়ংকর বলেই কী? তাই বোধহয় হবে।

.

মেলিনা লামব্রো কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে দেখা করার কথা ভাবেননি। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল যে, সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি পালটে গেল। ডেমিরিস হয়তো একই পার্টিতে আসছেন। একই থিয়েটারে দেখা হচ্ছে। একই চ্যারিটি শোতে। এটা কি ঈশ্বরের যোগাযোগ? ডেমিরিসের প্রতি মেলিনা একটা অদ্ভুত প্রতিটান অনুভব করছেন। তার কেবলই মনে হচ্ছে ডেমিরিসের চরিত্রে চুম্বক লাগানো আছে। কিন্তু ম্যানোস? নাঃ, ম্যানোসকে আর ভালো লাগছে না। ম্যানোসের সাহচর্য বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে।

মেলিনা লামব্রো ফ্লেমিশ পেইন্টারদের ছবি ভালোবাসেন, ব্রুজেলসের হান্টার ইন দ্য স্নোতার অত্যন্ত প্রিয় ছবি। ছবিটি বাজারে এল, কনস্টাটানটিন ডেমিরিস এক কপি পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনাটা মেলিনাকে অবাক করল।..

মেলিনা তাঁর নিজস্ব পছন্দ সম্পর্কেও হয়তো এত খবর জানতেন না। তবুও তিনি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন–আপনার কাছ থেকে এত দামি উপহার আমি গ্রহণ করব কেন?

-না, এটা তো আমি উপহার হিসাবে দিচ্ছি না। এর জন্য আপনাকে দাম দিতে হবে।

কী দাম?

–আজ রাতে আপনি আমার সাথে ডিনার করবেন।

মনের সাথে লড়াই করে মেলিনা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন। সত্যি, এই লোকটিকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না! একটা অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ আছে তার চরিত্রের মধ্যে।

এক সপ্তাহ বাদে মেলিনা কাউন্ট ম্যানোসের সাথে তার এনগেজমেন্ট ভেঙে দিলেন। অর্থাৎ তখন তিনি স্বাধীন বিহঙ্গী হয়ে গেছেন।

এই খবরটা তিনি দাদাকে জানালেন। দাদা অবাক হয়ে গেলেন। স্পাইরস বললেন কেন কী হয়েছে? তুই এমন করছিস কেন?

–আমি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে বিয়ে করতে চলেছি।

স্পাইরস আরও অবাক।

–এমন করিস না বোন, লক্ষীটি, তুই ডেটিরিসকে বিয়ে করতে পারিস না! লোকটা একটা দানব, ভদ্রবেশি শয়তান, ও তোর জীবনটাকে ছারখার করে দেবে।

না, দাদা তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে। মানুষটা সত্যিই চমৎকার! আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

–সে কী? তুই লোকটাকে ভাললাবেসে ফেলেছিস? পরে বুঝতে পারবি, ও ভালোবাসার কিছু বোঝে না। ও তোর মতো বিখ্যাত মেয়ের সান্নিধ্যে আসতে চাইছে।

না, এইসব অতীতের ঘটনা। স্পাইরস, আমি জানি আমি খুব ভালো স্ত্রী হতে পারব।

স্পাইরস বুঝল বোনের সাথে পূর্বেকার সখ্যতা হারিয়ে গেছে। সে এখন সম্পূর্ণভাবে ডেমিরিসের গুণমুগ্ধ। অতএব বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হল। একমাস বাদে মেলিনা লামব্রো এবং কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।

প্রথমে মনে হয়েছিল এটা একটা সুন্দর বিবাহ ব্যবস্থা। একে অন্যকে উজাড় করে দিচ্ছেন সীমাহীন ভালোবাসা। কনস্ট্যানটিনের চরিত্রের মধ্যে কোনো কলঙ্ক নেই। প্রতিমুহূর্তে স্ত্রীর প্রতি অনুগত তিনি। নিত্যনতুন উপহার দিয়ে স্ত্রীর মন ভরিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম রাত, মধুচন্দ্রিমা, উনি বলেছিলেন–আমার প্রথম স্ত্রী আমাকে সন্তান দিতে, পারেনি। আমি আশীর্বাদ করছি, আমি তোমাকে অনেকগুলো ছেলে উপহার দেব।

মেলিনা বলেছিলেন–মেয়ে নয় কেন?

তুমি যদি চাও তা-ও হবে, কিন্তু প্রথমে আমি ছেলে চাইছি।

যেদিন খবরটা পৌঁছোল, মেলিনা গর্ভবতী কনস্ট্যানটিন হেসে উঠেছিলেন। সেই হাসির মধ্যে অহংকারের ছোঁয়া ছিল, ছিল আত্মতৃপ্তির ছাপ।

–ওই ছোট্ট শিশুটি একদিন আমার বিরাট সাম্রাজ্যের দায়দায়িত্ব নেবে। কনস্ট্যানটিন আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন।

তখন গর্ভের তিনমাস চলেছে। কিন্তু, মেলিনার গর্ভপাত হয়ে গেল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তখন বাইরে ছিলেন, এই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। তিনি ফিরে এলেন। খবরটা শুনলেন, উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকলেন।

তিনি বিস্ময়ে চিৎকার করে বলেছিলেন কী করে হল? কীভাবে ঘটল?

-কোস্টা...।

–তুমি এত অমনযোগী কেন?

না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি...

কনস্ট্যানটিন গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন–ঠিক আছে, যেটা হবার তা তো হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একটা পুত্রসন্তান চাইছি।

না, আমি....

মেলিনার দুচোখে তখন লবণাক্ত অশ্রুর ইশারা।

–তুমি কী বলতে চাইছ?।

–ওরা একটা অপারেশন করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের আর কিছু করার ছিল না। ভবিষ্যতে আমি কখনও সন্তানের জননী হতে পারব না।

এই কটি কথা বিষতীরের মতো আক্রমণ করেছিল কনস্ট্যানটিনকে। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন পাথরের মূর্তি হয়ে। তারপর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

তখন থেকেই মেলিনা তার জীবনে একটা মূর্তিমান শয়তানি হিসেবে বিরাজ করছেন। মেলিনার সাহচর্যের কথা ভাবলেই নরকের অন্ধকারকে মনে করেন তিনি। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার এই স্ত্রীকে আর কতদিন বহন করবেন? তিনি সুনিশ্চিত, ওই শয়তানি ইচ্ছে করেই তার গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করেছে। তখন থেকেই ডেমিরিস মেলিনাকে উপেক্ষা করতে শুরু করলেন। অন্যান্য মহিলাদের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠলেন।

মেলিনা সব কিছু বোঝেন। কিন্তু তিনি এটাও জানেন, ব্যাপারটা সর্বসমক্ষে আনলে আরও কষ্ট হবে। অথচ স্বামী এমন বেপরোয়া আচরণ করেন! বান্ধবীদের সাথে সিনেমা দেখতে যান, অপেরা সিঙ্গারদের সঙ্গে আলাপন করেন। এমনকি কয়েকজন বন্ধুর স্ত্রীও তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে পরিণত হয়েছেন। পাসারাতে নিজস্ব বাংলো আছে তার। তিনি মাঝেমধ্যে প্রমোদ তরণীতে ভেসে বেড়ান। জনগণের সামনে রক্ষিতাদের নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের এই রোমাঞ্চকর

অভিসারের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে লেখে। সবই মেলিনার কানে যায়, কিন্তু তিনি নিরুপায়। তিনি জানেন, এই অপরাধের হয়তো কোনো ক্ষমা নেই।

একবার একজন বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ এসেছে। ব্যাঙ্কার বললেন– আপনাকে আর মেলিনাকে অবশ্যই আসতে হবে। আমি একজন প্রাচ্যদেশীয় শেফকে নিয়ে এসেছি। তার হাতের চাইনিজ রান্না, আহা, খেলে ভুলতে পারবেন না!

অতিথিদের তালিকাটা ছিল দেখার মতো। সেখানে দেশের সেরা শিল্পীরা আসবেন। আসবেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা, শিল্পপতিরা। খাবারটাও সত্যিই চমৎকার! শেফ বানিয়েছিল হাঙরের ফিন সুপ, মো সু শুয়োরের মাংস, হাঁসের মাথা ক্যানটনের ন্যুডলস, আরও কত কী!

মেলিনা ওই গৃহকর্তার পাশেই বসেছিলেন। আর ডেমিরিস ছিলেন গৃহকর্ত্রীর পাশে। ডেমিরিসের পাশে একটা অল্পবয়সী মেয়ে বসেছিল, সম্প্রতি সে ছায়াছবির জগতে পা রেখেছে। ডেমিরিস বারবার ওই অভিনেত্রীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। মেলিনার কঠিন কঠোর চোখের নিষেধ তার উৎসাহে ভাটা আনতে পারেনি।

–ছবিটা শেষ করার পর তুমি অবশ্যই আমার এমোদ তরণীতে একবার আসবে। আমি তোমাকে একটা সুন্দর ছুটি উপহার দেব। আমরা ডালমাটিয়ান উপকূলে ভেসে বেড়াব।...

মেলিনার কানে সব কথা পৌঁছোচ্ছিল। তবু মেলিনা কিছু না-শোনার ভান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। ডেমিরিস তার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর নীচু

করার চেষ্টা না করে বললেন–তুমি কখনও পাসারাতে গেছ কী? ছোট্ট একটি দ্বীপ, একেবারে ফঁকা, নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব। প্রতিটি মুহূর্ত তোমার ভালো লাগবে।

মেলিনা ওই টেবিলে আসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যাপারটা অশোভন হবে ভেবে তা আর করলেন না।

খাওয়া শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, বাটলাররা ব্যস্ত আছে যে যার কাজে।

ওই অভিনেত্রীর সামনে একটি বাটি রাখা হল। ডেমিরিস বললেন, এটা আর তোমাকে ধুতে হবে না। তারপর তিনি অভিনেত্রীর হাতে হাত রাখলেন। তার হাতের কোণে সসের টুকরো লেগেছিল, ডেমিরিস এক অনুগত প্রেমিকের মতো সস পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। উপস্থিত অতিথিরা এই বিসদৃশ ছবিটির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আছেন। ডেমিরিসের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এবার মেলিনা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন–আমাকে ক্ষমা করবেন, হঠাৎ আমার মাথাটা ধরেছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

মেলিনা ছুটে বেরিয়ে গেলেন। অতিথিরা অবাক চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। ডেমিরিস সেই দিন রাতে বাড়িতে আসেননি। পরের দিনও তাকে দেখা গেল না।

**

স্পাইরস এই ঘটনাটার কথা শুনলেন, তিনি বললেন–আমি ওই কুকুরের বাচ্চাটাকে খুন করব, আমি তোকে কথা দিচ্ছি বোন।

মেলিনা বলেছিলেন, এসব করে কিছু হবে না দাদা, লোকটার স্বভাবটাই এমন।

–ওর স্বভাব? ও একটা জন্তু, তুই কেন ওকে ডিভোর্স দিচ্ছিস না?

মেলিনা ডেমিরিস মাঝেমধ্যে এই প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন। কেন? কেন তিনি আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? রাতের অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয়, একা শয্যায় শুয়ে থাকতে থাকতে এই প্রশ্নটা বারবার তাকে আক্রমণ করে। একটি উত্তর, একটিই উত্তর ভেসে আসে, এখনও, এখনও আমি তাকে ভীষণ ভালোবাসি!

**

সকাল সাড়ে পাঁচটা, ক্যাথেরিনের ঘুম ভেঙে গেল। অবশ্য তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। একজন পরিচারিকা বলছে-শুভ সকাল মিস।

ক্যাথেরিন চোখ খুলল। তাকিয়ে থাকল ঈষৎ বিভ্রান্তির মধ্যে। আহা, কনভেন্টের সেই ছোট্ট সেলটি কোথায় হারিয়ে গেছে। সে একটা বিরাট বেডরুমে শুয়ে আছে। স্মৃতি আবার ফিরে এল। এথেন্সে যাত্রা..তুমি ক্যাথেরিন ডগলাস...তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

–মিস!

–কী বলছ?

–ডেমিরিস জানতে চাইছেন আপনি টেরাসে গিয়ে তার সাথে ব্রেকফাস্ট খাবেন কিনা। ক্যাথেরিনের চোখে নিদ্রা জড়ানো। কণ্ঠস্বরে তন্দ্রাচ্ছন্নতা। সে চারটে পর্যন্ত জেগেছিল। তার মনে ঝড় উঠেছিল।

ধন্যবাদ, ডেমিরিসকে বলো আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি।

**

কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। একজন বাটলার ক্যাথেরিনকে একটা বিরাট টেরেসের সামনে নিয়ে এল। টেরেসের পাশেই সমুদ্র। উঁচু পাথরের পাঁচিল। সুন্দর সাজানো বাগান। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস টেবিলে বসে আছেন, কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ক্যাথেরিনকে আসতে দেখলেন। আহা, ক্যাথেরিনের চরিত্রের মধ্যে এখনও একটা অদ্ভুত সরলতার ছাপ আছে। ডেমিরিস তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রেখেছেন। মনে মনে তিনি নগ্না ক্যাথেরিনকে কল্পনা করলেন। তারা বিছানাতে শুয়ে আছেন। নোয়েলে এবং ল্যারিকে শাস্তি দিতে হবে। ডেমিরিস উঠে দাঁড়ালেন।

শুভ সকাল, এত সকালে আপনার ঘুম ভাঙালাম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস। আসলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাকে অফিসে বেরিয়ে যেতে হবে। তার আগে আপনার সাথে কিছু কথা বলার সুযোগ পেলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করতাম।

ক্যাথেরিন বলল ঠিক আছে, এত কিন্তু করতে হবে না।

ক্যাথেরিন বিরাট মার্বেল টেবিলের উল্টোদিকে বসে পড়ল। মুখোমুখি সমুদ্র। সূর্য এইমাত্র উঠেছে। আহা, সূর্যের আলো সমুদ্রের ওপর ঝিলিক দিচ্ছে!

–ব্রেকফাস্টে আপনি কী নেবেন?

–আমি খুব একটা ক্ষুধার্ত নই।

–একটু কফি খাবেন তো?

–অনেক ধন্যবাদ।

বাটলার ক্যাথেরিনের বেলেক কাপে কফি ঢালতে থাকল।

ক্যাথেরিন, আমাদের গত রাতের প্রস্তাবের বিষয়ে আপনি কী চিন্তা করলেন?

ডেমিরিস জানতে চাইলেন।

ক্যাথেরিন অবশ্য এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। সে বুঝতে পারছে না, এথেন্সে থেকে সে কী করবে? এথেন্সে একটা নগ্ন অতীত বেঁচে আছে, কিন্তু সে যাবে কোথায়? কনভেন্টে আর ফিরে যাবে না। সে শপথ নিয়েছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কাছে কাজ করবে? ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ নয়। শেষ অবধি ক্যাথেরিন নিজেকে বোঝাতে বাধ্য হল, এই প্রস্তাবের মধ্যে উন্মাদনা আছে। হয়তো এভাবেই আমার জীবনে একটা নতুন দরজা উন্মোচিত হতে পারে।

ক্যাথেরিন বলল–হ্যাঁ, আমি...

–কী চিন্তা করেছেন?

–আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখব।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার আনন্দ চেপে রাখার চেষ্টা করলেন ঠিক আছে, আপনার সিদ্ধান্ত শুনে আমি খুশি হয়েছি। আপনি কখনও লন্ডন শহরে গেছেন।

–না, আমি কখনও সেখানে যাইনি।

কিন্তু তার মনে হল, স্মৃতির মধ্যে ওই শহরের ছবি ভাসছে। তার মানে? মনে মনে কখনও কি ক্যাথেরিন ওই শহরের বাসিন্দা হয়েছিল? আর কত, আর কত বিস্ময় আমাকে ক্ষত বিক্ষত করবে!

লন্ডনকে আমরা বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি সুসভ্য শহরের অন্যতম বলতে পারি। আমার মনে হয় সেখানকার বাতাবরণ আপনাকে খুবই উদ্দীপ্ত করবে। লন্ডনবাসীরা চমৎকার সহৃদয় স্বভাবের মানুষ। অজানা আগন্তুকের উদ্দেশে তারা সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন।

ক্যাথেরিন ইতস্তত করতে থাকে।

–ডেমিরিস, আপনি কেন আমার জন্য এত সমস্যার পাহাড় নিজের কাঁধে তুলে নেবেন?

আপনার প্রতি আমার একটা দায়িত্ববোধ আছে। আমি আপনার স্বামীকে নোয়েলে পেজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারটা আমার মনকে কষ্ট দেয়। অপরাধ। বোধ আমাকে আক্রান্ত করে।

আঃ, ক্যাথেরিন শান্তভাবে বললেন। নোয়েলে পেজ, এই নামটা এখনও ক্যাথেরিনকে শিহরিত করে। এরা দুজনে মিলে তাকে মৃত্যুর উপত্যকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। ল্যারি নিশ্চয়ই নোয়েলেকে ভালোবাসতো। কী ভালোবাসা!

ক্যাথেরিন একটি প্রশ্ন করার কথা ভাবছিল। একটুক্ষণ ইতস্তত করে সে জানতে চাইল কীভাবে তাদের হত্যা করা হয়?

কিছুক্ষণ নীরবতা

–তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল। একঝাক বুলেট ছুটে আসে এবং তাতেই...

ডেমিরিস ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করলেন না।

হায় ঈশ্বর! ক্যাথেরিন যেন চোখের সামনে দেখতে পেল ল্যারির দেহে বুলেট লেগেছে। আঃ, ল্যারির মাংস, ল্যারির তাজা রক্ত, যে মানুষটিকে সে এত ভালোবাসতো, তার এই অবনতি! তার এই পরিণতি? মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে ক্যাথেরিন।

–আপনাকে কিছু উপদেশ দিই, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। অতীতের কথা কখনও ভাববেন না। বিশেষ করে আপনার অতীতটা যখন শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ক্যাথেরিন বলল–ঠিকই বলেছেন, আমি চেষ্টা করব।

–ঠিক আছে, একটু বাদে লন্ডনের দিকে একটা প্লেন উড়ে যাবে। ক্যাথেরিন, আপনি কি এই প্লেনের যাত্রী হবেন?

ক্যাথেরিন ভাবল, এর আগে ল্যারির সাথে সে কত জায়গাতে গেছে। তার জন্য কত প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, গোছগাছ করা, কী লাগতে পারে তার তালিকা তৈরি করা। প্রতি মুহূর্তে ছিল আনন্দঘন উদ্বেলতা। আর এখন?

কী আর সঙ্গে নেবে সে? সামান্য কিছু নিলেই তো হবে। সে বলল ঠিক আছে আমি এখনই তৈরি হয়ে নেব।

বাঃ! আচ্ছা, আপনার স্মৃতি তো ফিরে এসেছে, আপনি কোনো কিছু সঙ্গে নিতে চাইছেন কী? অথবা কারো সাথে দেখা করতে চাইছেন যিনি আপনার অতীত সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন?

একটি নাম ভেসে এল, উইলিয়াম ফ্রেজার। ক্যাথেরিনের মনে হল এই পৃথিবীতে একমাত্র উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গেই তার কিছু পরিচয় বেঁচে আছে। ওই ভদ্রলোককে সে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তার কাছে গিয়ে কীভাবে দাঁড়াবে সে? বরং কিছুদিন বাদেই

ক্যাথেরিন উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। আগে নিজের পায়ের ওপর পা রেখে দাঁড়াক, তারপর না হয় ফ্রেজারের নাম চিন্তা করবে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ক্যাথেরিনের মুখের ওপর চোখ রেখেছেন। উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ক্যাথেরিন বলল–না, তেমন কারোর নাম মনে পড়ছে না।

এই ভাবেই ক্যাথেরিন হয়তো নিজের অজান্তে উইলিয়াম ফ্রেজারের জীবন বাঁচিয়ে দিল। যদি একবার ক্যাথেরিন ওই নামটা উচ্চারণ করত তাহলে...? তাহলে ডেমিরিস কি ওই ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে রাখতেন?

–আমি আপনার জন্য একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে রাখব। ক্যাথেরিনের হাতে তিনি একটি মুখবন্ধ খাম তুলে দিয়ে বললেন–এখানে আপনার বেতনের অ্যাডভান্স দেওয়া আছে। যেখানে আপনি থাকবেন, সবাই আপনাকে ভালোবাসবে। আমাদের কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, আপনি সেই ফ্ল্যাটেই থাকবেন।

ব্যাপারটা অভাবিত। ক্যাথেরিন বলে–শুধু শুধু আমাকে এত ঋণী করছেন কেন?

এবার হাতে হাত রাখা হল।

–শেষ অবধি আপনি দেখবেন আমি...

মনের গোপন কথাটা ডেমিরিস ব্যক্ত করলেন না। গলার স্বরে পরিবর্তন আনলেন। খুব সাবধানে এই ভয়ংকর খেলাটা খেলতে হবে। সামান্য ভুল হলেই সর্বনাশ।

তিনি শুধু বললেন আমি একজন ভালো বন্ধু হতে পারি, এ ব্যাপারটা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

–আপনি এখনই আমার একজন উপকারী বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন।

ডেমিরিস হাসলেন। হাসির মধ্যে একটি শব্দ তার লেখা আছে, তা হল–অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর তাহলেই আমার আসল স্বরূপ বুঝতে পারবে।

**

দু ঘণ্টা কেটে গেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ক্যাথেরিনকে রোলসরয়েসে করে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন-লন্ডন আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে। আমি কিন্তু সবসময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলব।

পাঁচ মিনিট বাদেই গাড়িটা চলে গেছে। ডেমিরিস লন্ডনে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে–মেয়েটি তাসছে, তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

.

০৫.

হেলেনিকন এয়ারপোর্ট। সকাল নটা। প্লেন ছাড়বে। হকার সিডলে, ক্যাথেরিন, আর কেউ আছে কী? পাইলট, এক সুন্দর মুখের মাঝবয়েসি গ্রিক ভদ্রলোক। নাম প্যান্টেলিস, দেখলেন, ক্যাথেরিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

–কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের উড়ান পাখি উড়বে। তিনি বললেন।

ধন্যবাদ।

ক্যাথেরিন ককপিটের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পাইলট এসে গেছেন। কিন্তু, সেই প্লেনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কেন? এই প্লেনেই ল্যারি উঠেছিল। নোয়লে পেজ এই সিটে বসেছিলেন, যেখানে আমি বসে আছি? ক্যাথেরিনের মনে হল, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করল। গভীরভাবে শ্বাস নিল। তারপর, তারপর ভাবল, ডেমিরিসের কথাই ঠিক। অতীতের কথা ভেবে কী লাভ? যে অতীতটা কবরেই শুয়ে আছে, সেখানেই সে শুয়ে থাক। আমরা শত চেষ্টা করেও তো অতীতের ঘটনাবলিকে পালটাতে পারব না।

ইঞ্জিনের আর্তনাদ শোনা গেল। ক্যাথেরিন চোখ খুলল। প্লেনটা এবারে উড়বে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে। লন্ডন শহরের দিকে। কতবার ল্যারি এই প্লেনে চড়ে এখানে-সেখানে গেছে? সমস্ত আবেগ, সমস্ত অনুভূতি, এখন অতীত! আঃ, অতীত–রক্তাক্ত এবং বিষাক্ত!

**

১৯৪০ সালের গরমকাল, আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হবার আগের বছর। নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। চেষ্টা করছে চাকরি নিতে, শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন, যে-কোনো জায়গায়, তার প্রথম চাকরি।

রুমমেট বলেছিল–আমি তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি। পার্টিতে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে টেকসাসে ফিরে কথা বলছিল। সে উইলিয়াম ফ্রেজারের অফিসে চাকরি করে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক আছে। গতকাল রাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তুমি কি সত্যি সত্যি চাকরি করতে চাও?

জীবনটা একটা বাজি, ক্যাথেরিন জানতো। শেষ অবধি ফ্রেজারের রিসেপশন অফিসটা সে দেখতে পেল। দেখল অনেক মানুষের ভিড়। তবু একটা সুযোগ নিতে দোষ কী? ক্যাথেরিন ভেবেছিল। হঠাৎ ভেতরের অফিসের ঘরের দরজা খুলে গেল। উইলিয়াম ফ্রেজার বেরিয়ে এলেন। লম্বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কোঁকড়ানো সোনালি চুল মাথায়। উজ্জ্বল নীল দুটি চোখে দীপ্তি। শক্ত সমর্থ পুরুষ।

তিনি রিসেপশনিস্টকে বললেন–লাইফ পত্রিকার একটি কপি দাও তো। তিন অথবা চার সপ্তাহ আগে যে পত্রিকাটা বেরিয়েছে। কভারে স্টালিনের ছবি আছে।

রিসেপশনিস্ট বলল–আমি এটা আনিয়ে দিচ্ছি ফ্রেজার।

স্যালি, সেনেটর বরো লাইনে আছেন। আমি ওই সংখ্যা থেকে ওঁকে একটা নিবন্ধ পড়ে শোনাবো। দু-মিনিটের মধ্যে কপিটা আনতে হবে।

উনি দ্রুত ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ওঁর এই অভাবিত আচরণে চাকরিপ্রার্থীরা অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেকে ক্লান্তিতে কাধ ঝেড়েছিল। অনেকের চোখে ফুটে উঠেছিল উত্তেজনা।

ক্যাথেরিনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সবকিছু শান্তমনে ভাববার চেষ্টা করছিল। সে দ্রুত পায়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে আসবার সময় সে শুনতে পেয়েছিল এক ভদ্রমহিলার স্বর ভালো, আর একজন সরে গেল।

তারপর? তিন মিনিট কেটে গেছে, ক্যাথেরিন স্টালিনের ছবি ওয়ালা লাইভ পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সেটা রিসেপশনিস্টের হাতে দিয়েছে। পাঁচ মিনিট বাদে ক্যাথেরিন নিজেকে দেখল উইলিয়াম ফ্রেজারের পাশে বসে থাকতে।

–স্যালি আমাকে সব বলেছে, তুমি লাইভ ম্যাগজিন নিয়ে এসেছ।

–হ্যাঁ স্যার।

–ভাবতেই পারছি না! তোমার পার্সে তিন সপ্তাহের আগের কাগজ থাকল কী করে?

না, স্যার।

–তুমি এত তাড়াতাড়ি আনলে কী করে?

–আমি সেলুনে গিয়েছিলাম। সেলুনে এবং দাঁতের ডাক্তারের অফিসে এইসব পুরোনো পত্রিকা পড়ে থাকে।

–তুমি বুঝি সব ব্যাপারেই এরকম চালাক চতুর চটপটে?

–না, স্যার।

-ঠিক আছে, তোমাকে আমার কাজে লাগবে। উইলিয়াম ফ্রেজার বলেছিলেন। সেই থেকে ক্যাথেরিনকে কাজে লাগানো হল।

ক্যাথেরিন ফ্রেজারের কাছে কাজ করতে শুরু করলেন। ফ্রেজার তখনও পর্যন্ত বিয়ে করেননি। যথেষ্ট পয়সা আছে তাঁর। সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কেও তিনি সচেতন। ওয়াশিংটন শহরের অনেকের সাথে তার চেনাজানা। টাইম পত্রিকা তাকে বছরের অন্যতম ব্যাচেলারের আখ্যা দিয়েছে।

ছ-মাস কেটে গেছে। ক্যাথেরিনের কাজ এগিয়ে চলেছে। উইলিয়াম ফ্রেজারকে ভালোবাসতে শুরু করে দিল সে। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল ভালোবাসা, তীব্র আকুতি।

উইলিয়াম ফ্রেজারের শোবার ঘরে শুয়ে ক্যাথেরিন বলেছিল–আমি তোমাকে একটা সত্যি কথা বলতে চাই, এখনও আমি সর্বাংশে কুমারী।

ফ্রেজার মাথা নেড়ে বলেছিলেন–ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য! আমি কী করে জানব, ওয়াশিংটন শহরের একমাত্র কুমারী কন্যার সঙ্গে সঙ্গম করতে চলেছি?

.

একদিন উইলিয়াম ফ্রেজার ক্যাথেরিনকে বললেন–আমাদের অফিস আর্মি এয়ার কর্পস ফি দেখাশোনা করবে। হলিউডের এমজি এম স্টুডিওতে শুটিং শুরু হবে। আমি লন্ডনে থাকব। তুমি আমার অবর্তমানে সব দায়িত্ব নিতে পারবে তো?

আমি? উইল, আমি এত বড়ো কাজ করব কী করে? আমি কি ফিল সম্পর্কে কিছু জানি?

ফ্রেজার বলেছিলেন–সব কিছু তোমাকে জানতে হবে। তুমি মোটেই চিন্তা কোরো না। ওদের একজন ডিরেক্টর আছে, তিনি হলেন অ্যালান বেনজামিন। উনি তোমাকে সব রকম সাহায্য করবেন।

–তুমি আমাকে এত বড়ো দায়িত্ব দিচ্ছ কেন?

–আমার মনে হয় এই কাজটা তুমিই ভালো করতে পারবে।

–ঠিক বলছ?

অতএব, ক্যাথেরিনকে হলিউডে উড়ে যেতে হল। ওই শিক্ষানবীশ ফিল্মটি দেখাশোনা করার জন্য।

**

এক্সট্রারা চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। বেশির ভাগই এলোমেলো ভাবে পোশাক পরেছে।

ক্যাথেরিন জিজ্ঞেস করেছিল–অ্যালান, বেনজামিন কোথায়?

–ওই ছোট্ট কলপোরাল? উনি ওখানে ঘুমিয়ে আছেন।

ক্যাথেরিন এগিয়ে গেল। একটা রোগা চেহারার মানুষকে দেখা যাচ্ছে। কলপোরালের পোশাক পরা। সবকিছু তদ্বির করার চেষ্টা করছেন।

নাঃ, এভাবে কাজ হয় না। সবাই মাতব্বরি করছে, কিন্তু কেউ কাজ করতে চাইছে না। সবাই যদি চিফ হয় তবে ইন্ডিয়ান হবে, কে?

ক্যাথেরিন বলেছিল–আমি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি কাজে যোগ দিয়েছেন! আমার কী কাজ সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। ডিয়ারবোনে আমি একটা ভালো কাজ করতাম, ফার্নিচার ট্রেড ম্যাগাজিন সম্পাদনার। বছরে পঁয়ত্রিশ শো ডলার মাইনে পেতাম। সেখান থেকে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আমি কি ছাই পরিচালনার কিছু বুঝি! যাক আপনি এসে গেছেন, নিজের কাজ বুঝে নিন।

কথাগুলো বলেই ক্যাথেরিনকে অবাক করে দিয়ে তিনি দ্রুত নিষ্ক্রমণ পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এক পাতলা চেহারার মানুষকে দেখা গেল, সোয়েটার পরে এগিয়ে আসছে ক্যাথেরিনের দিকে। স্মিত হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটের কোণে।

কেউ কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

ক্যাথেরিন আরও বলেছিল, বুঝতে পারছি, এই অবস্থার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আমি তো কিছুই করতে পারব না।

তারপর সেই শুভ সংবাদ।

–হলিউড আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আমি টম ওব্রায়ান। আমি হলাম সহকারী পরিচালক।

আপনি কি মনে করেন আমি এখানে কাজ করতে পারব?

ভদ্রলোকের ঠোঁট কাঁপছে–আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, উইলি ওয়াইলারের সাথে আমি ছটি ছবিতে কাজ করেছি। এতটা খারাপ অবস্থা কোথাও দেখিনি। সবকিছু আছে, খালি শৃঙ্খলার অভাব। চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে, সেটও তৈরি হয়েছে।

ক্যাথেরিন চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

–কিছু কিছু ইউনিফর্ম খুবই বাজে। দেখা যাক ভালো ইউনিফর্ম পাওয়া যায় কিনা। ওব্রায়ান মাথা নেড়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে।

ক্যাথেরিন এবং ওব্রায়ান এক্সট্রাদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। অনেককেই সচতুর বলে মনে হল, কেউ কেউ একেবারে বাজে, ফালতু।

ওব্রায়ান বললেন মিস আলেকজান্ডার, আপনার সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। এদের নিয়েই তো আপনাকে চলতে হবে।

ক্যাথেরিন বলেছিল- হ্যাঁ, একটু ভালো চেহারার ছেলেদের বাছুন তো। আখেরে কাজ দেবে।

ওব্রায়ান কাজ করতে শুরু করলেন। ক্যাথেরিন উল্লসিত হাসির চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। কারা যেন কথা বলছে। তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। এক্সট্রা মেয়েদের সাথে গপ্পুরি করছে। হি হি হো হো হাসির টুকরো শোনা যাচ্ছে।

বিশেষ করে একটি মানুষ, উদ্ধত স্বভাবের। তার আচরণ ক্যাথেরিনকে দুঃখ দিয়েছে।

–আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?

লোকটি আলস্য ভাবে বলেছিল- আপনি আমার সাথে কথা বলতে চাইছেন?

সে সত্যি সুপুরুষ, দীর্ঘদেহী, তার মাথায় একরাশ লাল-কালো চুলের সমাহার। চোখ দুটিতে ঝড়ের ইশারা। ইউনিফর্মটা তার গায়ে বেশ মাপ মতো হয়েছে। তার কাঁধের ওপর ক্যাপ্টেনের স্মারক চিহ্ন। বুকের ওপর রঙিন রিবন বাঁধা।

ক্যাথেরিন তার দিকে তাকাল। বলল–এই পদকগুলো?

–এগুলো দারুণ সম্মানের, তাই না?

–কিন্তু এগুলো তো খুলে ফেলতে হবে।

–কেন? আমার মনে হয় পদকগুলো থাকলে ছবিটা আরও রঙিন হয়ে উঠবে।

ছেলেটির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

ক্যাথেরিন কঠিন স্বরে বলতে থাকে আমেরিকাতে কি এখন যুদ্ধ হচ্ছে? এই পদকগুলো পরে অভিনয় করলে ছবিটা কার্নিভালে দেখানো যাবে না।

–আপনি ঠিকই বলেছেন, ছেলেটি তার ভুল স্বীকার করে নিল। আমি অতটা তলিয়ে দেখিনি। ঠিক আছে আমি খুলে ফেলছি।

–সব কটা খুলবেন কিন্তু, মনে থাকে যেন, এটা হল আমার আদেশ।

ক্যাথেরিনের কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর ভাসছে।

.

সকালবেলাকার শুটিং শেষ হয়ে গেছে। ক্যাথেরিন কমিসারিতে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। ছেলেটি তার কাছে পৌঁছে গেল। বলল–আজ সকালে আমার শুযটিং কেমন লেগেছে? তাই জানতে এসেছি।

ছেলেটির ব্যবহার ক্যাথেরিনকে মুগ্ধ করেছে।

ইউনিফর্ম পরে আপনি ভালোই শুযটিং করেছেন। মেয়েদের মধ্যে আপনাকে বেশ । স্বচ্ছন্দ মনে হয়েছিল। আপনি কি বরাবরের জন্য অভিনয় করতে চাইছেন নাকি?

ছেলেটিকে দেখে মনে হল, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সে ভয় পেয়েছে। সে বলতে থাকে ঠিক করে বলুন তো, আপনার চোখে আমার অভিনয় কেমন লেগেছে?

ক্যাথেরিন বলে বসল সত্যি বলছি, আপনাকে উপযুক্ত মনে হয়েছে।

-কেন?

–এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

–আজ রাতে ডিনারের সময় দেখা হবে কি?

-না-না, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না। ক্যাথেরিন বলল। আমি মিঃ ওব্রায়ানকে বলব, আজ সকালের পারিশ্রমিকটা চেকের মারফত আপনার হাতে পৌঁছে দিতে। আচ্ছা আপনার নাম কী?

ডগলাস, ল্যারি ডগলাস।

***

সেই উৎসাহী তরুণ ভদ্রলোকের সাথে এইভাবেই ক্যাথেরিনের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। একটু বাদেই ক্যাথেরিন ঠিক করল তার মন থেকে ওই ছেলেটির মুখ সে মুছে দেবে। তা না হলে কাজ করবে কী করে? কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ছেলেটির মুখচ্ছবি তার মনের ক্যানভাসে আঁকা রইল।

***

ক্যাথেরিন ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছে। উইলিয়াম ফ্রেজার বললেন কতদিন তোমার সাহচর্য পাইনি। তোমার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

ভীষণ ভীষণ। এ ব্যাপারে তোমার কি সন্দেহ আছে বিল?

–তোমাকেও আমি খুব ভালোবাসি, ক্যাথি। চল না আজ রাতে কোথাও যাই। আর আমাদের এই ভালোবাসাটাকে উদ্যাপিত করি।

ক্যাথেরিন জানে, এই রাত তার জীবনে নতুন কোনো খবর বয়ে আনবে। এই রাতেই হয়তো কেউ তাকে এমন একটা প্রস্তাব করে বসবে, যে প্রস্তাবের উত্তরে তাকে হা বলতেই হবে।

তারা অভিজাত জেফারসন ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছিল। ডিনার খেতে খেতে ল্যারি ডগলাসকে দেখা গেল। তখনও আর্মি এয়ারফোর্সের পোশাক তার পরনে। গলায় ঝুলছে একাধিক মেডেল। ক্যাথেরিন তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে টেবিলের কাছে এল। কিন্তু ফ্রেজারকে দেখে মাথাটা সামান্য নীচু করল।

বিল ফ্রেজার উঠে দাঁড়ালেন।

ক্যাথি, এ হল ক্যাপ্টেন লরেন্স ডগলাস। ল্যারি, এ হল মিস আলেকজান্ডার ক্যাথেরিন। ল্যারি আরএএফ-এর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে হল অ্যামেরিকান স্কোয়াড্রনের লিডার। ভার্জিনিয়াতে একটা ফাইটার বেসে এখন কাজ করছে। আমাদের ছেলেরা সেখানে চমৎকার লড়াই করছে।

মনে ইচ্ছে, এটা বোধহয় একটা পুরোনো মুভি। ক্যাথেরিনের মনে হল, সে কিনা ওই পদকগুলো খুলে ফেলতে বলেছিল। এবং ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে তার আদেশ মেনে নিয়েছে। এই মুহূর্তে নিজেকে বড্ড অসহায় বলে মনে হল ক্যাথেরিনের। ভাবল, হায়, আমি কি কাপুরুষের মতো আচরণ করলাম! ইচ্ছে হচ্ছিল টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে মুখ লুকিয়ে বসে থাকবে।

***

পরের দিনই ল্যারি ডগলাস ক্যাথেরিনকে ফোন করেছিল। অফিসের ফোনটা ঝনঝনাৎ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। ক্যাথেরিন কিন্তু টেলিফোনটা ধরতে রাজি হয়নি। অনেক কাজ হাতে ছিল তার। কাজ শেষ হল। দেখা গেল ল্যারি তখনও তার জন্য অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে ল্যারি তার পদকগুলো খুলে ফেলেছে। রিবনটাও খুলে রেখেছে। কেবল সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের চিহ্ন তার পোশাকের ওপর।

সে এক উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি উদ্ভাস করে বলল–এটাই বোধহয় ভালো, তাই না।

ক্যাথেরিন তার দিকে তাকিয়ে আছে নানা, আমি ঠিক তা ভেবে কথাগুলি বলিনি।

-ঠিক আছে। এত ইতস্তত করার কী আছে?

ক্যাথেরিন ল্যারির চোখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারল, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কিছু কিছু ছেলের চেহারার মধ্যে এমন একটা চুম্বক শক্তি লুকিয়ে থাকে, যার প্রভাব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

–সত্যি করে বলল তো আমার কাছ থেকে তুমি কী চাইছ?

–সব কিছু, আমি তোমার সবটুকুর ওপর আমার অধিকার কায়েম করতে চাইছি।

ছেলেটির কথা বলার মধ্যে একটা স্পষ্ট সৎ চিন্তার প্রতিফলন।

দেখা গেল, সে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেছে। ভালোবাসার খেলা শুরু হয়েছে। ক্যাথেরিন এমন আনন্দের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনোদিন।

তারা একে অন্যের কাছে এসেছে। বিশ্বজগৎ হারিয়ে গেছে কোথায়! শেষ অব্দি ঘটে গেল সেই বিস্ফোরণ। অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপ্লাবিত হল সমস্ত শরীর। অবিশ্বাস্য স্পন্দন উত্তেজনা। এমন একটা অভিযান, যার শেষে আছে শুধু সুখ আর সন্তুষ্টি। এর শুরু এবং শেষ কোথায় আমরা তা বলতে পারব না। সব কিছু হয়ে যাবার পর ক্যাথেরিন বোবা–বনে গিয়েছিল। তখনও সে শক্ত করে বিলকে আঁকড়ে ধরেছিল। কিছুতেই বিলকে ছেড়ে যেতে চাইছে না তার মন।

পাঁচঘণ্টা বাদে মেরিল্যান্ডে গিয়ে তারা বিয়ে করেছিল।

.

এখন, প্লেনে বসে, লন্ডনে যেতে যেতে ক্যাথেরিন একটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে। ক্যাথেরিন মনে মনে ভাবতে থাকে আমরা তো আনন্দে মুখরিত ছিলাম। তাহলে

এত সব ঝামেলা কোথা থেকে হল? রোমান্টিক মুভি, ভালোবাসার গান, এসবের কি কোনো । মূল্য নেই? মধ্যযুগীয় নাইট? অস্ত্রের ঝনঝনাত শব্দ? বলা হয়, ভালোবাসার মৃত্যু নেই। আমরা বিশ্বাস করতাম জেমস স্টেয়ার্ট আর ডোনা রিডের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া আছে। আমরা জানতাম ক্লার্ক গ্যাবেল আর ক্লাউডেট কোসবার্ট পরস্পরকে ভালোবাসে। বিশেষ করে ইট হ্যাঁপেন ওয়ান নাইট ছবিটি দেখার পর এই ধারণা আমাদের মনের মধ্যে চেপে বসেছিল। আমাদের চোখে জল আসত, যখন আমরা ফ্রেডরিক মার্চ আর মিরনা লয়ের অভিনয় দেখতাম। দ্য বেস্ট ইয়ারস অফ আওয়ার লাইফ ছবিতে ফ্রেডরিক যেভাবে মিরনাকে প্রত্যাখান করেছিল, সে ব্যাপারটা মনে হলেই বুকটা কেমন ডুকরে কেঁদে ওঠে। জোয়ান ফনটেন লরেন্স অলিভারের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে কত না সুখী হয়েছিল। রেবেকা ছবিটির কথা মনে পড়ে। এখন মনে হচ্ছে এসবই মিথ্যে। সেলুলয়েড কখনও সত্যি কথা বলে না। ওই গানগুলো আমি তোমাকে ভালোবাসব, আমি তোমার কথা চিন্তা করব। তুমি কি আমায় ভালোবাসবে? সমুদ্র কত গভীর?... আরভিন বার্লিন এত মিথ্যে কথা লেখে কী করে? সব–সব মিথ্যে!

...ফর ওভার অ্যান্ড এ ডে, আমি ডিভোর্স চাইছি, তবুও তোমাকে আমি ভালোবাসি। এনচ্যানটেড ইভিনিং আমরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে যাব। ইউ অ্যান্ড দ্য নাইট অ্যান্ড দ্য মিউজিক–হোটেল ম্যানেজার বলেছে, কাছেই: কতগুলো গুহা আছে...আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেন্টিমেন্টাল রিজিনস-এ কেউ জানে না, সে ঘুমিয়ে আছে কি মাই লাভ, আমরা দুজন এক হয়ে শুনব। আমরা দুজন কী করে বিশ্বাস করব–এসবের অন্তরালে কোনো সত্যি লুকিয়ে নেই।

মিস আলেকজান্ডার।

ক্যাথেরিন এতক্ষণ অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। এবার সে আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে।

পাইলট বলছেন আমরা ঠিক জায়গায় অবতারণ করেছি। লন্ডন শহর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

এয়ারপোর্টে একটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যাথেরিনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সোফেয়ার বলল, আমি আপনার লাগেজের দায়িত্ব নিচ্ছি মিস আলেকজান্ডার। আমার নাম আলফ্রেড, আপনি কি সোজা আপনার ফ্ল্যাটে যাবেন?

–আমার ফ্ল্যাট! বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটছে না।

–হ্যাঁ, সেটাই তো ভালো হয়।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ক্যাথেরিন তার সিটে বসে পড়ল। এখনও সব কিছু অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এত কিছু করেছেন? একটা প্রাইভেট প্লেন দিয়েছেন, থাকার জন্য জায়গা! হয় তিনি এই পৃথিবীর সবথেকে সহৃদয় মানুষ, অথবা...কোনো বিকল্প ভাবনা এখন ক্যাথেরিনের মনে আসছে না। না, মনে হচ্ছে, উনি বোধ হয় পৃথিবীর সব থেকে দয়ালু মানুষ। উনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে আমার।

ইটন স্কোয়ারের কাছে এলিজাবেথ স্ট্রিটে সাজানো ফ্ল্যাট। সর্বত্র আভিজাত্যের চিহ্ন। প্রবেশ পথে বিরাট একটা হল আছে। সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো একটি বসার ঘর। সেখানে ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি দুলছে। প্যানেল করা লাইব্রেরি। পর্যাপ্ত খাবার সমেত একটি কিচেন। তিনটি সুন্দর সাজানো বেডরুম। তার পাশাপাশি চাকরদের থাকার কোয়ার্টার।

দরজার মুখে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিল। বছর চল্লিশ বয়স। কালো পোশাক পরেছে। সে বলল–শুভ সন্ধ্যা, মিস আলেকজান্ডার। আমি হলাম অ্যানা। আমি আপনার হাউস কিপার।

–অবশ্যই! আমার হাউস কিপার, ক্যাথেরিন ঢোঁক গিলে বলতে চেষ্টা করে ঠিক আছে। দরকার হলে আমি তোমাকে ডেকে নেব।

সোফেয়ার ক্যাথেরিনের সুটকেসটা নিয়ে এসেছে। সেটিকে তার বেডরুমে পৌঁছে দিল। সে বলল লিমুজিন গাড়িটা আপনার জন্য রাখা আছে। ইচ্ছে হলেই আমাকে ফোন

করবেন। কেমন? অথবা অ্যানাকে বললেও হবে। আপনি কখন অফিস যাবেন সেটাও জানাবেন। আমি ঠিক সময়ে আপনাকে পৌঁছে দেব।

লিমুজিন গাড়িটা আমার জন্য রাখা আছে! ক্যাথেরিন বলল ধন্যবাদ।

অ্যানা জানতে চাইল আমি কি আপনার ব্যাগ খুলব? কী কী লাগবে আমাকে জানাবেন। প্রয়োজন হলেই বলবেন, কোনো ব্যাপারে ইতস্তত করবেন না কিন্তু।

–আমি এখন কিছু ভাবতে পারছি না। আগে একটু বিশ্রাম নিই, কেমন।

ক্যাথেরিনের কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুর ঝরছে।

যতক্ষণে অ্যানা তার ব্যাগ খুলে দরকারি জিনিস গুলো বের করে, ক্যাথেরিন ফ্ল্যাটের এখানে-সেখানে চোখ মেলে দিল। ক্যাথেরিন বেডরুমে গেল। ডেমিরিস যে সুন্দর পোশাকগুলো পাঠিয়েছেন, সেগুলোর দিকে চোখ মেলে দিল। আহা, সব কিছু একটা সুন্দর স্বপ্নের অংশ বিশেষ। বাস্তব কি এত পরিচ্ছন্ন হতে পারে? আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সে একটা কনভেন্টের গোলাপকুঞ্জে বসেছিল। গোলাপগুলোকে পরিচর্যা করছিল। এখন মনে হচ্ছে সে যেন এক রূপসী রাজকুমারী হয়ে উঠেছে। কী কাজ করতে হবে সে ব্যাপারে ক্যাথেরিনের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে জানে, তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। কারণ যে ভদ্রলোক অযাচিতভাবে এত সাহায্য করলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা তো জানানো উচিত। সহসা নিজেকে খুবই ক্লান্ত বলে মনে হল ক্যাথেরিনের। সে কোমল আরামপ্রদ বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে সে চোখ বন্ধ করল।

ঘুমের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল ক্যাথেরিন। আবার, সেই আর্ত চিৎকার ল্যারি সাঁতার কেটে তার দিকে ছুটে আসছে। ল্যারি তার ঘাড় ধরে জলের ভেতর ডুবিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকার একটি গুহার মধ্যে তাকে প্রবেশ করতে হয়েছে। বাদুড়রা উড়তে উড়তে তাকে আক্রমণ করছে। তার চুল ধরে টানাটানি করছে। তার মুখের ওপর বাদুড়দের ডানার ঝটফটানি।

ক্যাথেরিন বিছানাতে উঠে বসল। সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিল সে, তার পাশে তাকাল। ও, এই দুঃস্বপ্নটা আমি কেন বারবার দেখি? এটা তো গতকালের ঘটনা। আজকের পৃথিবীটা একেবারে পালটে গেছে। অন্তত আমার কাছে। পৃথিবীর কেউ আর আমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমার কোনো শত্রু নেই। তা হলে কেন?

ক্যাথেরিনের বেডরুমের বাইরে অ্যানা সেই আর্তনাদের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সে এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করল। তারপর সবকিছু আবার আগের মতো শান্ত হলে সে চলে গেল হলের কাছে। খবরটা এখনই কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কানে পৌঁছোতে হবে। অ্যানাকে এই জাতীয় নির্দেশ দেওয়া আছে। নিজের কাজ সম্পর্কে অ্যানা খুবই ওয়াকিবহাল। সে জানে, ক্যাথেরিনের সমস্ত গতিবিধির ওপর নীরব নিঃশব্দ নজর রাখতে হবে তাকে।

হেলেনিক ট্রেড করপোরেশন–২১৭, বন্ড স্ট্রিট; পিকাডিলি সার্কাসের কাছে। একটা পুরোনো সরকারি বাড়ি। কয়েক বছর আগে এটাকে ভেঙেচুড়ে অফিস বিল্ডিং-এ

রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রবেশপথের ধারে অসামান্য স্থাপত্য নিদর্শন আছে, রাজকীয় এবং শ্রদ্ধেয়।

ক্যাথরিন নামল। অফিসের কর্মচারীরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্তত ছজন কর্মচারী তাকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছে।

–স্বাগতম মিস আলেকজান্ডার! আমি ইভলিন কেই, এ হল কার্ল, ও হল টাকার, এ ম্যাথু, আর এ জেনি।

নামগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে।

আপনারা সব কেমন আছেন?

–অফিস তৈরি রাখা হয়েছে। আমি কি আপনাকে পথটা দেখাব?

–অনেক ধন্যবাদ।

রিসেপশন রুমটাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বিরাট চেস্টারফিল্ড সোফা আছে। দুটো ঘুরন্ত চেয়ার, একটি ট্যাপেসট্রি। তারা কার্পেট আচ্ছাদিত করিডরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। কনফারেন্স রুমের ভেতর প্রবেশ করল। পাইন কাঠের প্যানেল রয়েছে চারপাশে। চামড়ায় মোড়া চেয়ার। সুন্দরভাবে পালিশ করা বিরাট একটি ডিম্বাকৃতি টেবিল।

ক্যাথেরিনকে এবার তার অফিস ঘরে পৌঁছে দেওয়া হল। আহা, এত সুন্দর ফার্নিচার, লেদার কৌচ!

–এসবই আপনার ব্যবহারের জন্য মিস।

ভীষণ-ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমার। শিশুর মতো আনন্দে ক্যাথেরিন বলে ওঠে। ডেস্কে তাজা গোলাপ রয়েছে।

–মি. ডেমিরিস পাঠিয়েছেন, আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে।

ডেমিরিস এত চিন্তা করেন আমার জন্য! ক্যাথেরিনের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

ইভলিন কেই–এই মেয়েটি পথ দেখিয়ে আগে আগে এগিয়ে চলেছেন। ইনি মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা। মুখে লাবণ্য আছে। আচরণ সন্তোষজনক।

–কদিনের মধ্যেই আপনি সব কিছু ব্যবহার করতে শিখে যাবেন। কাজের ধারাটা খুবই সহজ। আমরা ডেমিরিসের বিরাট সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তবে আমাদের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। ওভারসিজ বিভাগ থেকে প্রতি মুহূর্তে রিপোর্ট আসছে। আমরা সব রিপোর্ট এথেন্সের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি হলাম এই অফিসের ম্যানেজার। আপনি আমার সহকারিণী হিসেবে কাজ করবেন।

–ও, তাহলে আমি অফিস ম্যানেজারের সহকারিণী। ক্যাথেরিন জানে না তাকে ঠিক কী ধরনের কাজ করতে হবে। তাকে কল্পনার জগতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব উড়ান পাখি, লিমুজিন, সুপার ফ্ল্যাট এবং পরিচারকবৃন্দজীবনে সে আর কী চাইতে পারে?

–উইম ভ্যানডিন হলেন আমাদের রেসিডেন্ট ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস। তিনি সমস্ত স্টেটমেন্টগুলোকে কম্পিউটারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তারপর একটি মাস্টার ফিনানসিয়াল চার্ট তৈরি করেন। মেশিনের থেকেও তার মাথা দ্রুত কাজ করে। আসুন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করুন।

ওরা করিডর দিয়ে হেঁটে গেল। অফিসের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। দরজায় কোনো শব্দ না করে, ইভলিন দরজাটা খুলে ফেললেন।

–উইম, এই হল আমার নতুন সহকারিণী। ক্যাথেরিন ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেখানে দাঁড়াল। উইম ভ্যানডিনকে দেখে মনে হল, তার বয়স খুব বেশি হলে তিরিশ হবে। রোগা পাতলা চেহারা। পাকানো গোঁফ আছে। আর চোখের ভেতর কী অদ্ভুত নিষ্প্রভ চাউনি। তিনি জানালা দিয়ে আকাশ দেখছিলেন।

–উইম, উইম এই মেয়েটি ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার।

তিনি ঘুরে তাকালেন ক্যাথেরিনের প্রথম নাম হল মারটা স্কোরকা। ১৬৮৪ সালে একজন পরিচারিকার কন্যা হিসেবে তার জন্ম হয়েছিল। রাশিয়ানরা তাকে অপহরণ করে। সে প্রথম পিটারকে বিয়ে করেছিল। ১৭২৫ থেকে পরবর্তী দুবছর সে ছিল রাশিয়ার মহারানি। সম্রাজ্ঞীও বলা যায়।

ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট হল এক জার্মান রাজার কন্যা। ১৭২৯ সালে তার জন্ম হয়। সে পিটারকে বিয়ে করে। পরবর্তীকালে এই পিটার তৃতীয় পিটার হিসেবে সিংহাসনে বসে, ১৭৬২ সালে। স্বামীর মৃত্যুর পর ওই ক্যাথেরিন সিংহাসনে বসেছিল। সেই বছরই তাকে হত্যা করা হয়। তার রাজত্বকালে পোল্যান্ডে দুটি ডিভিশন পাঠানো হয়। দুটি যুদ্ধ হয় তুরস্কের বিরুদ্ধে।...

ভদ্রলোক কথা বলেই চলেছেন। তার জ্ঞানের বহর দেখে ক্যাথেরিন অবাক হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তিনি বুঝি এক ঝরনা। সেখান থেকে জলধারার মতো নির্গত হবে তথ্যের ভাণ্ডার।

ক্যাথেরিন বলল–ভীষণ, ভীষণ ভালো লাগছে!

উইম ভ্যানডিন তার দিকে তাকালেন।

ইভলিন বললেন–উইম লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ও একা একা একটা জগৎ তৈরি করেছে। ও ভীষণ লাজুক।

কেন? ক্যাথেরিন ভাবল, ছেলেটিকে দেখেই মনে হচ্ছে সে হল ছাইচাপা এক টুকরো আগুন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এথেন্সে তার অফিসে বসেছিলেন। লন্ডনের আলফ্রেডের কাছ থেকে একটা টেলিফোন রিপোর্ট এসেছে।

আমি মিস আলেকজান্ডারকে এয়ারপোর্ট থেকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছি মিঃ ডেমিরিস। আমি জানতে চেয়েছিলাম, উনি কোথাও যেতে চাইছেন কিনা, আপনি যেমন বলেছিলেন, উনি কোথাও যেতে রাজি হননি।

মেয়েটি কি বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করেছে?

–না স্যার, তিনি ফ্ল্যাট থেকে কারও কোনো টেলিফোনে কথা বলেননি।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস আর কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নন। অ্যানার ওপর সব দায়িত্ব দেওয়া আছে। অ্যানার কাছ থেকে রিপোর্ট এসেছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ডেমিরিস তাঁর মনের সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। না, এখুনি বিপদের কোনো কারণ নেই। তবে, মেয়েটি এই পৃথিবীর বুকে একদম একা। যে কেউ তার উপকারী বন্ধুর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে পারে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ভাবতে থাকলেন, আমাকে লন্ডনে যেতে হবে খুবই তাড়াতাড়ি।

***

ক্যাঞ্জেরিন আলেকজান্ডার নতুন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিশাল সাম্রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে খবরের স্রোত আসছে। কত কিছু আছে তাঁর, ভাবলে অবাক হতে হয়! ইন্ডিয়ানাতে আছে একটা ইস্পাত ফ্যাক্টরি। ইটালিতে আছে অটোমোবাইল ফ্যাক্টরি। অস্ট্রেলিয়াতে উনি একটা খবরের কাগজের চেন তৈরি করেছেন। এছাড়াও আছে একটা সোনার খনি আর ইনসিওরেন্স কোম্পানি।

ক্যাথেরিন নানা রিপোর্টের ওপর চোখ বোলায়। কিছু কিছু তথ্য আবার সরাসরি উইম ভ্যানডিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উইম রিপোর্টগুলোর দিকে একবার নিরাসক্ত চোখ মেলে তাকান। তারপর কম্পিউটারের মতো গতিতে কাজ করতে থাকেন। তার কাজ করার ক্ষিপ্রতা দেখে ক্যাথেরিন অবাক হয়ে যায়। সত্যি, কী অবলীলায় তিনি শতাংশ হিসাব করেন। কতটা লাভ, কতটা ক্ষতি, তা বলে দেন, ক্যাথেরিনের মাথা ঝিমঝিম করে।

নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে। সত্যি, ছেলে-মেয়েরা সহৃদয় এবং ভালো স্বভাবের।

ইভলিন কেই-এর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে দেখা হচ্ছে ক্যাথেরিনের। ক্যাথেরিন উইমকে বলেছিল, এই বাড়িটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানাতে।

উইম গড়গড় করে বলে গেছেন—এটা একটা সরকারি কাস্টমস হাউস। স্যার ক্রিস্টোফার রেন ১৭২১ সালে এই বাড়িটার ডিজাইন করেছিলেন। লন্ডনে যেবার ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায় তখন ক্রিস্টোফার রেন পঞ্চাশটি চার্চকে নতুন করে সাজিয়ে তোলেন। তার মধ্যে আছে সেন্ট পলস, সেন্ট মাইকেলস এবং সেন্ট ব্রাইউসের মতো বিখ্যাত গির্জাগুলি। তিনি রয়াল এক্সচেঞ্জ এবং বাকিংহ্যাম হাউসও তৈরি করেন। ১৭২৩ সালে । তার মৃত্যু হয়। তাকে সেন্ট পলস-এর সমাধিক্ষেত্র সমাহিত করা হয়েছে। ১৯০৭ সালে এই বাড়িটাকে একটা অফিস বিল্ডিং-এ রূপান্তরিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার এই বাড়িটিকে এয়ার-রেড শেলটার হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

এয়ার-রেড শেলটার মানে হল, যেখানে বোমা আঘাত করতে পারবে না। বেসমেন্টের কাছে এমন একটা ঘর সাজানো আছে। ক্যাথেরিন মাঝে মধ্যে সেদিকে তাকায়। অনেক কিছুই মনে পড়ে যায়। সাহসী ব্রিটিশ নারী এবং পুরুষেরা কীভাবে দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করেছে! হিটলারের লুফটওয়াফে তখন ধারাবাহিক বোমাবর্ষণ করে চলেছে। ওই স্বেচ্ছাবন্দি মানুষগুলো কিন্তু মুহূর্তের জন্যও মনোবল হারায়নি।

বেসমেন্টটা বিরাট, মনে হয় গোটা অফিস বাড়িটির মতো তার আয়তন। সেখানে বিরাট বিরাট বয়লার আছে। আছে ইলেকট্রনিক এবং টেলিফোনের যন্ত্রপাতি। বয়লারটি নিয়ে মাঝে মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় ক্যাথেরিনকেও এই সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। যারা বয়লার সারায়, তাদের বেসমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়েছে।

–ভয়ংকর-ভয়ংকর ব্যাপার, যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তাই তো?

ক্যাথেরিন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে।

হৃদস্পন্দনের গতিকে স্তব্ধ করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। দেখুন এখানে সেফটি ভালভ আছে। বয়লারটা খুব গরম হয়ে গেলে বিস্ফোরিত হতে পারে। তার আগেই সেফটি ভালভটা খুলে গরম হাওয়া বাইরে বের করতে হবে। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা হবে না।

এইভাবেই কথা বলেছে মেকানিকরা। তাদের কথা শুনে ক্যাথেরিন শান্ত হয়েছে। দু দিন যেতে না যেতে আবার সেই একই সমস্যা।

.

সারাদিনের কাজ শেষ হয়ে গেছে। লন্ডন–কত কিছু আছে এখানে! লন্ডন শহরের নৈশ জীবন নানা বিনোদনে ভরা। আছে থিয়েটার, ব্যালেট আর মিউজিক কনসার্ট, পুরনো বইয়ের দোকান আছে। যেমন–হ্যাটচার্ড এবং ফয়লে অসংখ্য। মিউজিয়াম ছড়ানো আছে শহরের নানা প্রান্তে। ছোটো ছোটো অ্যান্টিকের দোকান। সুস্বাদু খাবারের রেস্টুরেন্ট। ক্যাথেরিন একদিন গেল সিসিল কোর্টে। লিখোগ্রাফের দোকানে পা রাখল। হ্যাঁরোডস-এ গিয়ে খুঁজল। কিছু জিনিসপত্র কিনল। ফর্টনাম এবং ম্যাসন খেল। মার্কস ও স্পেনসারের দোকান থেকে ঘুরে এল। স্যাভয়-এ রোববারের চায়ের আসরে বসল।

মাঝে মধ্যে তার মনের মধ্যে অশুভ চিন্তার আগমন ঘটে যায়। কত কথাই মনে পড়ছে। ল্যারি সম্পর্কে। তার কণ্ঠস্বর, কিছু বাক্যবন্ধ, একটি কোলোন, একটি গান। অতীত হারিয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের কথাই এখন থেকে তাকে ভাবতে হবে। এই চিন্তা দিনে দিনে তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

.

ক্যাথেরিন এবং ইভলিন কেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। তারা এখন একসঙ্গে বাজার করতে যায়। এক রোববার তারা গেল ওপেন-এয়ারআর্ট এগজিবিশন দেখতে। টেমসের ধারে এই অসাধারণ প্রদর্শনীর আসর বসেছে। কত শিল্পী বসে বসে ছবি আঁকছেন। তরুণ থেকে বয়স্ক সকলে। তাদের সকলের মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে। তাদের জীবনে বিষণ্ণতা আছে, আছে বিফলতা। তারা কোনো গ্যালারিতে ছবি

দেখাতে পারেন না। কিন্তু তাদের সকলেই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। ক্যাথেরিন কিছু ছবি কিনল সহানুভতি দেখাবার জন্য।

ইভলিন জানতে চেয়েছিলেন- এই ছবিগুলো কোথায় লাগানো হবে?

ক্যাথেরিন জবাব দেয় কেন, অতবড়ো বয়লার রুমটাতে ফাঁকাই পড়ে আছে।

লন্ডনের পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে দুজনের মধ্যে কত-না কথা হয়। মাঝে মধ্যে তারা ফুটপাথে বসে থাকা আর্টিস্টদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেউ কেউ চক দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকছে, কেউবা পাথরের টুকরো দিয়ে, কারোর আঁকার মধ্যে আন্তরিকতা আছে। পথচলতি মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকছে ওই ক্ষণকালীন শিল্পসুষমার দিকে। শ্রদ্ধা-ভক্তির চিহ্ন ফুটেছে তাদের আচরণের মধ্যে দেখতে পেল। সে চক দিয়ে বিরাট রাস্তায় বসে থাকা শিল্পীর দিকে কয়েকটা কয়েন ছুঁড়ে দিচ্ছে তাচ্ছিল্য ভরে।

একদিন লাঞ্চ শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যে হব-হব। ক্যাথেরিন দেখল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি ল্যান্ডস্কেপ আঁকছে। সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ একরাশ বৃষ্টি এল। ভদ্রলোক দেখল, তার এতক্ষণের সব পরিশ্রম ধুয়ে শেষ হয়ে গেল।

অনেকটা আমার হারনো অতীতের মতো, ক্যাথেরিন ভাবল।

.

ইভলিন ক্যাথেরিনকে শেফার্ড মার্কেটে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- এটা হল খুবই মজার জায়গা। শুধু মজা নয়, এই মার্কেটের পরতে পরতে নিষিদ্ধ উত্তেজনার ছাপ আছে।

মার্কেটটা সত্যি বর্ণরঙিন। তিনশো বছরের পুরোনো একটা রেস্টুরেন্ট আছে। তার নাম টিডি ডলস। আছে ম্যাগাজিন স্ট্যান্ড, বাজার, বিউটি পার্লার, বেকারি, অ্যান্টিক জিনিসপত্রের দোকান এবং বেশ কয়েকটা বসতবাড়ি।

মেল বক্সের ওপর যে নাম লেখা আছে সেগুলো পড়তে ভালো লাগে। যেমন হেলেন, নীচে লেখা ফ্রেঞ্চ লেসন, রোসি, নীচে লেখা গ্রিক শেখানো হয় এখানে।

ক্যাথেরিন জানতে চেয়েছিল-এটা কি পড়াশোনার জায়গা?

ইভলিন হেসে বলেছিলেন- না, প্রথমে আমার একই ভুল হয়েছিল। স্কুলে মেয়েদের যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না, এখানে সেসব বিষয়েই পড়াশোনা করানো হয়।

ইভালিন হেসে উঠলেন। ক্যাথেরিনের মুখে লজ্জার লালিমা।

.

বেশির ভাগ সময় ক্যাথেরিনকে একা একা থাকতে হয়। কিন্তু একাকিত্বের যন্ত্রণা কখনও তাকে গ্রাস করতে পারবে না–এমনই একটা কঠিন সিদ্ধান্ত সে এই মুহূর্তে নিয়ে ফেলেছে। সে তার হারানো দিনের স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসে। তার জীবনে রোমন্থন

করার মতো উজ্জ্বল মুহূর্ত কিছু ছিল কী? নাকি সব কিছুই হারিয়ে গেছে। সে ভবিষ্যৎ অথবা অতীতের কথা ভেবে মনটাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চায় না। একদিন ক্যাথেরিন উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে ঘুরে এল। গেল ক্যান্টারবেরিতে। আহা, অমন সুন্দর ক্যাথিড্রাল! হ্যাঁম্পটন কোর্টেও একদিন সে পা রাখল। সপ্তাহান্তে সে গিয়েছিল শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে। প্রকৃতি এখানে কত উদার এবং নির্মল। শান্ত একটি সরাইখানাতে বেশ কিছুটা সময় কাটাল। একা একা ঘুরে বেড়ালো প্রকৃতির উদার স্বর্গরাজ্যের মধ্যে দিয়ে।

ভাবল, আমি এখনও জীবিত, ভীষণভাবে জীবিত। সুখী অবস্থায় কেউ জন্মাতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে নিজস্ব সুখের সরণি খুঁজে নিতে হয়। এতদিন বাদে আমি সেই সরল সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার বয়স এখন খুব একটা বেশি নয়। আমার শরীরে কোনো রোগ বাসা বাধেনি। মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় আমার দিন ফিরবে।

সোমবার আবার কাজ শুরু হল। ইভলিনের সঙ্গে দেখা হল, দেখা হল অন্য মেয়েদের সঙ্গে এবং উইম ভ্যানডিন-এর সঙ্গে।

উইম ভ্যানডিনকে দেখে ক্যাথেরিন অবাক হয়ে যায়। ক্যাথেরিন তার কাছে কোনো মানুষকে আসতে দেখেনি। ভদ্রলোক চাপা প্রকৃতির। নিজেই নিজের জগৎ তৈরি করেছেন। এই অফিসে কুড়িজন কাজ করে। সকলকার হিসাব তার নখদর্পণে। কী আশ্চর্য, তিনি কিন্তু কখনও ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন না! চোখ বন্ধ করে তিনি বলতে পারেন, কোন কর্মচারীর কত টাকা বেতন, ইনসিওরেন্সের নাম্বার কত, কত টাকা কাটা হয়–সব কিছু। সব কিছু ফাইলের ভেতর লেখা আছে, কিন্তু ওই ভদ্রলোক ফাইলের তোয়াক্কা করেন না। ওঁর মাথার ভেতর গোপন প্রকোষ্ঠ আছে। সেখানে সব তথ্য ভরা

আছে। তিনি জানেন, প্রত্যেকটা ডিভিশন থেকে কত টাকা ক্যাশবাবদ অফিসে আসে। গতমাসের সঙ্গে একটি তুলনা, তাও করতে পারেন যেমন, তেমনি পাঁচ বছর আগের কথাও তার মনে আছে। যখন এই কোম্পানিটি সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছিল।

.

উইম ভ্যানডিন সব কিছু মনে রাখেন। যা কিছু তাকে বলা হয়, তাকে পড়ানো হয় অথবা দেখানো হয়। তার জ্ঞানের পরিধিটা আকাশছোঁয়া, অবিশ্বাস্য, যে-কোনো বিষয়ে অত্যন্ত সহজ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন, আবার কঠিন প্রশ্নের জবাবও তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু ভদ্রলোক বড্ড বেশি অমিশুকে, অসামাজিক এবং একগুঁয়ে।

ক্যাথেরিন ইভলিনের সঙ্গে আলোচনা করে ওই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটি সম্পর্কে।

ক্যাথেরিন বলে বসে লোকটিকে আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।

ইভলিন বলেন- উইমকে আমরা এককেন্দ্রিক মানুষ বলতে পারি। কথা বলে মনে হবে সে বুঝি এক নিরেট, মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি বলে কিছু নেই। সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আমার মনে হয়, সে বোধহয় কোনো লোকের সাথে ভাব জমাতে চায় না।

–ওঁনার কি কোনো বন্ধু নেই?

–না।

–উনি কি কখনও কোনো মেয়ের সাথে ডেটিং করেন নি?

–না।

ক্যাথেরিনের মনে হল, উইম একেবারে একা এবং নিঃসঙ্গ। আহা, উইমের সাথে অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করল সে।

.

ক্যাথেরিন উইমের জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেছে। একদিন সকালে তার মনে হল, কানের যন্ত্রণাটা বেশ বেড়েছে। এই নিয়ে. উইমের সাথে কথা বললে কেমন হয়?

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, উইম শিষ্টাচার হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বললেন–আজ আবহাওয়াটা বিচ্ছিরি। আপনি একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

-কেন?

আপনি কি জানেন, আমাদের কানের ভেতর অনেক সংবেদী অংশ আছে। বেশ কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে এই কানটা তৈরি হয়েছে। এখানে আছে অরিকল, অডিটারি টাপস, টাইমফেনিক মেমব্রেম, আরও কত কী! সেই সব অঙ্গগুলো একসঙ্গে কাজ করলে তবেই আমরা শুনতে পাই। কোনো কারণে একটি অঙ্গ বিকল হলে....।

ভদ্রলোক কথা বলে চলেছেন। ক্যাথেরিন বুঝতে পারল, না, বন্ধুত্ব জমবে না।

একদিন ক্যাথেরিন এবং ইভলিন মিলে উইমকে র‍্যামস হেডে নিয়ে গিয়েছিল। এটা স্থানীয় একটা পাব।

ক্যাথেরিন একদিন জানতে চেয়েছিল–খেলাধুলোতে আপনার কেমন উৎসাহ? আপনি কি কখনও বেসবল খেলা দেখেছেন?

উইম বলতে থাকেন, বেসবলের আকৃতি কেমন বলুন তো? নয় পূর্ণ কোয়াটার ইঞ্চি হল এর পরিধি। এটাকে তৈরি করা হয় পরিষ্কার সুতো দিয়ে। ওপরে সাদা চামদার আচ্ছাদন থাকে। ব্যাটে চামড়ার আচ্ছাদন থাকে। ব্যাট তৈরি করা হয় ছাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে। দুই পূর্ণ তিনের দুই ইঞ্চির বেশি ব্যাস থাকে তার। লম্বা চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি।

সমস্ত রাশিবিজ্ঞান উইমের নখ দর্পণে, ক্যাথেরিন ভাবল। কিন্তু? এই সব কচকচানি কে শুনবে?

–আপনি কখনও কোনো খেলা খেলেছেন? বাস্কেটবল?

বাস্কেটবল খেলা হয় কাঠ কিংবা কংক্রিট ফ্লোরের ওপর। বলটির পরিসীমা হল একত্রিশ ইঞ্চি। তার ভেতর রবারের ব্লাডার দেওয়া থাকে। তেরো পাউন্ড প্রেসারে বাতাস ভরে দেওয়া হয়। ওজন কুড়ি থেকে বাইশ আউন্সের মতো। জেমস নেসমিথ ১৮৯১ সালে বাস্কেটবল খেলা আবিষ্কার করেছিলেন।

ক্যাথেরিন তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে।

.

কোনো কোনো সময় উইমকে জনসমক্ষে অপদস্ত হতে হয়। এক রোববার সেই বিচ্ছিরি ঘটনাটা ঘটে গেল। সেদিন টেমসের ধারে মেইডেনহেডে গিয়েছিল ক্যাথেরিন, ইভলিন এবং উইম। উইম যেতে চায়নি। ইভলিন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। তারা কমপ্লিট অ্যাঙ্গলারে গিয়েছিল লাঞ্চ খেতে। ওয়েটার এল।

–আজকে আমাদের মেনুতে নতুন নতুন সামুদ্রিক খাদ্য আছে।

ক্যাথেরিন জানতে চাইল- আপনি কি ক্লামের মাংস পছন্দ করেন?

উইম গড়গড় করে বলতে থাকেন–ছ-রকমের ক্লামের মাংস পাওয়া যায়। একটিকে বলে পদ্মরাগ ক্লাম, অন্যটি লাল ক্লাম। এছাড়া সিঙ্গেল শেল, রেজর ক্লাম, রাউন্ড ক্লামও দেখা যায়।

ওয়েটার তার মুখের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে থাকে স্যার, আপনি অন্য কিছু খাবেন কী?

উইম বললেন আমি ক্লামের মাংস পছন্দ করি না।

ব্যাপারটা সত্যি অশোভন। কী আর করা যাবে। ক্যাথেরিন আপ্রাণ চেষ্টা করছে উইমকে জনসমক্ষে নিয়ে আসতে। কিন্তু উইম কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না এই প্রস্তাবে। তিনি তার

নিজস্ব জগতে বসবাস করতে চাইছেন। সেই জগতে মানুষের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে শুধু যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের বিচিত্র খেলা।

একদিন ক্যাথেরিন ইভলিনকে বলল–উইম কি কোনোদিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন না? উনি কি কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালোবাসবেন না? বিয়ে করে সুখী সংসার পাতবেন না?

ইভলিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন–আমি তো আগেই বলেছি, ভদ্রলোকের মনের ভেতর আবেগ নেই। তিনি কখনও কারও সাথে যুক্ত হতে পারবেন না।

এই ব্যাপারটা ক্যাথেরিন বিশ্বাস করতে পারছে না। মাঝে মধ্যে উইমের চোখের তারায় সে কৌতূহল দেখেছে। দেখেছে স্নেহের বিচ্ছুরণ আর আনন্দঘন মুহূর্তের উপস্থিতি। তার মানে? তার মানে উইমের মধ্যে এখনও একটা উচ্ছল প্রাণসত্তা বেঁচে আছে। হয়তো অতীতের কোনো স্মৃতি তাকে এইভাবে আক্রমণ করছে। তাই তিনি চারপাশে প্রাচীর রচনা করেছেন। আরও-আরও চেষ্টা আমাকে করতে হবে। আমি উইমকে প্রাণ প্রাচুর্যে ফিরিয়ে আনবই।

.

একদিন স্যাভয় থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র এল। সেখানে চ্যারিটি বল দেখানো হবে।

ক্যাথেরিন সোজাসুজি উইমের অফিসে পৌঁছে গেল–উইম, আপনি কি নাচতে পারেন?

এই অভাবিত প্রশ্ন শুনে উইম অবাক হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন- নাচের সব ভঙ্গিমা আমি জানি। তবে নাচতে আমি সত্যি জানি না। কিন্তু কোন্ নাচে কোন্ কৃকুশলতা লুকিয়ে আছে আমি এখনই তা বলে দিতে পারি। একচল্লিশ রকমের ফক্সট্রট নাচ আছে। প্রথমেই পুরুষ সঙ্গীটিকে শুরু করতে হয়। তাকে প্রথমে বাঁ পা টা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দুটি স্টেপ সামনের দিকে ফেলতে হবে। সঙ্গিনী ডান পায়ের ওপর ভর রাখবে। দুটো স্টেপ পিছিয়ে যাবে। এইভাবেই একবার এখোনো, একবার পেছোনোর খেলা চলবে। পুরুষসঙ্গী এবার ডান পা-টার ওপর নিজের ভর রাখবে। ধীরে ধীরে শরীরটাকে সামনের দিকে নামিয়ে আনবে। তারপর? তারপর গতি ক্রমশ বাড়বে। একবার ডান একবার বাঁ, এইভাবে নাচটাকে চালিয়ে যেতে হবে।

ক্যাথেরিন পাথরের মূর্তি হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কী বলবে, ভুলে গেছে সে। কী আশ্চর্য, লোকটা সত্যি একটা পাগল অথবা প্রতিভাবান! উনি সব কিছু জানেন, কিন্তু শব্দের আসল মানে না। ব্যাপারটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।

.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ফোন বেজে উঠল। রাত হয়েছে। ক্যাথেরিন তখন ঘুমোতে যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে।

–আমি কোস্টা, আশা করি আমার ফোন পেয়ে আপনি বিরক্ত হননি?

না-না! এতদিন বাদে ফোন...ক্যাথেরিনের মনে আনন্দ। কতদিন বাদে সে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। অনেক দিন ওই কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি সে। মাঝে মধ্যে মনে

হয়, ডেমিরিস এখানে থাকলে বোধহয় ভালো হত। অন্তত তার উপদেশ কাজে লাগাতে পারত সে। আহা, এই পৃথিবীতে একমাত্র এই মানুষটি ক্যাথেরিনের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন। ডেমিরিসের কথা মনে হলেই অনেক কিছু ভেবে বসে ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিন, কেন জানি না, সকাল থেকে আপনাকে মনে পড়ছে। লন্ডন শহরটা আপনার কেমন লাগছে? নিজেকে এখনও একা এবং নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে কি? সত্যি কথা বলতে কি, লন্ডনে তলে আপনি এক অজানা আগন্তুক। এই শহরে কারও সঙ্গে তো আপনার বন্ধুত্ব নেই।

হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় একা লাগে বৈকি, ক্যাথেরিন স্বীকার করে নেয়। কিন্তু আপনার কথা আমি মনে রেখেছি। অতীতকে ভোলবার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতের জন্যই আমি বেঁচে আছি।

–ঠিকই করছেন, সব সময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবেন। কালকে আমি: লন্ডনে পৌঁছোব। আমি আপনার সাথে ডিনার খেতে পারি কী?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, এ তো এক অভাবিত সৌভাগ্য। ক্যাথেরিন উষ্ণ আবেগের সাথে বলে বসে। সামনের দিকে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে আছে। আহা, ডিনারে বসে সে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। সেই সুযোগ আগামীকাল তার মুঠোবন্দি হবে।

কনস্টনটিন ডেমিরিস রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। মনে মনে হাসলেন। তা হলে? অনুসরণ এবার শুরু হল!

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

.

রিট হোটেলে ডিনারের আসর, ডাইনিং রুমটা আভিজাত্যে ভরা, খাবারটা সত্যি সুস্বাদু। ক্যাথেরিন অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সে কোনো কিছুই খাচ্ছে না। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটি তার সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আহা, কত কথা বলার আছে। কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারছি কই?

–আপনার অফিসের সহকর্মীরা ভারী চমৎকার, এমন সুন্দর স্বভাবের মানুষ আমি খুব একটা বেশি দেখিনি। উইমকে আলাদাভাবে মনে রাখতে হয়েছে। তার মতো একজন মানুষ...

ক্যাথেরিন উৎসাহের আতিশয্যে বলে বসে।

ডেমিরিস কিন্তু কোনো কথা শুনছেন না। তিনি ক্যাথেরিনের হাবভাব লক্ষ করছেন। আহা, এই মেয়েটি এখনও এত সুন্দরী! ওর আচরণের মধ্যে একটা অহংকার লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি এখন কী করব? ডেমিরিস শেষ পর্যন্ত একটা কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। না, খেলাটাকে ধীরে ধীরে খেলতে হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমিই জয়যুক্ত হব। আহা, নোয়েলে, তোমার কথা মনে পড়ছে এবং তোমার সেই বোকা হাঁদারাম প্রেমিক পুরুষটির কথা।

–আপনি লন্ডনে কদিন থাকবেন? ক্যাথেরিন জানতে চাইল।

–একদিন বা দুদিন। এখানে ব্যবসার কিছু কাজ আছে।

কথাটা সত্যি, কিন্তু এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ডেমিরিস কেন লন্ডনে এসেছেন? ক্যাথেরিনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। দেখতে হবে, ক্যাথেরিন যেন তার প্রতি আবেগি হয়ে উঠতে পারে।

ডেমিরিস টেবিলের ওপর ঝুঁকলেন–ক্যাথেরিন, আমি কি কখনও বলেছি, একসময় সৌদি আরবে আমি তেলের খনিতে কাজ করতাম।

.

পরের দিন রাতে আবার ডেমিরিস ক্যাথেরিনকে নিয়ে ডিনারের টেবিলে বসলেন।

ইভলিন আমাকে সব কথা বলেছে। আমার কর্মচারীরা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনি চমৎকার কাজ করছেন। মনে হচ্ছে, আপনার মাইনে বাড়াতে হবে। দেখা যাক, আগামী মাস থেকে আপনার পদোন্নতি ঘটাব আমি।

আপনি তো আমার প্রতি অনেক সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন, আর কেন আমাকে ঋণে জর্জরিত করছেন?

ক্যাথেরিন বলতে থাকে।

ডেমিরিস এক দৃষ্টে ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে আছে না, আপনি জানেন না, আমি আরও কত সহৃদয় হতে পারি।

এই কথা শুনে ক্যাথেরিনের কেমন যেন অস্বস্তি হল। ক্যাথেরিন জানে, সত্যি, এই ভদ্রলোকের কোনো তুলনা হয় না।

.

পরের দিন ডেমিরিস লন্ডন শহর ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

ক্যাথেরিন, আপনি কি আমার সঙ্গে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসবেন?

–হ্যাঁ।

আহা, এইভাবে দিন কেটে গেলে কেমন হয়?

এয়ারপোর্ট পৌঁছে একটু ঝুঁকে ডেমিরিস ক্যাথেরিনের গালে একটা চুমু দিলেন।

তার এই আচরণে ক্যাথেরিন খুশি হয়েছে।

ডেমিরিস বললেন–আহা, আপনার সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে পারলাম। এই স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না।

কোস্টা, আমিও আপনার আচরণে খুবই খুশি হয়েছি। কবে আমাদের আবার দেখা

উড়ানপাখি আকাশের বুকে ডানা মেলে দিয়েছে। আহা, সত্যি ডেমিরিসের কোনো তুলনা হয় না। ক্যাথেরিন ভাবল, প্রতি মুহূর্ত ডেমিরিসের কথাই মনে পড়বে আমার।

অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক

০৬.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এবং তার শালা স্পাইরস লামব্রো। তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

স্পাইরস লামব্রোকে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষ বলা যেতে পারে। যথেষ্ট অর্থবান তিনি। ডেমিরিসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। পৃথিবীর সবথেকে বড়ো কারগো জাহাজের মালিক ডেমিরিস। স্পাইরসের হাতে আছে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাহাজ সম্ভার। ডেমিরিস সংবাদপত্র এবং বিমান সংস্থার একটি চেন চালিয়ে থাকেন। তারই পাশাপাশি তিনি একাধিক তৈলখনির মালিক, তৈরি করেছেন ইস্পাতের কারখানা, কিনে নিয়েছেন সোনার খনি। স্পাইরস লামব্রোও এব্যাপারে পিছিয়ে পড়েননি। তার হাতে অনেকগুলো ইনসিওরেন্স কোম্পানির দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছে। একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে তিনি যুক্ত, রিয়েল এস্টেট অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যবসা করেন। এছাড়া তার একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট আছে। সকলেই বলে থাকেন, তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেন, ওপরে যতই বন্ধুত্বের আবরণ থাক না কেন, তারা একে অন্যের ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী।

জনমুখে শোনা গেছে ভাবতে অবাক লাগে, পৃথিবীর দুই ধনকুবের কী করে এমন ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেন!

বাস্তবিক পক্ষে তারা একে অন্যকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। যখন স্পাইরস লামব্রো একশো ফুট লম্বা একটি প্রমোদ তরণী কেনেন, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস সঙ্গে সঙ্গে একশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি প্রমোদ তরণী কেনার জন্য ছটফট করতে থাকেন। এরই পাশাপাশি তিনি দুটি স্পিডবোট কিনে নেন। তৈরি করেন পরিষ্কার জলের একটি সুইমিং পুল। এই ঘটনাতেই প্রমাণ হয়, তারা একে অন্যকে টেক্কা দেবার জন্য কতখানি উদগ্রীব।

স্পাইরস লামব্রোর জাহাজ সম্ভার বারোটি ট্যাঙ্কার, দু লক্ষ টন যুক্ত ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে চলে। এই খবর কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কানে পৌঁছোনো মাত্র তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি ট্যাঙ্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে তেইশ-এ নিয়ে যান। ভারবহনের ক্ষমতা ছলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টনে পৌঁছে যায়। স্পাইরস লামব্রো রেস হর্স কেনার সাথে সাথে ডেমিরিস আর একটা বড়ো আস্তাবল তৈরি করেন। দুই ধনবান মানুষের ঘোড়ার মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই লড়াইতে কে জিতবে তা বুঝতে পারা যায় না। তবে দুজনেই যে ওই লড়াইয়ের ফলাফলের জন্য উগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকেন, তাদের হাবভাব ও আচরণে সেই উৎকণ্ঠা ধরা পড়ে।

তাঁদের দুজনের মাঝে মধ্যেই দেখা হয়। দুজনেই অনেকগুলি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। একই মঞ্চ আলো করে দুজনে পাশাপাশি বসে থাকেন। বিভিন্ন করপোরেশনের বার্ষিক অধিবেশনে তাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আবার কখনও সখনও পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানেও তাদের ডাক দেওয়া হয়।

স্বভাবের দিক থেকে তারা একে অন্যের বিপরীত। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে আমরা সংগ্রামশীল জীবনের নায়ক বলতে পারি। কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে তিনি বুদ্ধি আর পরিশ্রমকে পাথেয় করে আজ এখানে এসে পৌঁছোতে পেরেছেন। স্পাইরস লামব্রার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। জন্ম সূত্রেই তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের। সোনার চামচ মুখে দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন বলা যেতে পারে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা

৯৩৩ তাঁর, পুরোনো রীতিনীতি বজায় রাখতে ভালোবাসেন। খুব একটা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরেন না। তার বংশমর্যাদার কথা ভেবে সব সময় গৌরবান্বিত থাকেন। বাভারিয়ার আটো শহর থেকেই এই বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই বংশের কেউ কেউ একদা গ্রিসের রাজা হিসেবে সুখ্যাত হয়েছিলেন। গ্রিসে যখন রাজনৈতিক উন্মাদনা শুরু হল, তখন সব কিছু কেমন পালটে গেল। তখন এই বংশের কিছু বুদ্ধিমান মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। ধীরে ধীরে তারা জাহাজ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। জমি কেনাবেচার কাজও চলতে থাকে। স্পাইরস লামব্রোর পিতা ছিলেন এক বিখ্যাত ব্যবসাদার। পারিবারিক সূত্রে স্পাইরস সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

গত কয়েক বছর ধরে স্পাইরস লামব্রো এবং কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মধ্যে এই মেকি বন্ধুত্বের সম্পর্কটা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একে অন্যকে শেষ করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। ডেমিরিস মাঝে মধ্যেই বিপাকে পড়েন। বুদ্ধিমত্তার জোরে সেই বিপদের সীমারেখা থেকে আবার জীবনের প্রান্তে চলে আসেন। লামব্রো অবশ্য এ ব্যাপারে একটু সহানুভূতিসম্পন্ন। যেহেতু ডেমিরিস সম্পর্কে তাঁর

শালা, তাই তিনি খুব একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন না। সবসময় প্রিয় বোন মেলিনার মুখখানি মনে পড়ে যায়।

স্পাইরস লামব্রো একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। তিনি ভাগ্যকে বিশ্বাস করেন। ভগবানের ওপর তার আস্থা আছে, আগাধ এবং অটুট। মাঝে মধ্যেই তিনি বিভিন্ন জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ নেন। তবে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেও অতুলনীয়। তিনি অতি সহজে বুঝতে পারেন প্রতারকদের। তাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। একজন জ্যোতিষীর কথা তার বিশেষ মনে পড়ে। ওই ভদ্রমহিলা চোখ বন্ধ করে ভবিষ্যতের স্পষ্ট ছবি দেখতে পান। উনি বলেছিলেন, মেলিনার গর্ভপাত ঘটে যাবে। উনি আরও বলেছিলেন, এই বিবাহ শেষ । পর্যন্ত সুখের হবে না। ওই ভদ্রমহিলা এথেন্সে থাকেন, উনি হলেন মাদাম পিরিস।

.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। গেরোন্ডা স্ট্রিটের অফিসে ঠিক ছটার সময় এসে হাজির হন। এই সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ডেমিরিস বেশ কিছুক্ষণ তার এজেন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বিশ্বের সমস্ত শহরে তার এজেন্টরা। ছড়িয়ে আছেন।

ডেমিরিসের নিজস্ব অফিসটি চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জায় ভরা। দেখলে মনে হয়, এ বুঝি এক রাজপ্রাসাদ! তবে ছোটো এবং সংবদ্ধ। এই অফিসের জানালায় দাঁড়ালে এথেন্স শহরটা ভালোভাবে দেখা যায়। কালো গ্রানাইট দিয়ে মেঝেটা তৈরি হয়েছে। ইস্পাত

এবং চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে ফার্নিচার। দেওয়ালে ঝুলছে অসাধারণ শৈল্পিক নিদর্শন। লেজারসের পাশাপাশি ব্রাকেস এবং পিকাসোর বেশ কয়েকটা বিশ্ববিখ্যাত ছবি। ছবিগুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়, মালিক শিল্পরসিক। আছে কাঁচ এবং ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটি বিরাট ডেস্ক। আছে লেদার প্রোন চেয়ার। ডেস্কের ওপর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মুখোশ সাজানো আছে। ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি। লেখা আছে? আলেকজান্ডার–মানুষের পরিত্রাতা।

সেই বিশেষ সকালে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের নিজস্ব ফোনটা বেজে উঠল। তখন তিনি সবেমাত্র অফিসে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু এই ফোননম্বর তো জানে মাত্র দু-জন মানুষ। তাহলে কে?

ডেমিরিস রিসিভার তুলে বললেন–কালিমেহরা।

কালিমেহরা, কণ্ঠস্বর ভেসে এল, স্পাইরস লামব্রোর প্রাইভেট সেক্রেটারি নিকোস ভেরিটোজ-এর। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছে।

-অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন মিঃ ডেমিরিস। আপনি বলেছিলেন, বিশেষ কোনো খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে যেন জানানো হয়।

-হ্যাঁ, কিন্তু, খবরটা কী?

লামব্রো একটা কোম্পানি কিনে নেবার চেষ্টা করছেন। কোম্পানিটির নাম হল অরোরা, ইন্টারন্যাশনাল। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে এটিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। লামব্রোর

একজন বন্ধু এই কোম্পানির ডাইরেক্টরস-এর অন্যতম। এই কোম্পানির সঙ্গে সরকারের ভালোলা সম্পর্ক আছে। নানা ধরনের বরাদ পেয়ে থাকে এই কোম্পানিটি। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। কিছু দিনের মধ্যেই স্টক মার্কেটে কোম্পানির সুনাম আরও বেড়ে যাবে। শেয়ারের দামও বাড়তে থাকবে।

–আমি স্টক মার্কেটের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নই, ডেমিনিস সংক্ষেপে বললেন, পরবর্তীকালে কিন্তু এভাবে আমাকে আর বিরক্ত করবে না, ঠিক আছে।

–আমি দুঃখিত, মিঃ ডেমিরিস, আমি ভেবেছিলাম...

কী ভেবেছিলেন, সেটা জানার প্রয়োজন বোধ করলেন না মিঃ ডেমিরিস। তিনি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

.

সকাল আটটা, ডেমিরিসের সহকারী জিনাস টায়োস প্রবেশ করলেন। ডেমিনিস তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং বললেন নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে অরোরা ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি আছে। আমাদের সমস্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলল যে, এই কোম্পানিটাকে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অচেনা অজানা উৎসের কথা বলবে। তবে খবরটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই গল্পটা রোজ শোনাবে। যাতে বাজারে কোম্পানির সুনামটা পড়ে যায়। তারপর এই কোম্পানিটাকে কেনার চেষ্টা । করা হবে।

–ঠিক আছে স্যার। আর কিছু?

না, আমার হাতে সব ক্ষমতা আসবার পর বলতে হবে যে, এসব গুজবের অন্তরালে কোনো সত্যি লুকিয়ে নেই। দেখো, স্পাইরাস লামব্রো ইতিমধ্যে কতদূর এগিয়েছেন। এই কোম্পানির ব্যাপারে আরও খোঁজখবর নাও।

জিনাস টাকরোস শান্তভাবে বললেন–মিঃ ডেমিরিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করাটা কিন্তু আইনত অপরাধ।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস হেসে বললেন আমি জানি।

.

এক মাইল দূরে সিনটাগমা স্কোয়ারে স্পাইরস লামব্রো তার অফিসে বসে কাজ করছিলেন। তার অফিসটা দেখলে মনে হয়, এখানে আভিজাত্যের সঙ্গে প্রাচীনত্বের সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। যে ফার্নিচারগুলো অফিসে পাতা, সেগুলিকে অনায়াসে আমরা বিরলতম অ্যান্টিক বলতে পারি। তার মধ্যে ফরাসি এবং ইতালীয় সৌন্দর্যের ছাপ আছে। তিনদিকের দেওয়ালে সেসব ছবি টাঙানো রয়েছে সেগুলি ফরাসি ইমপ্রেসনিস্ট যুগের শিল্পীদের আঁকা। চতুর্থ দেওয়ালটি উৎসর্গ করা হয়েছে বেলজিয়ামজাত শিল্পীদের উদ্দেশে, ভ্যানরাই সেলবার্গ থেকে ডিস্মেড পর্যন্ত। অফিসের বাইরে দরজায় লেখা আছে– লামব্রো অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। কিন্তু নেহাতই কথার কথা। স্পাইরস লামব্রো তার বাবার কাছ থেকে বিশাল ব্যবসার উত্তরাধিকার সংগ্রহ করেছেন। অনেক বছর ধরে কঠিন

পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন তার বাণিজ্যের সুবাস। এখানে তিনিই সর্বময় কর্তা।

স্পাইরস লামব্রোকে আমরা এক সুখী মানুষ বলতে পারি। তিনি ধনী এবং সফল। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন স্পাইরস সত্যিকারের সুখ ভোগ করতে পারবেন না। এই শালাবাবুটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। বলা যেতে পারে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। ডেমিরিস তার চোখে এক জীবন্ত শয়তান। এমন একজন শয়তান, যার মধ্যে নৈতিকতার ছাপ নেই। ডেমিরিসের যে-কোনো আচরণকে লামব্রো সন্দেহের চোখে দেখেন। বিশেষ করে প্রিয় বোন মেলিনার প্রতি তার এই অভদ্র আচরণকে তিনি কোনোদিনই ক্ষমা করবেন না। বোধহয় তাদের দুজনের মধ্যে শত্রুতা এখন চরমসীমায় পৌঁছে গেছে।

এই বৈরিতার সূত্রপাত হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। সেই গল্পটাও আমাদের শুনে নিতে হবে। একদিন লাঞ্চের আসরে স্পাইরস লামব্রো তাঁর প্রিয় বোন মেলিনার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মেলিনা দাদাকে এত উত্তেজিত হতে আগে কখনও দেখেননি।

–মেলিনা, তুমি কি জানো একদিনে সারা পৃথিবীতে কত পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি খরচ করা হয়? এটা তৈরি হতে হাজার বছর সময় লেগেছে।

না, স্পাইরস, এ খবরটা আমার জানা ছিল না।

–তাহলেই বুঝতে পারছ, আগামী দিনে তরল সোনার চাহিদা কতখানি বৃদ্ধি পাবে। যার হাতে বড়ো বড়ো অয়েল ট্যাঙ্কার থাকবে, সেই হবে এই পৃথিবীর আসল রাজা।

–তুমি কি ট্যাঙ্কার তৈরি করতে চাইছ?

আমি বড়ো ট্যাঙ্কারের একটা ফ্লিট তৈরি করব। আমার কাছে এখন যে ফ্লিট আছে, আয়তনে এটা হবে তার দ্বিগুণ।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, উত্তেজনায় স্পাইরস অধীর হয়ে উঠেছেন। তিনি আরও বলতে থাকেন- আমি বেশ কয়েক মাস ধরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। তুমি সব কিছু সংক্ষেপে শুনে রাখো। পারস্য উপসাগর থেকে এক গ্যালন পেট্রোলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে নিয়ে আসতে খরচ হয় সাত সেন্ট। কিন্তু যদি একটা বড় ট্যাঙ্কার হাতে থাকে, তা হলে এই খরচটাকে আমরা কমিয়ে গ্যালন প্রতি তিন সেন্টে নিয়ে আসতে পারি। বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি?

স্পাইরস, কিন্তু এত বড়ো একটা ফ্লিট তৈরি করার জন্য টাকাপয়সা কোথা থেকে আসবে।

স্পাইস হেসেছিলেন- আগে আমার প্রকল্পের পুরোটা শোনন, তারপর কথা বলবে। এর জন্য আমাকে এক সেন্টও খরচ করতে হবে না।

কী বললে?

স্পাইরস ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন–আগামী মাসে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাব। সেখানকার বড়ো বড়ো তেল কোম্পানির মাতব্বরদের সঙ্গে বৈঠক করব। এই ট্যাঙ্কারের সাহায্যে আমি তাদের তেল অর্ধেক দামে পাঠাতে পারব, এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব ছুঁড়ে দেব।

কিন্তু তোমার হাতে তো এখন বড়ো ট্যাঙ্কার নেই।

স্পাইস হেসে বলেছিলেন না, কিন্তু আমি যদি ওইসব তেল কোম্পানির কাছ থেকে

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি আনতে পারি, তাহলে ব্যাঙ্ক সহজেই আমার হাতে ঋণের টাকা তুলে দেবে। সেই টাকা দিয়ে আমি ট্যাঙ্কার তৈরি করব। উপযুক্ত সময়ে টাকা ফেরত দেব। কী বোন, আমার এই প্রকল্পের মধ্যে কোনো ফাঁক আছে কী?

–আহা, দাদা, সত্যি তুমি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি! আমার চোখে তুমি সর্বোত্তম।

– মেলিনা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভাইয়ের এই প্রকল্পনার কথা সেদিনই স্বামী ডেমিরিসের কানে পৌঁছে দিলেন সন্ধ্যেবেলা এক ভোজের আসরে।

সবকিছু বোঝানো সম্পূর্ণ হল। মেলিনা বললেন–এটা একটা চমৎকার পরিকল্পনা, তাই না?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। তারপর বললেন–তোমার ভাই একজন স্বপ্নবিলাসী। ব্যাপারটা বলা সহজ, কিন্তু কাজে করে দেখানো মোটেই সহজ নয়।

মেলিনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন–কেন কোস্টা?

কারণ, এই ব্যাপারটার মধ্যে অনেক ভজঘট জিনিস আছে। প্রথমত, আমার তো মনে হয় না, তরল সোনার জন্য এতখানি বাজার থাকবে। তাই ওই বড়ো বড়ো ট্যাঙ্কারগুলো খালি অবস্থাতেই যাতায়াত করবে। দ্বিতীয়ত, তেল কোম্পানিগুলো এমন কোনো বিষয়ে লগ্নি করতে চাইবে না, যার অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত নেই। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক বোধহয় এই ব্যাপারটাতে অর্থ ঋণ দেবে না। সবটাই আকাশকুসুম কল্পনা।

স্বামীর মুখ থেকে ছুটে আসা এই শব্দগুলো মেলিনার উৎসাহ নিভিয়ে দিয়েছিল। মেলিনা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

–তবে স্পাইরস এত উত্তেজনার সৃষ্টি করছে কেন? আমি কি ভাইয়ের সাথে এব্যাপারে কথা বলতে পারি?

ডেমিরিস মাথা নেড়ে বলেছিলেন–তুমি এ ব্যাপারে নাক গলিও না মেলিনা। তোমার ভাই তার নিজের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর থাকুক। আমাদের সংলাপের কথা যেন তার কানে যায়। ব্যাপারটা মনে রেখো, কেমন?

-ঠিক আছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেলিনা বলেছিলেন, কোস্টা, তুমি যা বললে আমি তাই মনে রাখব।

.

পরের দিন সকালে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে উড়ে গেলেন। বড়ো ট্যাঙ্কারের ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে। তিনি জানতেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ানের বাইরে যে তেলের খনিগুলি আছে, সেগুলির অবস্থা সঙ্গীন। সাতটি বড়ো বড়ো কোম্পানি এই তেলের খনিগুলোর ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। এই কেম্পানিগুলি হল স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অফ নিউজার্সি, স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, গালফ অয়েল, টেকসাস কোম্পানি, সোকোনি ভ্যাকুয়াম, রয়্যাল ডাচসেল এবং অ্যাংলো ইরানিয়ান। তিনি আরও জানেন, তিনি যদি একটি মাত্র কোম্পানির সাথে চুক্তি করতে পারেন, তাহলে বাকি কোম্পানিগুলিও তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

.

কনস্ট্যানটিন প্রথম গিয়েছিলেন নিউজার্সির স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির অফিসে। আওয়েন গারটিসের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই কথা বলা ছিল। ওই ভদ্রলোক এই বিরাট তেল কোম্পানির চতুর্থ ভাইসপ্রেসিডেন্ট।

–মিঃ ডেমিরিস, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

–আমি আমার একটা প্রকল্পনার কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই। এই প্রকল্পনাটি ঠিকমতো এগিয়ে গেলে আপনার কোম্পানি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে।

–আপনি তো টেলিফোনে একথা বলতে পারতেন। গারটিস তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলেন। আসলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার একটা মিটিং আছে। আপনি সংক্ষেপে বলতে পারবেন কী?

–আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলছি। পারস্য উপসাগর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তে তেল আনতে প্রতি গ্যালনে সাত সেন্ট করে খরচ হয়, তাই তো?

ডেমিরিসের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বলেছিলেন- হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–আমি যদি বলি, গ্যালন প্রতি তিন সেন্টে আমি সেই তেল আপনার হাতে পৌঁছে দেব, তাহলে কি আপনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন?

গারটিস যেন চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তিনি হাসলেন। বললেন, এই অলৌকিক ঘটনাটা আপনি ঘটাবেন কী করে?

ডেমিরিস শান্তভাবে বলেছিলেন–এখন আমাদের হাতে যেসব ট্যাঙ্কার আছে আমি তার দ্বিগুণ আয়তনের ট্যাঙ্কার তৈরি করব। বুঝতে পারছেন, কত সহজে আমি দামটা কমিয়ে আনতে পারব। আর একটা ব্যাপার, যে মুহূর্তে তেল উৎখনন করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ট্যাঙ্কারে ভরা হবে। মাঝে এতটুকু সময় নষ্ট করা হবে না।

গারটিস ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

কিন্তু আপনি এতগুলো বড়ো বড়ো ট্যাঙ্কার তৈরি করবেন কী করে?

আমি সেগুলো বানাব।

না, এব্যাপারে আমরা কোনো অর্থ সাহায্য করতে পারব না।

ডেমিরিস বাধা দিয়ে বললেন–আপনার কোম্পানিকে এক পেনিও খরচ করতে হবে না। আমি শুধু আপনার কাছ থেকে একটা দীর্ঘমেয়াদি শর্তসম্পন্ন চুক্তিতে সম্মতি চাইছি। এখন আপনি যে দাম দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে অর্ধেক দামে একই পরিমাণ তেল পাবেন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমি অর্থনৈতিক সঙ্গতি পাব। এ ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বিরাজ করছিল নীরবতা। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, গারটিস এই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। শেষ অব্দি তিনি বললেন আমার মনে হচ্ছে, আপনি ওপরে গিয়ে আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলুন।

.

এভাবেই শুরু হয়েছিল গল্পটা। অন্যান্য তেল কোম্পানির মালিকের সাথে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের একই রকম কথা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে স্পাইরস লামব্রো নিজের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যখন এই ষড়যন্ত্রের কথা তার কানে পৌঁছল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছিলেন। কতগুলি স্বাধীন কোম্পানির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু ডেমিরিস ইতিমধ্যেই লাভের আসল অংশ তুলে নিয়ে গেছেন।

–ওই কুত্তাটা তোমার স্বামী! লামব্রো রাগে ফেটে পড়েছিলেন, আমি কথা দিচ্ছি মেলিনা একদিন আমি তাকে যথেষ্ট শাস্তি দেব, এই ষড়যন্ত্রের কোনো ক্ষমা হয় না।

মেলিনা এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তার কেবলই মনে হয়েছিল, তিনি বোধহয় ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার খেলা খেললেন।

তারপর, তারপর তিনি স্বামীর সাথে বাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ডেমিরিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন- মেলিনা, আমি তো ওদের সাথে কথা বলতে যাইনি। ওরাই এসেছে আমার কাছে। তুমি বলো, একজন ব্যবসায়ী হয়ে আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব কী করে?

সেখানেই এই সংলাপ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

.

তখন থেকেই ডেমিরিস সম্পর্কে লামব্রোর ধারণা আরও খারাপ হয়ে যায়। তবে চরম কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রতি বার তিনি প্রিয় বোন মেলিনার কথা ভাবতে থাকেন।

সেদিক দিয়ে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে এক শয়তান বলেই মনে করা যায়। এই মানুষটি নিজের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন। স্পাইরস সম্পর্কে তিনি মোটেই আগ্রহী নন। তিনি মেলিনাকে মাঝে মধ্যে অপমান করেন। সময় এবং সুযোগ পেলে লামব্রো পরিবারের সকলকেই বিষতীরে বিদ্ধ করতে চান। নোয়েলে পেজ নামে ওই অভিনেত্রীর

সাথে ডেমিরিসের ঘটনার কথা অনেকেই জেনেছেন। বিভিন্ন পত্রিকাতে এবিষয়ে মুখরোচক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্পাইরস ভাবতে থাকেন, একদিন নিশ্চয়ই...

.

লামব্রোর সহকারী নিকোস ভেরিটোজ, তিনি ধীরে ধীরে অফিসে প্রবেশ করলেন। গত পনেরো বছর ধরে এই ভদ্রলোক স্পাইরস লামব্রোর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাকে আমরা যথেষ্ট উদ্যমী বলতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে স্বপ্ন নেই। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাকে ধূসর এবং মুখহীন বলে মনে হয়। দুই মহান ধনী ব্যক্তির মধ্যে যে লড়াই চলেছে, ভেরিটোজ সেই লড়াইয়ের সুযোগটা নিতে পারছেন না। তিনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। তিনি ভেবেছেন, এই লড়াইতে শেষ পর্যন্ত ডেমিরিস জয়যুক্ত হবেন। তাই ডেমিরিসের কানে অত্যন্ত গোপন খবর সংগোপনে পৌঁছে দেন। ভাবেন, এর জন্য তাকে অর্থনৈতিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

ভেরিটোজ লামব্রোর কাছে পৌঁছে গেলেন- আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। মি. অ্যান্থনি রিজোলি নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

লামব্রো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন- ওকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

অ্যান্থনি রিজোলির বয়স পঁয়তাল্লিশ, কালো চুল, পাতলা নাক, চোখের রং বাদামি। তাকে দেখে মনে হয় তিনি বুঝি এক প্রশিক্ষিত বক্সার। ভারি সুন্দর পোশাক তার পরনে। আজ তিনি হলুদ সিল্কের শার্ট পরেছেন। নরম চামড়ার জুতো। আস্তে আস্তে কথা বলেন।

ভদ্র এবং সুস্নাত, মনে হচ্ছে কোনো একটা কারণে তার মনে অকারণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

–আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগছে শ্রী লামব্রো।

বসুন মিঃ রিজোলি।

রিজোলি চেয়ারে বসে পড়লেন।

আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

–হ্যাঁ, আমি মিঃ ভেরিটোজকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি। আমি আপনার একটা বড়ো কারগোশিপ ভাড়া নিতে চাইছি। মার্সেইলসে আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে। সেখান থেকে কিছু ভারী মেশিনারি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাব। যদি আপনার সঙ্গে আমার চুক্তিটা ঠিক হয়ে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে অনেক ব্যবসা করা সম্ভব হবে।

স্পাইরস লামব্রা তার চেয়ারে বসে কী যেন ভাবলেন। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা এই মানুষটির মুখের দিকে তাকালেন।

মিঃ রিজোলি, এটাই কি আপনার পরিকল্পনা? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

অ্যান্থনি রিজোলি বললেন–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। কারণ আপনাকে দেবার মতো কোনো জাহাজ আমার হাতে নেই।

-কেন? আপনি একথা বলছেন কেন?

নিষিদ্ধ ড্রাগ, মিঃ রিজোলি, আপনি নিষিদ্ধ ড্রাগ কেনাবেচা করেন।

এই অভিযোগ শুনে রিজোলির চোখ ছোটো হয়ে গেল- আপনি আহাম্মক, আপনি নানাধরনের গুজবে বিশ্বাস করেন। আসল সত্যটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন না।

আসলে এটাই সত্যি। স্পাইরস লামব্রো প্রত্যেক মানুষের অন্তরালে কী আছে তা দেখতে পান। অ্যান্থলি রিজোলি হলেন ইউরোপের প্রধান ড্রাগস স্মাগলার। তিনি মাফিয়া দলের সদস্য। এই সংগঠনের অন্যতম কর্তা। রিজোলির সম্পর্কে অনেক কথা এখানে সেখানে লেখা হয়। তাই হয়তো লামব্রো পিছিয়ে আসছেন।

আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না। আপনি অন্য কোনো কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

অ্যান্থনি রিজোলি আর কথা বাড়ালেন না। তার চোখ শীতল হয়ে এসেছে। তিনি বললেন–ঠিক আছে। তিনি তার পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করলেন। সেটা ডেস্কের ওপর রাখলেন। যদি কোন সময় আপনার মনের পরিবর্তন ঘটে, তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তিনি অতি দ্রুত স্পাইরসের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্পাইরস লামব্রো ওই কার্ডটা তুলে নিলেন। লেখা আছেঃ অ্যান্থনি রিজোলি, ইমপোর্ট এক্সপোর্ট। নীচে এথেন্সের হোটেলের ঠিকানা দেওয়া আছে। তলায় একটা টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে।

নিকোস ভেরিটোজ শান্ত মনে এই সংলাপ শুনছিলেন। যখন অ্যান্থনি রিজোলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বললেন–সত্যি কী?

-হ্যাঁ, মি. রিজোলি হেরোইনের ব্যবসা করেন। যদি আমরা আমাদের জাহাজ দিই, তাহলে সরকার আমাদের ব্যবসাটাই বন্ধ করে দেবে। আমি অত বোকা নই।

.

অ্যান্থনি রিজোলি লামব্রোর অফিস থেকে অতি দ্রুত বেরিয়ে এলেন।

এই বদমাইসটা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু সে আমার গোপন ড্রাগ ব্যবসার খবর পেল কী করে? এই জাহাজগুলো অত্যন্ত বড়ো। এর মাধ্যমে আমরা অনেক টাকার ড্রাগ পাচার করতে পারতাম। অন্তত এক কোটি ডলারের তো হবেই। সমস্যা হচ্ছে, কোনো কোম্পানি আমাদের সঙ্গে চুক্তি করবে না। এথেন্সের সর্বত্র আমার বদনাম ছড়িয়ে গেছে। সিসিলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

অ্যান্থনি রিজোলি কখনও কোনো ব্যাপারে মন খারাপ করেন না। তিনি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মানুষ। জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করার জন্যই জন্ম হয়েছে তার। তিনি জানেন, এমন অনেক সমস্যার মোকাবিলা তাকে করতেই হবে।

নিউইয়র্ক শহরের হেলসকিচেনে তিনি বেড়ে উঠেছেন। ভৌগোলিক দিক থেকে এই জায়গাটা ম্যানহাট্টানের পশ্চিমদিকে। এইট এভিনিউ এবং হাডসন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। টোয়েন্টি থার্ড ও ফিফটি নাইথ স্টিটের মাঝে। মনোস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হেলসকিচেন হল এমন একটি শহর, যার চারদিকে নিরাপত্তার বাঁধন আছে। কী নিরাপত্তা? এখানে সবসময় চুরি-ছিনতাই হয়ে থাকে। এখানে গফারস, পারলোর মব, গরিলাস এবং রোডেস গ্যাং এর দল আছে। তারা একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করে। খুন জখমের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। একশো ডলার হাতে দিলে যে-কোনো মানুষের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করা যায়। আহা, এটা হল এক জঘন্য নরক!

হেলসকিচেনে যারা বসবাস করে, তারা উকুন, বিছে-আর ইঁদুরের সাথে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এখানে কোনো বাথটব নেই। তাই ছেলেমেয়েরা নিজস্ব উপায়ে সমস্যা সমাধান করে। তারা ল্যাংটো হয়ে চলে যায় হাডসন নদীর ডকের কাছে। সেই জলে স্নান করে। বাকি সব কিছুও সেখানেই সারা হয়। এই ডকের অবস্থা শোচনীয়। কী নেই সেখানে? কুকুর-বেড়ালের মৃতদেহ থেকে শুরু করে যত রাজ্যের নোংরা।

এই শহরের রাস্তাঘাটে নানা ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ফায়ার ইঞ্জিন অ্যালার্ম বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে। একদল মস্তান মারামারি করছে। বিয়ের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। পথের পাশে বেসবলের আসর বসেছে। ঘোড়া ছুটে চলেছে। সিনেমার শুযটিং হচ্ছে।

এই অঞ্চলের একমাত্র খেলার মাঠটি আছে রাস্তার এক প্রান্তে। সেখানে মাঝে মধ্যে শিশুদের চিৎকার করতে দেখা যায়। গরমকালে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। নদীর জল পচে যায়। দরিদ্রতার চিহ্নমাখা এই শহর। এখানেই অ্যান্থনি রিজোলির বেড়ে ওঠা।

অ্যান্থনি রিজোলির অনেক স্মৃতি আছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিছু পয়সা চুরি করেছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। বয়সে বড় ছেলেরা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করত। যে পথ দিয়ে তিনি স্কুলে যেতেন। সেই পথের দুপাশে, মস্তানদের বাসস্থান। স্কুলটাকেও আমরা সংক্ষেপে একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলতে পারি। পনেরো বছর বয়সের মধ্যে রিজোলি অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন।

ফাইটার হিসেবে যথেষ্ট নাম হয় তার, মারামারি করতে তার ভীষণ ভালো লাগত। যে-কোনো ব্যাপারে তিনি মস্তানি দেখাতেন। তিনি আর তার বন্ধুরা স্টিলম্যানস জিমে গিয়ে বক্সিং প্র্যাকটিস করতেন।

তখন থেকেই ছোটোখাটো ঝামেলা ঝাটে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিখ্যাত বক্সাররা মাঝে মধ্যে এই পাড়াতে আসত। ফ্রাঙ্ক কসটেলোর সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। জো অ্যাডোনিসকে তিনি চোখের সামনে থেকে দেখেছেন লাকি লুসিয়ানোকেও। বক্সিং তাঁর শরীরে উত্তেজনা এনে দিত। এক-একটা ঘুষির মধ্যে দিয়ে নিজের ঘৃণা এবং অপমান প্রকাশ করতে চাইতেন। প্রত্যেকটা লড়াইতে টনি রিজোলি শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতেন। কিছুদিনের মধ্যেই রিজোলি মস্তান বাহিনীর নয়নের মণি হয়ে ওঠেন।

একদিন রিজোলি লকার রুমে গিয়ে পোশাক পাল্টাচ্ছিলেন। তখন দুই বিখ্যাত বক্সারের কথোপকথন তিনি শুনে ফেললেন। তাদের একজন ফ্রাঙ্ক কসটেলে অন্যজন লাকি লুসিয়ানো।

–এই ছেলেটা একটা সোনার খনি, লুসিয়ানো বলছিলেন, আমি গত সপ্তাহে, ওর ওপর পাঁচটা গ্রান্ড জিতেছি।

–তাহলে? লোউ ডোমিনিকের সাথে লড়াই-এ বাজি হবে নাকি?

–হ্যাঁ, কেন হবে না।

–তাহলে কী করতে হবে?

দশে এক, এইভাবে বাজিটা হবে।

টনি রিজোলির শরীরে একটা শীতল শিহরণ, এই সংলাপের অন্তরালে কী লেখা আছে, তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রিজোলি সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা জিনোর শরণাপন্ন হন। পুরো ব্যাপারটা জিনোকে বুঝিয়ে বললেন।

–হায় যিশু, ভাই বলেছিল, ওই দুটো বক্সার তোকে নিয়ে মরণ খেলা খেলতে চাইছে,, তাই তো? তোকে সামনে রেখে ওরা লক্ষ লক্ষ ডলার কামাবে বলে ভেবেছে।

–আমি তো পেশাদার বক্সার নই।

জিনো তার দিকে তাকিয়ে বলেছে তুই কখনও কোনো লড়াইতে হারিসনি, তাই। তো টনি?

-না।

এই ব্যাপারটাই বোধহয় ওদের মনে ধরেছে। ওরা তাই তোকে নিয়ে জুয়া খেলার আসর তৈরি করতে চাইছে।

ছোটো ভাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জিনো তাকে জড়িয়ে ধরে বলে–এর মানে অনেক কিছুই। আমাদের দুজনের ভাগ্যের চাকা একেবারে ঘুরে যাবে। ছোটো ভাইটি আমার, আমার পাশে বসে পুরো ব্যাপারটা শো।

.

স্টিলম্যানের জিমে লোউ ডোমিনিকের সাথে লড়াইটা শুরু হল শুক্রবারের বিকেলবেলা। বড়ো বড়ো দাদারা সব সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্ক কসটেলো, জো অ্যাডোনিস, অ্যালবার্ট অ্যানাসটাসিয়া, লাকি লুসিয়ানো, মেয়ার ল্যানস্কি। তারা ছোটো বক্সারদের লড়াই দেখতে ভালোবাসেন। তারা মনে করেন যে, এইভাবে অনেক টাকা আয় করা যেতে পারে।

লোউ ডোমিনিকের বয়স সতেরো বছর। টনির থেকে এক বছরের বড়ো। ওজনে পাঁচ পাউন্ড বেশি। কিন্তু উনি রিজোলির মতো তীক্ষ্ণ মন ছিল না তার। বক্সিং-এর ছলাকলা সে ভালো জানত না। আর একটা জিনিসও তার মধ্যে ছিল না। হত্যা করার প্রবণতা, যা একজন বক্সারের জয়ের চাবিকাঠি।

পাঁচ রাউন্ডের লড়াই। প্রথম রাউন্ড সহজেই জিতে নিয়েছিল টনি। দ্বিতীয় রাউন্ডটাও সে জিতে গেল। এবং তৃতীয় রাউন্ডটা। মস্তানদের মধ্যে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেছে। কে কত টাকা লগ্নি করেছে তার গোপন হিসাব-নিকাশ। এবার সুদে-আসলে সব বুঝে নেবার পালা।

মনে হচ্ছে, এই ছেলেটা একদিন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হবে। লাকি লুসিয়ানো মন্তব্য করেছিলেন, এই ছেলেটার জন্য কত টাকা লগ্নি করা হয়েছে?

–দশ গ্রান্ড। ফ্রাঙ্ক কসটেলো বলেছিলেন। আমি এর জন্য একে পনেরো দিতে পারি। এই ছেলেটা এখনই যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল। পঞ্চম রাউন্ডের মাঝামাঝি, লোউ ডোমিনিক টনি রিজোলিকে ফেলে দিল। আপার কাটের মাধ্যমে। রেফারি গুনতে শুরু করে দিয়েছেন...খুবই ধীরে ধীরে, তিনি তাকিয়ে আছেন চারপাশের উন্মত্ত জনতার মুখের দিকে। সকলের ইচ্ছে, টনি উঠে দাঁড়াক।

ওঠ-ওঠ কুত্তার বাচ্চা, উঠে দাঁড়া। জো অ্যাডোনিস চিৎকার করে বলেছিলেন, উঠে দাঁড়া আর লড়াই শুরু কর।

গোনা শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ অব্দি দশ পর্যন্ত গোনা শেষ হল। টনি রিজোলি তখনও শুয়ে আছেন, উঠতে পারছেন না।

কুত্তির বাচ্চা, একটা, একটা ঘুষি তোকে শেষ করে দিল।

মানুষগুলোর অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। তারা ভাবতেই পারছে না এমন একটা অভাবিত ঘটনা কী করে ঘটল।

জিনো তার ভাই অ্যান্থনি রিজোলিকে ড্রেসিং রুমে নিয়ে গেল। অ্যান্থনির চোখ বন্ধ ছিল। অ্যান্থনি ভেবেছিলেন, তিনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

শেষ অব্দি অ্যান্থনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

তার ভাই বলল–বুঝতে পারছিস, এই অভিনয়ের দ্বারা আমরা কত টাকা আয় করলাম। এক হাজার ডলার!

–আমি বুঝতে পারছি না।

আমি টাকা ধার করেছিলাম, ডোমিনিকের ওপর লগ্নি করেছিলাম। হিসাবটা ছিল। ১৫-১। বুঝতেই পারছিস ডোমিনিক জিতে গেছে, আমরা কত টাকা পেয়েছি।

এরকম কথা বলছ কেন? টনি জিজ্ঞাসা করল, যদি ওরা জানতে পারে।

জিনো হেসে বলেছিল এই গোপন ব্যাপারটা কেউ জানতে পারবে না। শুধু তুই আর আমি ছাড়া।

.

পরের দিন টনি রিজোলি যখন স্কুলে যাচ্ছে, তখনই একটা লম্বা কালো লিমুজিন গাড়ির সঙ্গে তার দেখা হল। লাকি লুসিয়ানোকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখা গেল। তিনি বললেন এসো, ভেতরে চলে এসো।

টনি রিজোলির হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। টনি বলল–মি. লুসিয়ানো, আমি স্কুলে যাচ্ছি। দেরি হয়ে যাবে।

–ভেতরে এসো। কর্তৃত্বের সুর বাজছে লাকির কণ্ঠস্বরে।

টনি রিজোলি লিমুজিনের মধ্যে বসে পড়ল। লাকি লুসিয়ানো ড্রাইভারকে বলল, ব্লকের দিকে এগিয়ে চল।

হায় ভগবান, এইভাবে আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

লুসিয়ানো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলেছিল–ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো তো?

রিজোলি আমতা আমতা করতে থাকে–স্যার, আপনি কী বলছেন?

আমাকে বোকা হাঁদা ভেবো না। এই নকল যুদ্ধে কত টাকা পেয়েছ?

–কিছুই না মিঃ লুসিয়ানো।

–আমি তোমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করছি, এই নকল যুদ্ধে কত টাকা পেয়েছ?

ভয় পেয়ে টনি বলে ওঠে–এক হাজার ডলার।

লাকি লুসিয়ানো হেসে ওঠে- এটা তো মুরগির খাবার। আমার মনে হচ্ছে..তোমার বয়স কত?

–ষোলো বছর?

–ষোলো বছরের বালক হয়ে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়েছে। তুমি কি জানো, তোমার এই আচরণ আমাকে আর আমার বন্ধুকে পথের ভিখিরি করেছে।

–এর জন্য আমি দুঃখিত।

-এটা ভুলে যাও। তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

–আপনাকে ধন্যবাদ।

–আমি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলব না। টনি, আমার বন্ধুদের কানে যদি এই খবর পৌঁছে যায়, তাহলে তোমাকে তারা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তুমি আগামী সোমবার

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো। এরপর থেকে তুমি আর আমি একসঙ্গে কাজ করব, কেমন? কথা দিচ্ছ তো!

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। টনি রিজোলি এখন লাকি লুসিয়ানোর হয়ে কাজ করছে। রিজোলি রানার হিসেবে কাজ শুরু করেছে। পরে এনফোর্সের চাকরি পেয়েছে। সব কিছুই ঘটে গেছে গত সাতদিনের মধ্যে। এই কদিনেই টনি লুসিয়ানোর ডানহাত হয়ে উঠেছে।

এরপর যতদিন না লাকি লুসিয়ানোকে গ্রেপ্তার করা হল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হল, তাকে জেলখানায় পাঠানো হল, ততদিনে টনি রিজোলি লুসিয়ানোর বিরাট সংগঠনের অন্যতম নেতা হয়ে উঠেছেন।

.

এরা নানা ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম করে থাকে। জুয়াখেলা থেকে শুরু করে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া, মেয়েদের নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা চালানো, আরও কত কী? নানা উৎস থেকে অর্থের স্রোত অবিরাম ধেয়ে আসছে। ড্রাগের ব্যবসাও চালু আছে। তবে সব ব্যাপারগুলো একসঙ্গে চলে না।

টনি রিজোলি ইতিমধ্যে যথেষ্ট বড়োলোক হয়ে উঠেছেন। জীবনকে তিনি দেখেছেন তার কদর্য অবস্থায়। তিনি জানেন, কীভাবে সব কিছু সামলাতে হয়। এভাবেই ভাগ্যের চাকা এগিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত তাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হল।

.

টনি রিজোলি এমন একজন মানুষ, যিনি চট করে কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চান না। তিনি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে ভালোবাসেন। শেষ পর্যন্ত হেরোইন ব্যবসাতে মনোনিবেশ করলেন।

হেরোইনকে অনায়াসে আমরা নারকোটিক্সের রাজা বলতে পারি। মারিয়ানা এবং কোকেনেরও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু হেরোইন যে অবস্থার সৃষ্টি করে তা অন্য কেউ দিতে পারে না। হেরোইন আমাদের সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জকে আচ্ছন্ন করে। কোনো ব্যথা নেই, কোনো সমস্যা নেই, কোনো যন্ত্রণা নেই। হেরোইনের সাহায্যে আমরা স্বপ্ন লোকের বাসিন্দা হয়ে যাই। আমরা যে-কোনো অপকর্ম সহজেই করতে পারি। হেরোইন। শেষ পর্যন্ত আমাদের ধর্মে পরিণত হয়। আমরা হেরোইনের দাস হয়ে যাই।

এভাবেই বোধহয় সারা পৃথিবীতে হেরোইন সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে। রিজোলি তুরস্ক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। তাঁর প্রিয় এজেন্ট পেটে লুক্কার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল।

রিজোলি বললেন–আমি এই ব্যাপারটায় যোগ দিতে চাইছি। কিন্তু কোনো সমস্যা হলে আমি তা সামলাতে পারব না।

টনি, আপনার বুদ্ধিমত্তা আমাকে অবাক করেছে।

–আমি চাইছি, এখনই আপনি তুরস্কে চলে গিয়ে এ ব্যাপারটার সমাধান করুন। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

ওই ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকলেন।

আমি কথা দিচ্ছি, কিন্তু ওরা কি রাজি হবে? টনি, ওদের মধ্যে নৈতিকতার ছাপ নেই। ওরা কুকুরের মতো। যদি বিশ্বাস ভেঙে যায়, ওরা আপনাকে হত্যা করবে।

–আমি সাবধানে থাকব।

–ঠিক আছে।

দু সপ্তাহ কেটে গেছে। টনি রিজোলি চলেছেন তুরস্কের দিকে।

তিনি বিভিন্ন শহরে গেলেন। ইজমির থেকে আফইওন এবং এসকিসেইর। এইভাবেই তার কাজ শুরু হল।

একে একে বাধাগুলো অতিক্রম করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়। তবে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি জানতেন যে করেই হোক তুরস্ক জয় তাকে করতেই হবে। শেষ অবধি অনেককে ফোন করলেন। নিজেই চলে এলেন তুরস্ক-সিরীয় সীমান্ত অঞ্চলের কিলিস শহরে। কে কারেলা অঞ্চলের ক্ষেতগুলো পরিদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হল। এখানে আফিম-এর চাষ হচ্ছে। আফিম থেকেই তো হেরোইন তৈরি হবে।

টনি পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। এটাই তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন যে কাজে হাত দেন, গোড়া থেকে সবকিছু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন।

তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে এই সুন্দর সাদা ফুল থেকে হেরোইন তৈরি হয়।

সাদা কোট পরা এক বিজ্ঞানী ভদ্রলোক সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন মিঃ রিজোলি, ধাপে ধাপে অনেকগুলো পদ্ধতি পার হতে হয়। আফিম থেকেই তো হেরোইন পাওয়া যায়। তার মধ্যে মরফিন আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিতে হয়। পপি গাছের যে প্রজাতি থেকে হেরোইন আসে, তার নাম হল পাপাভার সনিফেরাম। এই গাছের ফুল খেলে ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা এসে আমাদের গ্রাস করে। ওপিয়ম নামটা আমরা গ্রিক ভাষা থেকে পেয়েছি। আসল শব্দটা হল ওপাস, যার অর্থ জুস।

অনেক কিছু বোঝা হয়ে গেছে টনির। এবার ফেরার পালা।

.

সময় কেটে গেছে। ফসল উঠবে। টনিকে আমন্ত্রণ জানানো হল কারেলার প্রধান এস্টেটটি পরিদর্শনের জন্য। কারেলা পরিবারের সকলেই এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাদের হাতে থাকে বিশেষভাবে তৈরি করা ছুরি। যা দিয়ে তারা গাছ থেকে ফুল তুলে নেয়। কারেলা অমায়িক ভদ্রলোক, উনি বললেনএই পপিগুলোকে পঁচিশ ঘণ্টার মধ্যে তুলে ফেলতে হবে, তা নাহলে সবগুলো পচে যাবে।

দেখা গেল ওই পরিবারের নজন সদস্য উৎসাহের সঙ্গে গাছ কাটার কাজে হাত লাগিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে। বাতাস একটা মনমাতানো গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে। ঝিম ঝিম আচ্ছন্নতা জেগেছে শরীরের মধ্যে।

রিজোলিকে বলতে শোনা গেল–আরও আরও সাবধানে...কারেলা উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমাদের আরও সাবধান হতেই হবে। যদি একবার আপনি এই ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে পড়েন, তা হলে আর কখনও উঠতে পারবেন না। আপনার স্নায়ুপুঞ্জ ঝিমঝিম করবে। চেতনা আর ফিরে আসবে না।

ফার্মহাউসের জানালা-দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফসল কাটার মরশুমে এখানে বুঝি মৃত্যুর হাহাকার।

.

পপিগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। রিজোলি পুরো পদ্ধতিটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন। তিনি দেখলেন মরফিনের সাথে পপিগুলো মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষভাবে তৈরি করা এক বীক্ষণাগারে এই বিশ্লেষণের কাজগুলো চলেছে। ল্যাবরেটরিটি পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধগম্য হল তাঁর কাছে।

–আমরা কি প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি? শিশুর মতো কৌতূহল এনে তিনি জানতে চেয়েছিলেন।

কারেলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না বন্ধু, এত সহজ নয়। বলতে পারেন বিরাট একটা অভিযানের সূচনা হল মাত্র। হেরোইন তৈরি করাটা খুবই সহজ, কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সেটিকে পাচার করাটাই হল সবথেকে শক্ত।

টনি রিজোলির মনের মধ্যে উত্তেজনার আগুন। তাহলে? এখনই তাকে আরও কুশলী হয়ে উঠতে হবে। ব্যবসাটা শুরু হয়েছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে এই কঠিন কাজটি সমাধা করা হয়?

অনেকগুলো পন্থা আছে, ট্রাক, বাস, ট্রেন, গাড়ি, খচ্চরের পিঠ এবং উট।

–উট?

-হ্যাঁ। আমরা উটের থলির ভেতর হেরোইন রেখে দিই, আইনরক্ষকেরা মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে সবকিছু পরীক্ষা করে। তারপর? রাবার ব্যাগের ভেতর সেগুলিকে চালান করে দেওয়া হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা উটগুলোকে মেরে ফেলি। সমস্যা কী জানেন, মাঝে মধ্যে উটের পেটের ভেতর ব্যাগগুলো বিস্ফোরিত হয়ে যায়। আর এই হেরোইনের প্রভাবে উটগুলো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কেমন যেন এলোমেলো আচরণ করতে শুরু করে। আইনরক্ষকের চোখে তখন আমরা ধরা পড়ে যাই।

–কোন্ পথ দিয়ে এই ড্রাগ পাচার করা হয়।

কখনও কখনও হেরোইন পাচার করা হয় আলেপ্পো থেকে বেইরুট হয়ে ইস্তানবুল পর্যন্ত। তারপর সারসেই, আবার ইস্তানবুল থেকে সরাসরি গ্রিসে নিয়ে আসা হয়। সিসিলি হয়ে করসিকা আর মরোক্কোকে টাটা গুডবাই করে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে।

–আপনার বিচার বোধকে আমি শ্রদ্ধা করছি। রিজোলি বললেন, আমি আমার ছেলেদের বলব, দেখা যাক কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

–ঠিক আছে।

–পরবর্তী সময়ে আমি কি এই অভিযানের সঙ্গী হব?

না, ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক।

–আমি তো বিপদ নিয়ে খেলতেই ভালোবাসি।

.

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা। টনি রিজোলির সাথে এক ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। বোঝা যাচ্ছে, সেই ভদ্রলোক যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সেই সাম্রাজ্যের সবকিছু অন্ধকারে ঢাকা। বিশাল দশাসই চেহারা তার, পাঁকানো গোঁফ আছে।

ইনি হলেন মুস্তাফা। ইনি আফইওন থেকে এসেছেন। তুরস্ক ভাষায় আফইওন শব্দের অর্থ কী জানেন তো? আফইওনের অর্থ হল আফিম। মুস্তাফা হলেন আমাদের অন্যতম দক্ষ স্মাগলার।

মুস্তাফা শান্তভাবে বলেছিলেন- হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা শিখতে হয়। অনেকগুলো পন্থা : আছে, যেগুলো সত্যি বিপজ্জনক। সামান্য ভুল হলে মৃত্যু এসে আপনাকে গ্রাস করবে।

টনি রিজোলি বিকৃত স্বরে বলে ওঠেন–প্রতি পদক্ষেপে এত বিপদ?

মুস্তাফা বললেন–আপনি টাকার কথা বলছেন তো? আফিমকে আমরা টাকার গাছ বলতে পারি। আফিমের ব্যাপারে একটা রহস্য আছে। এই রহস্যটা বুঝতে হবে। ভগবান এই বিশেষ পদ্ধতি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অল্প খেলে আমাদের শরীর তরতাজা হয়ে ওঠে। একে আমরা খেতে পারি, সরাসরি ত্বকের ওপর প্রয়োগ করতে পারি। সাধারণ অনেক রোগ এই ওষুধে সেরে যায়। যদি পেট খারাপ হয় তাহলেও এটা উপকারী। ঠান্ডা লেগেছে, জ্বর জ্বর ভাব, মাথার যন্ত্রণা–সবকিছুতেই। তবে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। যদি বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেন, তাহলে আপনার চেতনার অবলুপ্তি ঘটে যাবে। আপনার যৌনক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। আর তুরস্ক দেশের একটা কহবত আছে কী জানেন তো? যে পুরুষরা যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তাকে নরকের কীট মনে করা হয়।

–ঠিক আছে, আপনার কথা মনে রাখব।

.

আফইওন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে মধ্যরাতে। একদল কৃষক, রাতের অন্ধকারে হেঁটে চলেছে। মুস্তাফার সঙ্গী হয়েছে তারা। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আফিমের বাক্সগুলো। বাক্সগুলোর ৩৫০ কিলো থেকে ৭০০ পাউন্ডের কিছু বেশি। শক্ত সুঠাম কিছু খচ্চর সেগুলোকে বহন করে নিয়ে চলেছে। বাতাসের ভেতর একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি বোধহয় মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযানে সকলে সঙ্গী হয়েছে। বারোজন কৃষক এগিয়ে চলেছে। তারা এখন রক্ষীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ। সকলের আগে এগিয়ে চলেছেন মুস্তাফা। প্রত্যেক কৃষকের হাতে একটি করে রাইফেল।

এখন আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হচ্ছে। যেতে যেতে মুস্তাফা রিজোলিকে বলেছিলেন। ইন্টারপোল এবং আরও অনেকগুলি-সংস্থা আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে। আগে ব্যাপারটা খুবই সহজ ছিল। আমরা কোনো একস্টা গ্রাম বা শহর থেকে আফিম চালান করতাম। কিন্তু এখন এটা তত সহজ নেই। এখন কোথায় ধরা পড়ে যাব কে জানে!

আফইওন শহরটির অবস্থান তুরস্কের পশ্চিম দিকে। সুলতান মাউন্টেনের পাদদেশে, একটি উচ্চ মালভূমির ওপর। জায়গাটায় খুব একটা সহজে পৌঁছোনো যায় না। বড়ো বড়ো শহর থেকে অনেক দূরে তার অবস্থিতি। এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই বোধহয় এই শহরটিকে চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে।

-এই জায়গাটা আমাদের কাজের পক্ষে খুবই ভালো, আমরা কোথায় আছি তা সহজে বের করা যায় না।

হাসতে হাসতে মুস্তাফা মন্তব্য করেছিলেন।

খচ্চরগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ি উপত্যকার পথ ধরে। তিনদিন কেটে গেছে। পুরো বাহিনী তুরস্ক-সিরীয় সীমান্তে পৌঁছে গেছে। সেখানে কালো পোশাক পরা এক মহিলার সাথে দেখা হল। তিনি একটা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোড়াগুলোর পিঠে ময়দার ঝুড়ি রয়েছে। তাছাড়াও খুব সাবধানে কী যেন বাঁধা আছে। এমনভাবে বাঁধা যাতে কেউ বুঝতে পারবে না। লম্বা দড়ি আছে, দুশো ফুট লম্বা। দড়ির একটা দিক কায়দা করে মুস্তাফার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। পনেরোজন ভাড়া করা দৌড়বীর ছুটে এসেছে, তারা পাশাপাশি দৌড়চ্ছে। প্রত্যেকে মাঝে মাঝে মাটির দিকে ঝুঁকছে, এক হাতে দড়িতে টান দিচ্ছে। অন্য হাতে বস্তাভর্তি আফিম নামিয়ে নিচ্ছে। প্রত্যেকটি বস্তায় পঁয়ত্রিশ পাউন্ড করে আফিম আছে। ওই ভদ্রমহিলা এবং তার ঘোড়া ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পথটা খুবই নির্জন। রাখালছেলেরা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। মেষ চরছে। শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি। প্রতিমুহূর্তে হাত বদল হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার মাদক দ্রব্য। কেউ জানতেও পারছে না। চোখে চোখে কথা হচ্ছে। মহিলাকে দেখেই বুঝতে পারা যায়, এ ব্যাপারে তিনি খুবই দক্ষ। মহিলা কোনো কথা বলছেন না, আপাত ভাবলেশহীন মুখ। কিন্তু চোখের মণি সর্বদা ঘুরছে। সকলকেই সন্দেহ করছেন উনি।

এইভাবে পুরো বাহিনী গ্রিস পেরিয়ে গেল। এটাই হল সীমান্ত শহর, পুলিশের কঠিন প্রহরা। নানা ধরনের পেট্রোলের বন্দোবস্ত করা আছে। স্মাগলাররা এবার এমন একটা জায়গায় ঢুকে পড়বে, যেখানে আইনের অনুশাসন নেই, শেষ অবধি তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সেখানে একদল সিরিয়ান স্মাগলার তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা

আফিমের থলেগুলো মাটিতে রেখে দেবে। ইঙ্গিত করবে। সেখানেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। রিজোলি সাবধানে সবকিছু নিরীক্ষণ করতে থাকেন। তিনি দেখলেন কীভাবে আফিমের থলেগুলো ওজন করা হচ্ছে। সেগুলো ভালো করে বেঁধে রাখা হল। বারোটি সিরীয় দেশের গাধা সেখানে হাজির হয়েছে। কাজ শেষ হয়ে গেল। রিজোলি ভাবলেন, এবার এই মালটা কী করে থাইল্যান্ডে যায় সেটাও দেখা দরকার।

.

রিজোলি ব্যাংককে পৌঁছে গেছেন। তিনি একটি থাই ফিশিং জাহাজ ভাড়া করেছেন। সেখানে পলিথিন শিটে মুড়ে রাখা হয়েছে ওই প্যাকেটগুলো। ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাঁকা কেরোসিন ড্রামের ভেতর। ফিশিং বোট এগিয়ে চলেছে হংকং-এর দিকে। মাঝে একটা সরু খালের মতো জায়গা আছে, লিমা আর ল্যাড্রোন দ্বীপের মধ্যে। হংকং-এর ফিশিং বোট সেখানে অপেক্ষা করবে। হুকের সাহায্যে এই বস্তাগুলো তুলে নেবে।

রিজোলি ভাবতে থাকেন পদ্ধতিটা খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু মান্ধাতার আমলের এই পদ্ধতিটাকে পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে বেশি টাকা আয় করা সম্ভব নয়।

এখানে অনেকগুলো কোড সংকেত ব্যবহার করা হয়। হেরোইনকে এইচ অথবা হর্স নামে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু টনি রিজোলির চোখে হেরোইন সোনা ছাড়া আর কিছু নয়। দশ কিলো কঁচা ওপিয়ম তৈরি করার জন্য চাষিরা পায় তিনশো পঞ্চাশ ডলার। কিন্তু যখন সেই ওপিয়ম থেকে হেরোইন তৈরি হয়ে নিউইয়র্কের পথেঘাটে বিক্রি হয় তখন তার দাম হয় দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার!

রিজোলি আবার ভাবলেন, কারেলা ঠিক কথাই বলেছিলেন। এত সহজে ব্যাপারটার ভেতর প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হবে। দশ বছর আগের পৃথিবী। তখন ব্যাপারটা খবুই সহজ ছিল। এখন ইন্টারপোল চারদিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। ড্রাগ স্মাগলিং এর জন্য কঠিন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বন্দরে পুলিশ বাহিনী সজাগ রয়েছে। কী মাল ওঠানো নামানো হচ্ছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তাই রিজোলি স্পাইরস লামব্রোর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের অসীম ক্ষমতা। তার জাহাজ কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হল না। বেজন্মার বাচ্চাটা আমার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিল। দেখা যাক, অন্য কোনো পন্থায় আসা যায় কিনা। টনি রিজোলি ভাবতে থাকেন। যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

.

ক্যাথেরিন, আমি কি তোমায় বিরক্তি করছি?

তখন মধ্যরাত। পরিশ্রান্ত ক্যাথেরিন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

না কোস্টা, আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে আমার ভালোই লাগে।

সব কিছু ঠিকঠাক চলছে তো?

–হ্যাঁ আপনাকে আবার ধন্যবাদ। কাজটা আমার ভালোই লাগছে।

আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লন্ডনে আসব। তোমাকে দেখার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। আমি চাইছি কোম্পানির নিজস্ব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে।

–ঠিক আছে।

শুভ রাত।

–ঠিক আছে, শুভ রাত।

.

ক্যাথেরিন বলতে চেয়েছিল–কোস্টা, আমি জানি না আমায় কী বলতে হবে। লকেটটা সত্যিই সুন্দর! এমন সুন্দর একটি লকেট... ।

–এটা একটা ভালোবাসার ছোট্ট স্মারক চিহ্ন ক্যাথেরিন। ইভলিন আমাকে বলেছে তুমি তাকে কত সাহায্য করছ। সেই সাহায্যের প্রতিদান ভাবতে পারো।

.

ব্যাপারটা খুবই সহজ, ডেমিরিস ভেবেছিলেন, ছোটো ছোটো উপহার আর সামান্য কিছু তোষামুদে কথাবার্তা।

পরবর্তীকালে আমি এবং আমার বউয়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি খুব একা এই পর্ব।

এই ভাবেই বিয়ে সংক্রান্ত একটা বাজে কথাবার্তা হতে পারে। কোনো একসময় হয়তো ডেমিরিস ক্যাথেরিনকে আহ্বান জানাবেন তার প্রমোদ তরণীতে আসার জন্য। এইভাবেই তিনি একটির পর একটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন। প্রত্যেকটা খেলা তার কাছে নতুন উন্মাদনা নিয়ে আসে। ডেমিরিস ভাবতে থাকেন, কারণ প্রতিটি খেলার শেষটা একেবারে অন্যরকম। এবার কী হবে? এবার এই খেলাতে মেয়েটিকে মরতে হবে। হ্যাঁ, এর কোনো নড়চড় হবে না।

.

নেপোলিয়ান ছোটাসকে টেলিফোন করা হল। আইন বিশারদ ব্যাপারটা শুনে খুবই চিন্তা করতে থাকলেন।

–কোস্টা, সবকিছু ঠিকমতো চলছে তো?

–হ্যাঁ, আমি আপনার একটা সাহায্য চাইছি।

কী সাহায্য?

রাফিনাতে নোয়েলে পেজের একটি ছোট্ট ভিলা আছে। আপনি সেই ভিলাটা আমার জন্য কিনে নিন। অন্য কারোর নামে।

–দেখি, আমি আমার অফিসের লইয়ারদের সঙ্গে কথা বলব।

না, আমি চাই এই ব্যাপারটা কেউ জানবে না। এটা আপনি নিজে করার চেষ্টা করুন।

এক মুহূর্তের নীবরতা।

-ঠিক আছে আমি দেখছি।

-ধন্যবাদ।

ফোন রেখে নেপোলিয়ান ছোটাস সেখানেই বসে থাকলেন। একদৃষ্টে টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এই ছোট্ট ভিলাটি হল নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের সুখের নীড়। একসময় এখানে তারা ভালোবাসার স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল। ডেমিরিস, এটা কিনতে চাইছেন কেন?

.

০৭.

এথেন্সের ডাউনডাউন। আরসাকিওন কোর্টহাউস। ধূসর পাথরের একটা মস্তবড়ড়া বাড়ি। ইউনিভারসিটি স্ট্রিট এবং স্ট্র্যাডারে তার অবস্থান। এই বাড়িটির মধ্যে ত্রিশটি বড়ো বড়ো কোর্টরুম আছে। একুশ, ত্রিশ এবং তেত্রিশ নম্বর ঘরকে শুধুমাত্র ফৌজদারি মামলার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের ব্যাপারটা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চলছে তেত্রিশ নম্বর কক্ষে। এই কোর্টরুমটা চল্লিশ ফুট চওড়া, তিনশো ফুট লম্বা। তিনটে ব্লকে সিটগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্লকের মধ্যে ছফুটের দূরত্ব। প্রত্যেকটি রোতে নটি করে কাঠের বেঞ্চও সাজানো আছে। কোর্টরুমের সামনে আছে একটা উঁচু ডায়াস। ছ-ফুট উঁচু মেহগনির পার্টিশান দেওয়া। উঁচু রুমের সামনে আছে জাজ সেখানে বঙচু করা প্ল্যাটফর্ম যেন জুরি সেখানে

ডায়াসের সামনে সাক্ষ্য দেবার জায়গা। একটি উঁচু করা প্ল্যাটফর্ম। যেটা রিজিং লেকটার্ন এর সঙ্গে একেবারে সংযুক্ত। তার পাশে জুরিদের বসার জায়গা। দশজন জুরি সেখানে বসতে পারেন। সামনের দিকে আইনজ্ঞদের চেয়ার।

হত্যাকাণ্ডের বিচার জমে উঠেছে নানা দিক থেকে। দুপক্ষেই ধারা-উপধারার ব্যাখা । চলেছে। নেপোলিয়ান ছোটাস একপক্ষের উকিল। তাকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা লইয়ার বলা হয়। তিনি শুধুমাত্র খুন সংক্রান্ত মামলা তদারক করেন। এ ব্যাপারে তার সাফল্য ঈর্ষণীয়। তার ফিস মেটানো খুব একটা সহজ নয়। বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়, তিনি নাকি লক্ষ লক্ষ ডলারে নিজের পারিশ্রমিক নেন।

ছোটাস এক রোগাপাতলা চেহারার মানুষ। তার চোখের মধ্যে বিষণ্ণতার ধূসর ছায়া কাঁপে। মুখের ভেতর ক্ষুধার্ত নেকড়ের জিঘাংসা। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে বিন্দুমাত্র নজর নেই। চেহারা দেখলে মনে হবে না তিনি একজন উঁদে উকিল। কিন্তু এই আপাত তুচ্ছ আবরণের অন্তরালে আছে তার সদা অনুসন্ধিৎসু মন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সব সময় তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। তিনি কীভাবে সেই মেয়েটিকে সাহায্য করবেন, তা সকলে জানতে চাইছে। মনে হচ্ছে বোধহয় তিনি এই কেসটি জিততে পারবেন না। এখনই তাকে প্রথম পরাজয়ের তেতো স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

পিটার ডেমোনিডাস, প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি। এর আগে ছোটাসের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ছোটাসের আইন ক্ষমতা সম্পর্কে ভালো মতো অবহিত আছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাকে পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে এইবার ডেমোনিসের মনে হচ্ছে, চিন্তা করার বিশেষ কিছু নেই। যদি এটা সাধারণ মার্ডার কেস হত, তাহলে হয়তো চিন্তা করতেন। কিন্তু অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম।

সংক্ষেপে বিষয়টা বলা যাক। অ্যানাসটাসিয়া সাভালাস ছিলেন এক অত্যন্ত রূপবতী তরুণী। তার সঙ্গে জর্জ সাভালাস নামে এক বিত্তবানের বিয়ে হয়েছিল। ভদ্রলোক বয়সে অ্যানাসটাসিয়ার থেকে ত্রিশ বছরের বড়ো। অ্যানাসটাসিয়ার সঙ্গে তাদের তরুণ ড্রাইভার জোসেফ পাপ্পাসের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাক্ষীরা বলেছে, স্বামী জর্জ অ্যানাসটাসিয়াকে ডিভোর্স করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে জর্জ তাঁকে ভয় দেখাতে থাকেন। এমনকি ইচ্ছাপত্র থেকে স্ত্রীর নাম বাদ দেবার ধমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। যে রাতে এ জঘন্য হত্যার ঘটনাটি ঘটে, সেই রাতে তরুণী তার চাকরদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে স্বামীর জন্য রাতের খাবার তৈরি করেছিলেন। জর্জ সাভালাসের সামান্য সর্দি হয়েছিল। নৈশভোজের সময় তিনি কাশছিলেন। অ্যানাসটাসিয়া

তার হাতে কাশির ওষুধ তুলে দিয়েছিলেন, সেই ওষুধ খাবার পরেই সালাভাসের মৃত্যু হয়।

তার মানে? পরিষ্কার হত্যা। এর মধ্যে কোনো কিন্তুর অবকাশ নেই।

.

তেত্রিশ নম্বর ঘরে সকাল থেকে উৎসাহী মানুষের ভিড় জমেছে। অ্যানাসটাসিয়া সাভালাস বসে আছেন নির্দিষ্ট আসনে। সাধারণ কালো স্কার্ট পরেছেন তিনি, একই রঙের ব্লাউজ। তার গায়ে কোনো অলংকার নেই। সামান্য মেকআপ করেছেন, তবে তার মধ্যে একটা সহজ লাবণ্য আছে, এই বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেও সেই লাবণ্যের দ্যুতিই চোখে পড়ছে।

প্রসিকিউটর পিটার ডেমোনিডাস জুরিদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন–ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহাশয়া, কোনো কোনো সময় একেকটি হত্যাকাণ্ডের বিচার তিনচার মাস ধরে চলতে থাকে। তবে এখানে সেই ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ব্যাপারটা খুবই সহজ এবং সাধারণ। যখন আপনারা এই হত্যা মামলার ঘটনা পরম্পরা শুনবেন, আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এখানে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যেতে পারে, তা হল, জঘন্য হত্যাকাণ্ড। আইনের পরিভাষায় যাকে আমরা থার্ড ডিগ্রি মার্ডার বলে থাকি। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। ওই ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে ইচ্ছে করে খুন করেছেন। কেন? তার স্বামী বারবার বিবাহবিচ্ছেদের ভয় দেখাতেন, তার স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ড্রাইভারের সাথে ওই ভদ্রমহিলার গোপন শারীরিক সম্পর্ক আছে।

আমরা প্রমান করে দেব অভিযুক্তের কি মোটিভ ছিল, কীভাবে অভিযুক্ত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। কীভাবে তিনি ঠান্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। আমার আর কিছু বলার নেই। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই পর্যন্ত বলে তিনি তার নির্দিষ্ট আসনে ফিরে গেলেন।

এবার প্রধান বিচারপতি ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন? আপনি আপনার সওয়াল-জবাব শুরু করতে পারেন।

নেপোলিয়ান ছোটাস ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন–হ্যাঁ, মাননীয় মহাশয়... তিনি জুরিদের আসনের কাছে চলে গেলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। জুরিদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শূন্য চোখে। কথা বললেন, মনে হল তিনি যেন ফিসফিস করে নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেকটা স্বগত সম্ভাষণের মতো।

...আমি অনেকদিন ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আমি জানি যে, কোনো মহিলা অথবা পুরুষ তাদের খল স্বভাবকে ঢেকে রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এক কবি বলেছেন যে, আমাদের চোখ হবে আত্মার জানালা। আমি সেই মতবাদে বিশ্বাস করি। মাননীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা, আপনারা অনুগ্রহ করে অভিযুক্তের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। তাকে দেখে কি মনে হচ্ছে তিনি কাউকে হত্যা করতে পারেন?

এই পর্যন্ত বলে নেপোলিয়ান ছোটাস একটু চুপ করলেন। আসলে তিনি তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে চাইলেন। সকলেই কি ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি তার আসনে ফিরে গেলেন।

পিটার ডেমোনিডাস এই কথা শুনে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। হায় যিশু, আমি আমার জীবনে এমন কথা কখনও শুনিনি। এইভাবে কেউ কি কোনো আইনি সওয়াল জবাব শুরু করতে পারে? মনে হচ্ছে বুড়ো বয়সে লোকটার ভীমরতি ধরেছে। অথবা এই মামলায় পরাজয় নিশ্চিত জেনে উনি এমন বিভ্রান্ত আচরণ করছেন।

–অ্যাটর্নি কি তার প্রথম সাক্ষীকে ডেকে আনবেন?

হ্যাঁ, ইওর অনার, আমি রোসা লাইকোরগসকে ডাকছি।

মধ্যবয়সী এক পৃথুলা মহিলা এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি দর্শক আসনে বসেছিলেন। তিনি এবার কোর্টরুমের সামনে এলেন। শপথ নিলেন।

শ্রীমতী লাইকোরগসকে, আপনার পেশা কী?

–আমি হাউসকিপার,... কথা যেন বন্ধ হয়ে আসছে... আমি সাভালাসের হাউসকিপার ছিলাম।

মিঃ জর্জ সাভালাস?

ইয়েস স্যার।

–আপনি কি বলবেন কতদিন ধরে সেখানে আপনি চাকরি করছেন?

পঁচিশ বছর ধরে।

তার মানে অনেকদিন ধরে। মিঃ সাভালাস কি আপনাকে পছন্দ করতেন?

–হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সাধুর মতো ব্যক্তি।

–তার প্রথম বিয়ের সময় কি তিনি আপনাকে রেখেছিলেন?

–হ্যাঁ, তার প্রথমা স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন আমিও কবরস্থানে গিয়েছিলাম।

–প্রথমা স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল?

–তারা সুখী সম্পৃক্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন, একে অন্যকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন।

পিটার ডেমোনিডাস নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। এই ব্যাপারে ছোটাস? কি কিছু বলতে চাইবেন। হয়তো কোনো প্রতিবাদ।

ছোটাস তার আসনে বসেছিলেন, মনে হয় তিনি যেন কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন। অথবা চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন।

পিটার ডেমোনিডাস বলতে থাকেন মিঃ সাভালাসের দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে আপনি কী জানেন? তার দ্বিতীয় স্ত্রী তো অ্যানাসটাসিয়া সাভালাস? তাই নয় কী?

–হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিক বলেছেন।

–এটাও কি একটা সুখী বিবাহিত জীবনের চিহ্ন?

পিটার আবার নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেদিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না কেন? বুড়ো ভামটা মনে মনে কোনো শয়তানি ষড়যন্ত্র আঁটছে নাকি।

সুখ? না স্যার, সবসময় তারা বেড়াল-কুকুরের মতো ঝগড়া করতেন।

–আপনি কি এমন কোনো ঝগড়ার সাক্ষী ছিলেন?

–হ্যাঁ, আমি কতবার বলব, বাড়ির সব জায়গা থেকে তাদের চিৎকার শোনা যেত। মস্তবড়ো বাড়ি। তাসত্ত্বেও আমরা নানা শব্দ শুনতে পেতাম।

–শুধু মুখে কথা হত নাকি একে অন্যকে শারীরিভাবে আঘাত করতেন। মিঃ সাভালাস কি তার স্ত্রীকে কখনও মেরেছিলেন?

না, তারা কেবল পারস্পরিক দোষারোপ করতেন। মাঝেমধ্যে ম্যাডাম আমার প্রভুকে মারতেন। মিঃ সাভালাস একবছরের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সবসময় অজানা ভয়ে কম্পিত থাকতেন।

–আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন, শ্রীমতী সাভালাস তার স্বামীকে শারীরিকভাবে আঘাত করছেন?

–অনেকবার দেখেছি আমি।

সাক্ষী এবার অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের দিকে তাকালেন। তার কণ্ঠস্বরে আত্মতুষ্টি ফিরে এসেছে।

শ্রীমতী লাইকোরগস, যে রাতে মিঃ সাভালাসের মৃত্যু হয়, সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? বলুন তো, সেই রাতে ওই বাড়িতে কে কে ছিলেন?

আমাদের কেউ সেখানে ছিল না।

পিটার ডেমোনিডাসের কণ্ঠস্বরের ভেতর কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

–অত বড় বাড়িতে কেউ ছিল না? মিঃ সাভালাস কোনো রাঁধুনিকে রাখেননি? অথবা কোনো পরিচারিকা? নিদেনপক্ষে একজন বাটলার

-হ্যাঁ স্যার, আমরা সকলেই কাজ করতাম। কিন্তু সেই রাতে ম্যাডাম সকলকে ছুটি, দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন নিজের হাতে নৈশভোজ রান্না করবেন। এটা ছিল তাদের দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা।

মনে হল, শেষ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মেশানো আছে।

তার মানে শ্রীমতী সাভালাস সকলের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন তাই তো?

চিফ জাস্টিস নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। তিনি ভেবেছিলেন, ছোটাস উঠে এসে প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু অ্যাটর্নি সেখানেই বসে রইলেন, মনে হল তিনি যেন হতবাক হয়ে গেছেন।

প্রধান বিচারপতি ডেমোনিডাসের দিকে তাকিয়ে বললেন–এইভাবে কথা বলা উচিত নয়।

–আমি ক্ষমা চাইছি ইওর অনার, আমি নতুন করে আবার প্রশ্নটা করতে চাইছি।

ডেমোনিডাস মিসেস লাইকোরগসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন–সেই রাতে আপনাদের সকলকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমতী সাভালাস বলেছিলেন সকলে যেন ওই বাড়ি থেকে চলে যান। তিনি তার স্বামীর সাথে একান্তে কিছুটা সময় কাটাবেন তাই তো?

হ্যাঁ স্যার, আমার প্রভু জ্বরে ভুগছিলেন। ভীষণ ঠান্ডা লেগেছিল তার।

শ্রীমতী সাভালাস কি মাঝে মধ্যে স্বামীর জন্য ডিনার রান্না করেন?

এই কথা শুনে শ্রীমতী লাইকোরগস হেসে উঠলেন–না না স্যার, কোনোদিন নয়। তিনি কখনও কোনো কাজ করেননি এই বাড়িতে।

নেপোলিয়ান ছোটাস তখনও তার চেয়ারে বসে আছেন। মনে হচ্ছে এই মামলার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি নেহাতই এক দর্শক হয়ে এসেছেন।

–আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রীমতী লাইকোরগস, আপনারা বক্তব্য আমাদের কাজে লাগবে।

পিটার ডেমোনিডাস ছোটাসের দিকে তাকালেন। তিনি তখন জোর করে নিজের সন্তুষ্টি ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন। শ্রীমতী লাইকোরগসের কথা জুরিদের প্রভাবিত করবে বলেই তার বিশ্বাস। কিন্তু এই বুড়ো লোকটা এবার কী বলবে?

জর্জ সাহেব প্রশ্ন করলেন–আপনার সাক্ষী?

নোপোলিয়ান ছোটাস নিস্তেজভাবে তাকালেন। বললেন–না, আমি কোনো প্রশ্ন করতে চাইছি না।

প্রধান বিচারপতি, অবাক হয়ে গেছেন। তিনি জানতে চাইলেন মিঃ ছোটাস, আপনি এই সাক্ষীর সাথে কথা বলবেন না? আপনি কি ক্রস এগজামিন করতে চাইছেন না?

নেপোলিয়ান ছোটাস তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন–না ইওর অনার, ভদ্রমহিলার কথায় কোনো ভুল আছে বলে আমারে মনে হচ্ছে না। তাকে দেখে আমি বুঝতে পারছি তিনি অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মহিলা।

এই পর্যন্ত বলে ছোটাস আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

পিটার ডেমোনিডাস বিশ্বাস করতে পারছেন না তার ভাগ্য এখন কোন দিকে এগিয়ে চলেছে! হায় ঈশ্বর, লড়াই করতে হল না অথচ যুদ্ধতে আমরা জিতে গেলাম! বুড়ো

লোকটা একেবারে শেষ হয়ে গেছেন। ডেমোনিডাস ইতিমধ্যে তার বিজয়ের দৃশ্য উপভোগ করতে থাকলেন।

প্রধান বিচারপতি প্রসিকিউটর অ্যাটর্নির দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি আপনার পরবর্তী সাক্ষ্যকে ডেকে আনতে পারেন।

–আমরা জোসেফ পাপ্পাসকে এখানে ডাকছি।

লম্বা সুসভ্য ভদ্র চেহারার এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ তিনি দর্শকের আসনে বসেছিলেন। এবার তিনি উইটনেস বক্সের সামনে বসে দাঁড়ালেন। তাকে শপথ গ্রহণ করতে বলা হল।

পিটার ডেমোনিডাস বলতে শুরু করলেন–মিঃ পাপ্পাস, আপনি কী করেন তা জানাবেন। কী?

আমি একজন সোফেয়ার, মানে ড্রাইভার।

এই মুহূর্তে আপনি কোথায় চাকরি করছেন?

–কোথাও না।

–কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনি চাকরি করছিলেন, তাই তো? জর্জ সাভালাসের মৃত্যু পর্যন্ত আপনি তার সোফেয়ার ছিলেন। আমি কি মিথ্যে বলছি?

–না না, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–কতদিন ধরে আপনি সাভালাস পরিবারের সঙ্গে যুক্ত?

–এক বছরের কিছু কম-বেশি হবে।

–এটা কি খুব সুন্দর চাকরি?

জোসেফ পাপ্পাস ছোটাসের দিকে তাকালেন। ছোটাস এগিয়ে এসে তাকে বাঁচাবেন এমন একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেখানে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

–আমি আবার প্রশ্ন করছি মিঃ পাপ্পাস, কাজটা করতে কি আপনার ভালো লাগতো?

–ঠিক আছে, আমি পেশাদার ড্রাইভার, সবসময় এসব চিন্তা করি না।

–আপনি কি ভালো বেতন পেতেন?

–হ্যাঁ।

–তাহলে আপনি কেন বলছেন এই চাকরিটা খুব একটা ভালো লাগতে না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি কি বেশি কিছু টাকা পেতেন? যখন আপনি শ্রীমতী সাভালাসের সঙ্গে শয্যায় যেতেন। এর জন্য আপনাকে কি অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হত?

এই প্রশ্নটা সরাসরি। জোসেফ পাপ্পাস আবার ভাবলেন, নেপোলিয়ান ছোটাস তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সেখানে থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না।

–আমি...জোসেফ তোতলাতে থাকেন...স্যার, আপনি এসব কি বলছেন?

পিটার ডেমোনিডাস এবার আরও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন আমি কী বলছি? আপনি শপথ নিয়ে বলেছিলেন সত্যি কথা বলবেন। আপনি পরিষ্কার করে বলুন, শ্রীমতী সাভালাসের সাথে আপনার কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল কী ছিল না?

পাপ্পাস কেমন যেন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন আমাদের মধ্যে গোপন সম্পর্ক ছিল।

কী আশ্চর্য মিঃ পাপ্পাস, ব্যাপারটা ভাবতেই আমার কেমন লাগছে, আপনি ওই ভদ্রমহিলার স্বামীর কাছে কাজ করতেন। সেই ভদ্রলোক আপনার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি, আর আপনি কিনা এমন একটা বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ করলেন?

হ্যাঁ স্যার।

প্রত্যেক মাসে আপনি মিঃ সাভালাসের কাছ থেকে হাত পেতে বেতন নিতেন। আর তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন?

না, এটা শুধু একটা শারীরিক সম্পর্ক ছিল না।

পিটার ডোমেনিডাস এবার তার আসল কথার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তিনি জানতে চাইলেন তার মানে? এটা শুধু শরীরের সম্পর্ক ছিল না? এই কথা বলে আপনি কী প্রমাণ করতে চাইছেন? আমি আপনার কথার আসল অর্থ ঠিক মতো বুঝতে পারছি না।

আমি বলতে চাইছি...আমতা আমতা করেন পাপ্পাস, আমি আর অ্যানাসটাসিয়া বিয়ে করব বলে ঠিক করেছিলাম।

কোর্ট ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। জুরিরা অবাক চোখে অভিযুক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন।

–এটা কি আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে, নাকি মিসেস সাভালাসের বুদ্ধি?

–আমরা দুজনেই ভীষণভাবে এটা চাইছিলাম।

–কে প্রথম এই প্রস্তাবটা তুলেছিলেন?

–আমার মনে হয় ও-ই বলেছিল।

পাপ্পাস অ্যানাসটাসিয়া সাভালসের দিকে তাকালেন। অ্যানাসটাসিয়াও ফিরতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তার চাউনির মধ্যে শূন্যতা ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই।

মিঃ পাপ্পাস, সত্যি বলছি আপনার জবানবন্দি শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। আপনি কী করে ভাবলেন যে, এমন একটা ঘটনা সত্যি ঘটবে? মিসেস সাভালাস একজন বিবাহিতা মহিলা, তাই নয় কী? আপনি কি ভেবেছিলেন মিঃ সাভালাসের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা

করবেন? অথবা ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে দেবেন? সত্যি করে বলুন তো, আপনার মনের মধ্যে কোন্ ধারণার উদ্রেক হয়েছিল?

প্রশ্নগুলো পর পর ধেয়ে আসছে। তিনজন বিচারক নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। এমন আজেবাজে প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। তারা সকলেই ভেবেছিলেন, ছোটাস এখনই উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবেন। দেখা গেল, ওই ভদ্রলোক কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করছেন না। অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের দৃষ্টিতেও এক অসহায়তার ছাপ।

পিটার ডেমোনিডাস বুঝতে পারলেন, এবার তাকে আরও কঠিন হতে হবে।

তিনি বললেন মিঃ পাপ্পাস, আপনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।

জোসেফ পাপ্পাস অসহায়ের মতো বলতে থাকেন–আমি জানি না, ঠিক বলতে পারব না।

পিটার ডেমোনিডাসের কণ্ঠস্বরে এবার দারুণ কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে–তাহলে আমাকেই সত্যিটা বলতে দিন। মিসেস সালাভাস পরিকল্পনা করেছিলেন যে, তাঁর স্বামীকে তিনি নিজের হাতে খুন করবেন। তাহলেই পথ পরিষ্কার হবে। তিনি জানতেন যে, তাঁর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবেন। উইল থেকে তাকে সরিয়ে দেবেন। তাহলে তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে যাবেন।

তিনি...

–আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। না, নেপোলিয়ান ছোটাসের মুখ থেকে নয়, প্রধান বিচারপতি বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন- আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। আপনি এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে মনে হতে পারে যে, সাক্ষীকে আপনি প্রভাবিত করছেন।

তিনি নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। ওই আইনজীবী এখনও কেন নিশ্চুপ, ব্যাপারটা ভদ্রলোককে অবাক করল। দেখা গেল ওই প্রবীণ মানুষটি বেঞ্চের দিকে শূন্য। চোখে তাকিয়ে আছেন। তার চোখ দুটি আধবোজা।

পিটার ডেমোনিডাস বলে ওঠেন- ইয়োর অনার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

তারপর তিনি ছোটাসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন- আপনার কিছু বলার আছে?

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেনধন্যবাদ ডেমোনিডাস। না, আমার কিছু প্রশ্ন করার নেই।

তিনজন বিচারক পরস্পরের দিকে তাকালেন। ছোটাসের এই আচরণ তাদের একেবারে অবাক করে দিয়েছে। একজন বললেন–ছোটাস, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এইভাবে সুযোগ নষ্ট করলে এই মামলাতে আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আপনি কেন সাক্ষীকে প্রশ্ন করছেন না?

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন–ইয়োর আনার...।

–আমার মনে হয়, আপনি প্রশ্ন করতে চাইছেন না, তাই কি?

নেপোলিয়ান ছোটাস বাতাসের বুকে একটি হাত আন্দোলিত করে বললেন, আমার কোনো প্রশ্ন করার নেই ইয়োর অনার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিচারপতি মন্তব্য করলেন ঠিক আছে। আপনি পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারেন মিঃ ডেমোনিডাস।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন মিহালিস হারিটোনিডাস। বছর ষাট বয়স। পাকা চুল, ভারিক্কি চেহারা।

তিনি এসে শপথ নিলেন। প্রশ্ন করা হল–আদালতের সামনে আপনি কি আপনার পেশার কথা বলবেন?

–হ্যাঁ, আমি একটা হোটেল চালাই।

–হোটেলের নামটি কী?

–আরগোস।

–হোটেলটা কোথায় অবস্থিত?

করফুতে।

মিঃ হারিটোনিডাস, এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। দেখুন তো ভালো করে, এই কোর্টরুমে এমন কেউ কি আছেন, আপনার হোটেলে রাত কাটিয়েছেন যিনি?

হারিটোনিডাস চারদিকে তাকিয়ে বললেন–হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওই ভদ্রলোক আর এই ভদ্রমহিলা।

তার মানে আপনি জোসেফ পাপ্পাস এবং অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসকে চিহ্নিত করছেন, তাই তো?

আইনজীবী সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন–ওঁরা কি আপনার হোটেলে একাধিকবার সময় কাটিয়েছেন।

–হ্যাঁ, তারা অন্তত বার ছয়েক আমার হোটেলে গিয়েছেন।

–তারা সমস্ত রাত সেখানে ছিলেন, তাই তো একই ঘরে?

–হ্যাঁ, স্যার, সাধারণত তারা সপ্তাহের শেষের দিকে হোটেলে আসতেন।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হারিটোনিডাস।

এবার আইনজীবী নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন কি?

না, আমার প্রশ্ন করার কিছু নেই।

প্রধান বিচারপতি অন্য দুজন বিচারকের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পারস্পরিক আলোচনা সেরে নিলেন। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

এবার প্রধান বিচারপতি নেপোলিয়ান ছোটাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপনি এই সাক্ষীকেও ক্রশ এগজামিন করতে চাইছেন না, তাই তো মিঃ ছোটাস?

না, ইয়োরে অনার। তার সাক্ষ্য আমি বিশ্বাস করছি। হোটেলটা সত্যিই সুন্দর। সেখানে আমি কয়েকবার ছিলাম।

প্রধান বিচারপতি অবাক হয়ে নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন। তারপর তিনি সরকার পক্ষের আইনজীবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকার অনুমতি দেওয়া হল।

–আমি ডাঃ ভ্যাসিলস ফ্রানজেসকোসকে ডাকছি।

দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনি ধীরে ধীরে উইটনেস বক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। শপথ নিলেন।

–ডাক্তার, আপনি কি বলবেন যে, কোন্ ধরনের ডাক্তারি বিদ্যা আপনি প্র্যাকটিস করে থাকেন?

আমি একজন জেনারেল প্র্যাকটিসনার।

–তার মানে আপনি পারিবারিক ডাক্তার তো?

হ্যাঁ, তাই বলতে পারেন।

কতদিন ধরে আপনি ডাক্তারি পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন? তিরিশ বছর ধরে।

–আপনার কাছে নিশ্চয়ই সরকারি অনুমতি পত্র আছে?

–নিশ্চয়ই আছে।

–ডাক্তার, জর্জ সাভালাস কি আপনার একজন পেশেন্ট ছিলেন?

–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

কত বছর ধরে তার সঙ্গে আপনার পরিচয়? দশ বছরের কিছু বেশি।

–আপনি কি তার কোন বিশেষ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন?

–যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় তখন তাঁর হাই ব্লাডপ্রেশার ছিল।

–আপনি ব্লাডপ্রেশারের চিকিৎসা করতেন?

–তারপর কী হল?

–তিনি মাঝে মধ্যেই আমাকে ডাকতেন। তিনি ব্রঙ্কাইটিসে ভুগতেন। লিভারের যন্ত্রণা হত। তবে গুরুতর কিছু নয়।

–শেষবারের মতো কখন মিঃ সাভালাসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

গতবছর ডিসেম্বর মাসে।

–মৃত্যুর কিছুদিন আগে।

–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

উনি কি আপনার চেম্বারে এসেছিলেন?

–না, আমি ওঁনাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

আপনি কি সব ক্ষেত্রেই বাড়িতে গিয়ে রোগীর সঙ্গে দেখা করেন? সাধারণত যাই না।

এক্ষেত্রে গেলেন কেন?

–বিশেষ কারণে।

কী কারণ?

–ডাক্তারবাবু ইতস্তত করতে থাকেন। তারপর বললেন–এই অবস্থায় উনি আমার চেম্বারে আসতে পারছিলেন না।

-কেন? ওঁনার কী অবস্থা হয়েছিল?

–ওঁনার সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। হাত-পা ভেঙে গেছে, উনি থরথর করে কঁপছিলেন।

–এটা কি কোনো অ্যাকসিডেন্ট?

ডাক্তার ইতস্তত করে বলতে থাকেন না, উনি বলেছিলেন যে, ওঁনার স্ত্রী ওঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন।

কোর্টরুমে আবার নীরবতা ভেঙে গেল। ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রধান বিচারপতি রাগ করে বললেন–মিঃ ছোটাস, আপনি কোনো ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছেন না কেন? আপনি কি চাইছেন, বিচারটা একতরফা হোক?

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন–ওহ ধন্যবাদ! হ্যাঁ, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। জুরিরা চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তাবাবু। আমার আর কোনো প্রশ্ন করার নেই। পিটার ডেমোনিডাস ছোটাসের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন?

আমার প্রশ্ন করার কিছু নেই।

.

আরও অনেককে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল। একজন পরিচারিকা এসে শ্রীমতী সাভালাসকে সনাক্ত করল। একজন বাটলার বলল, সে জর্জের কাছ থেকে শুনেছে, জর্জ নাকি স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে চাইছে।

নেপোলিয়ান ছোটাস কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ জানালেন না।

এবার বোধহয় অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের পালা।

পিটার ডেমোনিডাসের মুখে বিজয়ের ছাপ পড়েছে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, কাগজের শিরোনামে তার ছবি বেরোবে। এত তাড়াতাড়ি বিচারপর্ব শেষ হবে, কেউ তা স্বপ্নেও ভাবেনি। হয়তো আজই বিচার শেষ হয়ে যাবে। তিনি ভাবলেন, আহা, মহান নেপোলিয়ান ছোটাসকে এখন পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হবে।

–আমি মিঃ নিকো মেনটাকিসকে এখানে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মেনটাকিস রোগা চেহারার মানুষ। বয়স বেশি নয়। কথা বলেন ধীরে ধীরে।

–মিঃ মেনটাকি, আপনি কী করেন জানাবেন কি?

আমি একটা নার্সারিতে কাজ করি।

ছোটোদের স্কুল?

না, স্যার। এটা সেই নার্সারি নয়, আমরা ফুলগাছের পরিচর‍্যা করে থাকি।

–ও হোঃ, বুঝতে পারছি, আপনি উদ্ভিদবিদ্যার ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

–হ্যাঁ, আমি একাজে অনেক দিন ধরে ব্যস্ত আছি।

আমার মনে হয় আপনি বোধহয় সুস্থ থাকার গাছগাছড়া বিক্রি করেন?

–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমরা নানা ধরনের গাছের পরিচযা করে থাকি।

তার মানে বাজারে আপনাদের বেশ সুনাম আছে।

–হ্যাঁ, স্যার। গর্বিত কণ্ঠস্বর, আমরা ভালো পরিষেবা দিয়ে থাকি।

–মিঃ মেনটাকিস বলুন তো, মিসেস সাভালাস কি আপনাদের একজন খদ্দের?

–হ্যাঁ, মিসেস সাভালাস গাছগাছড়া খুবই ভালোবাসতেন।

প্রধান বিচারপতি অধৈর্য হয়ে বললেন–মিঃ ডেমোনিডাস, এইভাবে আপনি কেন প্রশ্ন করছেন? যদি সত্যি কোনো প্রশ্ন না করার থাকে, তাহলে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

-আমাকে আর একটু বলার সুযোগ দিন ইয়োর অনার। আমার মনে হচ্ছে, এই মামলার ক্ষেত্রে এঁনার সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রধান বিচারপতি নেপোলিয়ান ছোটাসকে জিজ্ঞাসা করলেন- মিঃ ছোটাস, এই ধরনের প্রশ্নের বিরুদ্ধে আপনি কিছু বলবেন না?

ছোটাস বললেন–না, স্যার, আমার কিছু বলার নেই।

প্রধান বিচারপতির চোখেমুখে হতাশার ভাব সুস্পষ্ট। তিনি পিটার ডেমোনিডাসের দিকে তাকিয়ে বললেন–ঠিক আছে, আপনি চালিয়ে যান।

–আচ্ছা মিঃ মেনটাকিস, মিসেস সাভালাস ডিসেম্বরের কোনো একদিন কি আপনার নার্সারিতে এসেছিলেন? তিনি কি বলেছিলেন যে তাঁর গাছ নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে?

-, উনি ওই অভিযোগ করেছিলেন।

–তিনি কি বলেছিলেন যে, বিষাক্ত পতঙ্গরা তাঁর গাছপালা নষ্ট করে ফেলছে?

–হ্যাঁ, স্যার।

–তিনি ওই পতঙ্গের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কীটনাশক চাইতে এসেছিলেন কী?

–হ্যাঁ, স্যার।

–আপনি কি বলবেন, কী ধরনের কীটনাশক তাকে দেওয়া হয়েছিল?

আমি তাকে অ্যান্টিমনি বিক্রি করেছিলাম।

–এটার রাসায়নিক গুণাগুণ কী?

–এটা বিষাক্ত বস্তু। আর্সেনিকের মতো।

কোর্টঘরে আবার মৃদু ফিসফিসানি শব্দ শোনা গেল।

এবার প্রধান বিচারপতি টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন–কেউ কোনো রকম শব্দ করবেন না। আমি তাহলে বেলিফকে ডাকতে বাধ্য হব।

তিনি পিটার ডেমোনিডাসের দিকে তাকিয়ে বললেন–ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করে যান।

কতটা পরিমাণ অ্যান্টিমনি দেওয়া হয়েছিল?

–বেশ অনেকটা।

–এটা মারাত্মক বিষ তাই তো? আপনি একে আর্সেনিকের সঙ্গে তুলনা করছেন?

–হ্যাঁ, এটা মারাত্মক বিষ।

আপনি আপনার রেকর্ড বই দেখে বলতে পারবেন, কখন এই বিষটি বিক্রি করা হয়?

–হ্যাঁ, আমি বলতে পারব।

আপনি কি রেকর্ড বই সঙ্গে এনেছেন?

–হ্যাঁ, আমি এনেছি।

মেনটাকিস পিটার ডেমোনিডাসের হাতে একটি লেজার তুলে দিলেন। সরকার পক্ষের অ্যাটর্নি ধীরে ধীরে বিচারকদের কাছে উঠে গেলেন।

তারপর মাথা ঝুঁকে বললেন–ইয়োর অনার, আমি দ্রষ্টব্য এ-র দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর তিনি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে আর বাড়তি কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আর কোনো প্রশ্ন করার নেই আমার।

তিনি তাকালেন ছোটাসের দিকে। ছোটাস মাথা নেড়ে বললেন–আমিও কোনো প্রশ্ন করতে চাই না।

পিটার ডেমোনিডাস এবার সত্যি সত্যি খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন–আমি দ্বিতীয় দ্রষ্টব্যটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তিনি পেছন দিকে তাকালেন। একজন বেলিফ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বললেন, আপনি কি ওটাকে নিয়ে আসবেন?

বেলিফ তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদে ট্রে-তে বসানো কফ সিরাপ নিয়ে আসলেন। বেশ কিছুটা সিরাপ নেই বোঝা যাচ্ছে।দশর্কেরা তাকিয়ে আছে, বেলিফ এই

বোতলটি আইনজীবীর হাতে তুলে দিলেন। পিটার ডেমোনিডাস সেটি জুরিদের সামনে রাখলেন।

–ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা খুনের অস্ত্রটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই অস্ত্র দিয়েই জর্জ সাভালাসকে হত্যা করা হয়েছিল। এই হল সেই কফসিরাপ যা মিসেস সাভালাস তার স্বামীর ওপর প্রয়োগ করেছিলেন। এই সিরাপের মধ্যে অ্যান্টিমনি বিষ মেশানো ছিল। তাই কফসিরাপ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জর্জ বমি করতে শুরু করেন। কুড়ি মিনিট বাদে তার জীবনাবসান হয়ে যায়।

নেপোলিয়ান ছোটাস এই প্রথম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন আমি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমার মাননীয় আইনজীবী কিছুতেই বলতে পারবেন না যে, এই বোতল থেকেই কফসিরাপ জর্জের গলায় ঢালা হয়েছিল।

পিটার ডেমোনিডাস বললেন–আমার মাননীয় আইনজীবীর প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখে আমি বলছি, মিসেস সাভালাস স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার স্বামীকে কফসিরাপ দিয়েছিলেন। সেই রাতেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়। সিরাপটি পুলিশ তালাচাবি দিয়ে রেখেছিল। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই দ্রষ্টব্যটিকে কোর্টরুমে নিয়ে এসেছি। করোনার প্রমাণ করেছেন, জর্জ সাভালাসের মৃত্যু হয়েছে অ্যান্টিমনি বিষক্রিয়ার ফলে। কফসিরাপের মধ্যে অ্যান্টিমনির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তিনি উদ্ধত ভঙ্গিতে নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকালেন।

নেপোলিয়ান ছোটাস এবার তার পরাজয় স্বীকার করে নিলেন তাহলে মনে হচ্ছে আমারই ভুল হয়েছে।

পিটার ডেমোনিডাস বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন–না, মিঃ ছোটাস, ব্যাপারটা সত্যি, আপনাকে তাই তা স্বীকার করতেই হবে।

নেপোলিয়ান ছোটাস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–ইয়োর অনার...তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, প্রায় জুরি বক্সের কাছছাকাছি। দেখতে চেষ্টা করলেন, কে কে তার দিকে নজর দিচ্ছে। তিনি বোধহয় শব্দ হাতড়াচ্ছিলেন।

–আমি কেন কোনো সাক্ষীকে ক্রশ এগজামিন করিনি, কারণটা বুঝিয়ে বলা দরকার। আমার মনে হয়েছে আমার প্রিয় বন্ধু ডেমোনিডাস সেই শক্ত কাজটি আমার হয়ে করে দিয়েছেন। তাই অতিরিক্ত প্রশ্ন আমি আর করতে চাইনি।

পিটার ডেমোনিডাস হাসতে থাকলেন। বোকাটা বলছে কী! সে কি আমার হয়ে মামলা লড়বে নাকি!

নেপোলিয়ান ছোটাস কফসিরাপের বোতলের দিকে এক মুহূর্ত তাকালেন। তারপর জুরিদের দিকে তাকিয়ে বললেন–সমস্ত সাক্ষীকেই আমার অত্যন্ত সৎ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকে কিছু প্রমাণ করা কি সম্ভব হল?

তিনি মাথা নাড়লেন পুরো গল্পটা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এক সুন্দরী তরুণীর সাথে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছিল। ওই ভদ্রলোক তরুণীকে যৌনতার দিক থেকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

এবার তিনি জোসেফ পাপ্পাসের দিকে তাকালেন তাই ওই তরুণী এক যুবকের প্রেমে পড়ে যান। তার এই অভিসারের খবর আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তাদের প্রেমের ব্যাপারে কোনো কিছুই আর গোপন নেই। সারা পৃথিবীর লোকের কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছে। যে কোনো সংবাদপত্রে মুখরোচক ওই কাহিনী বেরিয়েছে। আমি আর আপনি হয়তো তার এই অসংযত আচরণকে নিন্দা করব, কিন্তু অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসকে তো অস্থিরতা আচরণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি। একজন তরুণীর যে যৌনাকাঙ্ক্ষা থাকে, তিনি সেটা পূরণ করার জন্য প্রেমিকের সাহচর্য প্রার্থনা করেছিলেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি। তাকে কোর্টে আসতে হয়েছে খুনের আসামি হিসেবে।

তিনি আবার বোতলের দিকে তাকালেন।

পিটার ডেমোনিডাস ভাবতে থাকেন, বুড়োটা আর কতক্ষণ বকবক করবে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা বাজলেই টিফিনের ছুটি ঘোষিত হবে। এর আগেই বোধহয় বুড়োটা তার বক্তব্য শেষ করবে। সে আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। আমি আর এখন ওকে ভয় পাব না।

নেপোলিয়ান ছোটাস বলতে থাকেন–আসুন, আমরা প্রত্যেকটা দ্রষ্টব্যকে পরীক্ষা করি। মিসেস সাভালাস অভিযোগ করেছিলেন তার কিছু কিছু গাছ মরে যাচ্ছে। তিনি সেই গাছগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি মিঃ মেনটাকিসের কাছেগিয়েছিলেন। মেনটাকিস তাকে অ্যান্টিমনি প্রয়োগ করতে বলেন। তিনি মেনটাকিসের কথা মেনেছিলেন। একে কি আমরা খুন বলতে পারি? আমি অন্তত কখনোই তা বলব না। এবার আমরা হাউসকিপারের বক্তব্য শুনব। উনি বলেছেন যে, মিসেস সাভালাস সেদিন চাকরবাকরদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্বামীর সাথে হনিমুন ডিনারে অংশ নেবেন। নিজের হাতে সব রান্না করবেন। দেখুন, মেয়েরা কীভাবে স্বামীদের মন খুশিতে ভরিয়ে রাখতে পারে? ভালো ব্যবহার এবং ভালো রান্না। তাই নয় কী? এবার আমরা হাউসকিপারের কথাও বলব। ওই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই মিঃ সাভালাস্‌কে মনে মনে ভালোবাসতেন। তা না হলে কেউ পঁচিশ বছর ধরে অনুগত হয়ে কাজ করতে পারেন নাকি? মনে রাখবেন, অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের আচরণ সম্পর্কে উনি বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

ছোটাস হঠাৎ কেশে উঠলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন–এবার আমরা আরও কিছু কথা শোনাব। যাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তিনি সত্যি সত্যি স্বামীকে ভালোবাসতেন। ভালো রান্না করে খাওয়াতে চেয়েছিলেন একে আমরা ভালোবাসার এক বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি।

এবার ছোটাস আবার বোতলের দিকে তাকালেন।

তিনি স্বামীর যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে চেয়েছিলেন।

বারোটা বাজতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি আছে।

-লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকান। তার মুখ দেখে কি মনে হচ্ছে তিনি একজন হত্যাকারী? তার চোখ দেখে কি মনে হচ্ছে, তিনি একজন ঘাতিকা?

পিটার ডেমোনিডাস হতাশ হয়ে জুরিদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। জুরিরা ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন–এটাই পিটারের স্থির বিশ্বাস।

এই ব্যাপারে আইন অত্যন্ত পরিষ্কার। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়রা, আমাদের মহামান্য বিচারপতিরা তাদের বক্তব্য প্রয়োগ করবেন। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, অ্যানাসটাসিয়ার দোষ সম্পর্কে কোথাও এতটুকু অবকাশ নেই। তবু কেন আমি তার হয়ে এই মামলাটা লড়ছি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ....

নেপোলিয়ান ছোটাস কথা বলতে বলতে আবার কেশে উঠলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। মুখে চাপা দিলেন। যেখানে সিরাপের বোতলটা রাখা আছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

...আমার মনে হচ্ছে, বিরুদ্ধে পক্ষের উকিল কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। তবে তার বক্তব্য থেকে আমি অনেকগুলি সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন

যে, মিসেস সাভালাস এই বোতলের কফসিরাপ স্বামীর ওপর প্রয়োগ করেছিলেন।

কথা বলতে বলতে প্রবল কাশির তোড়ে হকচকিয়ে গেলেন ছোটাস। অচেতন অবস্থা হল তাঁর। তিনি কোনোরকমে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কফ মেডিসিনের বোতলটা খুললেন। তারপর খানিকটা সিরাপ ঢক করে গিলে ফেললেন। কোর্টঘরে উপস্থিত সকলে তখন অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। আইনজীবী কী করছেন? বিষাক্ত তরল জেনেও অনায়াসে তা পান করছেন?

কোর্টরুমের এখানে সেখানে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

প্রধান বিচারপতি চিৎকার করে বললেন–মিঃ ছোটাস!

নেপোলিয়ান ছোটাস আর-এক ঢোক সিরাপ খেয়ে ফেললেন। বললেন–ইয়োর অনার, আপনার বেশ বুঝতে পারছেন, আমার মাননীয় আইনজীবী বন্ধু কীভাবে আপনাদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন। জর্জ সাভালাস এই ভদ্রমহিলার হাতে নিহত হননি। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হল তো?

ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারোটা বাজল। একজন বেলিফ ছুটে গেল প্রধান বিচারপতির কাছে।

প্রধান বিচারপতি হাতুড়ি ঠুকে বললেন–অর্ডার, অর্ডার! আমরা দু-ঘণ্টার জন্য বিচারসভা বন্ধ রাখব। জুরিরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। এই বিচারে কী রায় দেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে। দুটোর সময় আবার কোর্ট বসবে।

পিটার ডেমোনিডাসকে মনে হল, কেউ যেন তার মুখ রক্তহীন করে দিয়েছে। এটি কী করে সম্ভব? এটা কি ভোজবাজি নাকি? বোতল পালটে গেছে? কিন্তু তা কেমন করে হবে?.পুলিশের কড়া প্রহরা আছে। প্যাথোলজিস্টরা রিপোর্ট দিয়েছেন? ডেমোনিডাস তার সহকারীর সঙ্গে কথা বললেন। নেপোলিয়ান ছোটাসকে কাছে-পিঠে কোথাও দেখা গেল না।

দুটোর সময় কোর্ট আবার বসল। জুরিরা কোর্টরুমে এসে গেছেন। নেপোলিয়ান ছোটাসকে তখনও দেখা যাচ্ছে না।

পিটারা ভাবলেন, বুড়োটা বোধহয় মরেছে। বেশি বাহাদুরি দেখতে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান ছোটাসকে দেখা গেল। তাকে যথেষ্ট স্বাস্থ্াজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। কোর্টরুমের দর্শকরা অবাক চোখে নেপোলিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রধান বিচারপতি বললেন–লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, জুরিরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

জুরিদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–ইয়োর অনার, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, অভিযুক্তাকে কখনোই খুনের আসামি বলা যায় না। তাঁকে সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি দেওয়া হল।

দর্শকদের মধ্যে থেকে উচ্ছ্বাসধ্বনি ভেসে এল।

পিটার ডেমোনিডাসকে দেখে মনে হল, অদৃশ্য শয়তান তার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। বেজন্মার বাচ্চাটা আরও একবার আমাকে হারিয়ে দিল! বিড়বিড় করতে থাকেন তিনি। তাকিয়ে থাকেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নেপোলিয়ান ছোেটোসের মুখের দিকে।

.

.০৮.

আসল রহস্যের কী হল? গ্রিসে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে কাটা দিয়ে কাটা তুলতে হয়। নেপোলিয়ান ছোটাস কি সেই পদ্ধতি নিলেন?

তাই কি আমরা তাকে এক জীবন্ত শয়তান বলে থাকি? যখনই অবস্থাপন্ন ঘরের পুরুষ অথবা নারী ভুল করে খুন করে বসেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান ছোটাসের শরণাপন্ন হন। এ ব্যাপারে ছোটাস কিংবদন্তীর মহানায়ক হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি খুনের আসামিকে বাঁচিয়ে আসছেন। একটির পর একটি সাফল্যের পালক গোঁজা হচ্ছে তার মাথার মুকুটে। অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের ব্যাপারটি সমাধান করে তিনি তো জাতীয় নায়ক হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর সর্বত্র সংবাদপত্রে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে এই খবরটি ছাপা হয়েছে। এমন একজন মহিলাকে তিনি বাঁচিয়েছেন, যাঁর প্রাপ্য ছিল মৃত্যুদণ্ড। বিজয়টাকে সত্যি সত্যি দর্শনীয় বলা যেতে পারে। তবে এর জন্য তাঁকে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের জীবন সংশয় করেও লড়তে হয়েছে। তিনি বলেই বোধহয় এই লড়াইতে নামতে পেরেছেন। অন্য কেউ হলে আগেই হার স্বীকার করতে বাধ্য হতেন।

জুরিদের মুখগুলোর কথা মনে পড়লে ছোটাস মাঝে মধ্যে হেসে ওঠেন। আহা, কী কৌশলেই বিপক্ষের আইনজীবীকে বোকা বানানো হয়। সাফল্য যে কত মধুর, তা তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছেন। সব ব্যাপারটা আগে থেকে সাজানো ছিল। ইচ্ছে করেই তিনি সাক্ষীদের কোনো প্রশ্ন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে নাটকীয় পর্যালোচনাটা বলবেন বারোটা বাজার আগে, ঠিক এক মিনিট। যদি বিচারপতিরা আরও কিছুক্ষণ বেশি বিচার চালানোর কথা ভাবতেন, তাহলে কী হত? তাহলে ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে যেত।

তার জীবন সংশয় দেখা দিত। কোর্টে টিফিন ঘোষিত হবার পর আবার তিনি তরতাজা হয়ে ফিরে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু রিপোর্টাররা তাকে ঘিরে ধরেছিল।

মিঃ ছোটাস, আপনি কী করে জানলেন যে, কফসিরাপের মধ্যে বিষ নেই?

–আপনি কি বলবেন...

–কেউ কি বোতল পালটে দিয়েছে?

অ্যানাসটাসিয়া সাভালাস...

অনুগ্রহ করে আমায় এখন ছেড়ে দেবেন। প্রকৃতির ডাক এসেছে। আমি ফিরে এসে আপনাদের সব কথার জবাব দেব।

ছোটাস তখন দৌড়োচ্ছিলেন। করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে বাথরুমের ওপর লেখা ছিল আউট অফ অর্ডার।

একজন সাংবাদিক বলেছিলেন- আপনি অন্য একটা টয়লেটে এখুনি চলে যান স্যার।

নেপোলিয়ান ছোটাস বলেছিলেন–না, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

তার দলবল সেখানে তৈরি ছিল। ডাক্তার অনুযোগ জানিয়ে বললেন–তাড়াতাড়ি করুন। অ্যান্টিমনি খুব দ্রুত কাজ করে। এখুনি পাকস্থলী পাম্প করতে হবে।

কাজ শুরু হয়ে গেল। নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন–মেঝের ওপর শুয়ে পড়ুন। মনে হচ্ছে, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে পারে।

নেপোলিয়ান আমতা আমতা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না ডাক্তার। আমি জানি, এই লড়াইতে আমিই জিতব।

.

অ্যানাসটাসিয়া সাভালাসের জীবন বাঁচানোর জন্য নেপোলিয়ান ছোটাস দশ লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। পুরো ডলারটা সুইস ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছিল।

কোলোনারাইতে একটি প্রাসাদোপম বাড়ি কিনেছিলেন। এটি হল এথেন্সের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক অভিজাত অঞ্চল। আহা, করফু দ্বীপে একটি সুন্দর ভিলা! প্যারিসে এভিনিউ ফকে আর একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি এখন যথেষ্ট বিত্তবান ব্যক্তি।

সব মিলিয়ে নেপোলিয়ান ছোটাস জীবনে সফল পুরুষ। তবে তার জীবনাকাশে একটি মাত্র কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যায়।

তিনি হলেন ফ্রেডেরিক স্টাভরস। তিনি হলেন ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস-এর নতুন সদস্য।

নেপোলিয়ান, ওই লোকটির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

–সেই ভদ্রলোক আমার অনেকগুলি কেস ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই মানুষটিকে আমি, কী করে শায়েস্তা করব?

–আপনারা কি জানেন, এই লোকটি কত বড়ো শয়তান?

বুঝতে পারছি, এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

নেপোলিয়ান ছোটাস বুঝতে পেরেছিল, তার ঘাড়ে কেউ গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু কী আর করা যাবে? একবার, শুধু একটি সুযোগ দরকার। তাহলেই বিপক্ষ উকিলকে তিনি–ধরাশায়ী করতে পারবেন।

.

এক দার্শদিক একদা বলেছিলেন- সব ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক হতে হবে।

ফ্রেডারিক স্টাভরস এই প্রবাদ বাক্যটি মেনে চলেন। তিনি ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস এর একজন সাধারণ সদস্য। তাঁর মনে স্বপ্ন আছে। তিনি জানেন, পৃথিবীর ওপর শক্ত পায়ে হেঁটে যেতে হয়। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়।

–ফ্রেডারিক, তার বউ বলেছিল, মনে হচ্ছে, তুমি কোনো ব্যাপারে খুবই চিন্তিত।

না, আমি ভালোই আছি।

ফ্রেডারিক এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ। জীবনে অনেক আশা আছে, সে আদর্শবাদী। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি একটি অফিসে চাকরি করছেন, এথেন্সের মোনাসটিরাকি বিভাগে। তসহিষ্ণু খদ্দেরদের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। কোনো টাকাপয়সা নেননি। নেপোলিয়ান ছোটাসের সঙ্গে যখন তার দেখা হল, তখনই জীবনটা একেবার পালটে গেল।

একবছর আগে তিনি ল্যারি ডগলাসের কেসটা লড়েছিলেন। নোয়েলে পেজকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ডগলাসের বউকে হত্যার অপরাধে। মেয়েটির নাম ক্যাথেরিন। নেপোলিয়ান ছোটাসকে কিনে নিয়েছিলেন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস। ডেমিরিস চেয়েছিলেন, তাঁর রক্ষিতার হয়ে একজন পুঁদে উকিলকে দাঁড় করাতে।

স্টাভরস ছোটাসের হয়ে কাজ করেছিলেন। আহা, তখন থেকেই তিনি ছোোটাসের ভক্ত হয়ে উঠেছেন।

–ছোটাসকে তার কর্মরত অবস্থায় দেখা উচিত। স্টাভরস বউয়ের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, ভদ্রলোককে দেখে তুমি বুঝতে পারবে না, কী ধুরন্ধর আর চালাক! আমার খুব ইচ্ছে, আমি কোনোদিন তার ফার্মে যোগ দেব।

তখন মামলা ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। একটা অপ্রত্যাশিত বাঁক দেখা গেল। নেপোলিয়ান ছোটাসের প্রাইভেট চেম্বারে নোয়েলে পেজ, ল্যারি ডগলাস এবং ফ্রেডারিক স্টাভরসকে কথা বলতে দেখা গেল।

ছোটাস স্টাভরসকে বলেছিলেন–এই মাত্র বিচারকদের সাথে আমি আলোচনা করে এলাম। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মনের মতো ঘটতে পারে, অবশ্য যদি অভিযুক্তরা তাদের জবানবন্দি পরিবর্তন করে। সেক্ষেত্রে বিচারকরা বলেছেন, অপরাধীদের পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। তার মধ্যে চার বছর মুকুব করে দেওয়া হবে। মাস ছয়েকের মতো জেল খাটতে হবে।

তারপর তিনি ল্যারির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন–আপনি একজন আমেরিকান, মিঃ। ডগলাস, আপনাকে এই দেশ থেকে বিতাড়ন করা হবে। আপনি আর কোনোদিন গ্রিসে ফিরে আসতে পারবেন না।

নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাস সেইমতো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের জবানবন্দি বদলে দিয়েছিলেন। পনেরো মিনিট কেটে গেছে। প্রধান বিচারপতি

বললেন–গ্রিক আদালত কখনও সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে না, যার বিরুদ্ধে খুনের মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই মনে হচ্ছে, নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে। কারণ তাদের দোষ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। আজ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটবে।

স্টাভরস ভেবেছিলেন, নেপোলিয়ান ছোটাস এবার বোধহয় চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু ছোটাসকে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ভাড়া করেছিলেন অন্য কারণে। তিনি চেয়েছিলেন, তার রক্ষিতা নোয়েলে পেজের যেন মৃত্যুদণ্ড হয়। এভাবেই তিনি ওই বিশ্বাসঘাতিকার চরম শাস্তি চেয়েছিলেন।

স্টাভরস ভেবেছিলেন, তিনি নিজেই প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করবেন। ছোটাস কী জঘন্য কাজ করেছেন তা বুঝিয়ে বলবেন। চেষ্টা করবেন, বিচারটাকে যদি পালটানো যায়।

নেপোলিয়ান ছোটাস স্টাভরসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলেছিলেন–কাল যদি তুমি ফাঁকা থাকো তাহলে আমার কাছে এসো। আমার সাথে লাঞ্চের আসরে। আমি আমার পার্টনারদের সঙ্গে তোমায় কথা বলিয়ে দেব।

.

চার সপ্তাহ কেটে গেছে, ফ্রেডারিক স্টাভরস ওই ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস-এর অন্যতম অংশীদারে পরিণত হয়েছেন। বিরাট অফিস পেয়েছেন। মোটামুটি ভালো বেতন।

এইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে বিক্রি করলেন শয়তানের কাছে। শেষ অব্দি তিনি সেই সরল সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন, তা হল, অর্থই এই পৃথিবীর একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

–তাও নিজেকে মাঝে মধ্যে অপরাধী বলে মনে হয় স্টাভরসের। মনে হয় আমি যেন এক জঘন্য হত্যাকারী।

ফ্রেডারিক স্টাভরস মাঝে মধ্যেই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। শেষ অব্দি তিনি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোলেন।

একদিন সকালে তিনি নেপোলিয়ান ছোটাসের অফিসে গেলেন। বললেন নেপোলিয়ান,...

হ্যাঁ, কী বলতে চাইছ বলো? তুমি কি ছোট্ট ছুটি চাইছ, ফ্রেডারিক? হ্যাঁ এটা তোমার পক্ষে ভালোই হবে।

স্টাভরস জানতেন যে, তিনি তার সমস্যার কথা বলতে এসেছেন। তিনি বললেন নেপোলিয়ান, আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারছি না।

ছোটাস তার এই কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন- তুমি কী বলছ? তুমি তো ভালোই কাজ করছ।

না, আমি থাকতে পারছি না।

–কেন? বিবেকের তাড়না?

ফ্রেডারিক বলেছিলেন- নোয়লে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের ব্যাপারটা মনে আছে? এর জন্য পনি কি কখনও বিবেকের দংশন অনুভব করেন না?

ছোটাসের চোখ দুটি সরু হয়ে এল।

– ফ্রেডারিক, কোনো কোনো সময় বিকৃত পন্থা অবলম্বন করে সুবিচার কিনতে হয়।

নেপোলিয়ান হেসেছিলেন।

আমাকে বিশ্বাস করো, কোনো কাজের জন্য আমি কখনও অনুতাপ প্রকাশ করি না। যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। আমরা হলাম নিমিত্ত মাত্র।

–আমরা ইচ্ছে করে ওই দুজনকে ফাঁসি দিয়েছি। আমরা ওদের সাথে দুষ্টু বুদ্ধির খেলা খেলেছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে আর কাজ করতে পারছি না। আমি এ মাসের শেষে এই ফার্ম ছেড়ে চলে যাব।

তোমার পদত্যাগপত্র আমি গ্রহণ করব না। ছোটাস বলেছিলেন, তুমি কেন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছ? আত্মঘাতী বরং কিছুদিন ছুটি নাও, স্ত্রীর সাথে কোথাও ঘুরে এসো। মন তরতাজা হলে আবার এখানে এসো।

না, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এখানে থাকলে আমি খুশি হতে পারব না। আমি দুঃখিত।

নেপোলিয়ান ছোটাস অনেকক্ষণ ধরে ফ্রেডারিকের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন- এবার কী করবে কিছু ভেবেছ কী? তুমি কিন্তু একটা ভীষণ ভালো পেশাকে লাথি মেরে চলে যাচ্ছ। ভবিষ্যতে এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে।

না, আমি আমার জীবনকে বাঁচাতে চাইছি।

–তুমি এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ?

–হ্যাঁ, কোনোভাবেই আমার এই সিদ্ধান্ত পালটাবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি... কোথাও গিয়ে এব্যাপারটা আলোচনা করব না।

ফ্রেডারিক অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নেপোলিয়ান ছোটাস তাঁর ডেস্কে বসেছিলেন চিন্তামগ্ন হয়ে। শেষ অব্দি তিনি একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে একটি নাম্বার ডায়াল করলেন।

মিঃ ডেমিরিসকে বলবেন যে, আজ বিকেলবেলা তার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

.

চারটে বেজেছে। নেপোলিয়ান ছোটাসকে দেখা গেল কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের অফিসে বসে থাকতে।

ডেমিরিস জানতে চাইলেন- কী হয়েছে নেপোলিয়ান? সমস্যাটা কোথায়?

–এটাকে আমি সমস্যা বলব না। কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার। ফ্রেডারিক স্টাভরস আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আর এই সংস্থায় থাকতে চাইছে না।

–স্টাভরস? ল্যারি ডগলাসের আইনজ্ঞ। তাই তো?

হ্যাঁ, বিবেকের দংশনে দংশিত হচ্ছে বেচারি।

অনেকক্ষণের নীরবতা।

–ঠিক আছে, আমি দেখছি।

অবশ্য ও বলছে, ব্যাপারটা নিয়ে কোথাও আলোচনা করবে না। ব্যাপারটার সেখানেই ইতি ঘটে গেছে।

–আপনি কি ওকে বিশ্বাস করছেন?

–আমি করছি, কোস্টা।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস হেসে বলেছিলেন, ঠিক আছে, তা হলে এই ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ আছে কী?

নেপোলিয়ান ছোটাস বলেছিলেন–মনে হচ্ছে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবুও আমি আসল অবস্থাটা আপনাকে বলে গেলাম।

–ঠিক আছে,। অত চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসছে সপ্তাহে আপনি কোনোদিন ফাঁকা আছেন কী? অনেকদিন দুবন্ধু মিলে নৈশভোজে সারা হয়নি।

–নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।

–ঠিক আছে, আমি টেলিফোনে আপনাকে ডেকে নেব।

–অনেক ধন্যবাদ কোস্টা।

.

শুক্রবার, শেষ বিকেল, কাপনিকারিয়া চার্চ, ডাউনটাউন। নীরবতা বিরাজ করছে। শান্ত পরিবেশ। বেদির পাশে ফ্রেডারিক স্টাভরস হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার। তিনি স্টাভরসের মাথার ওপর এক টুকরো কাপড় চাপা দিয়েছেন।

–আমি অনেক পাপ করেছি ফাদার। আমার পাপের কোনো শাস্তি আছে কী?

-মানুষ অনেক সময় অজান্তে পাপ করে, হে আমার পবিত্র পুত্র। তুমি কী ধরনের পাপ করেছ?

–আমি একজন খুনে।

–তুমি কাউকে হত্যা করেছ?

–হ্যাঁ, ফাদার, আমি জানি না। এই পাপের জন্য আমাকে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে?

–ভগবান সব কিছু জানেন, তুমি ভগবানের সাথে কথা বলল।

–আমি যে কথা বলতে পারছি না! লোভ আমাকে পাপের পথে ডেকে এনেছে। এক বছর আগে এই মারাত্মক ঘটনাটা ঘটেছে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত একটি মানুষের হয়ে আমি ওকালতি করেছিলাম। মামলাটা তরতর করে এগিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ান ছোটাস...

ফ্রেডারিক স্টারস চার্চ থেকে বেরিয়ে এলেন। আধঘণ্টা কেটে গেছে। তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হয়েছেন। মনে হল, তার কাঁধ থেকে বিরাট বোঝাটা তিনি নামিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বীকারোক্তির যে রীতি আছে, সেটি তিনি পালন করেছেন। তিনি পুরোহিতকে সব কথা বলেছেন। এই প্রথম সব কথা বাইরের কাউকে বললেন। আহা, এত আনন্দ? স্বীকারোক্তির এত আনন্দ!

আমি একটা নতুন জীবন শুরু করব। আমি এই শহরের অন্য কোথাও চলে যাব। দেখব, দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারি কিনা। আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ ফাদার। আপনি এভাবে স্বীকারোক্তির সুযোগ না দিলে সারাজীবন একটা অপরাধ বোধ আমাকে কুরে কুরে খেত।

অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, চারপাশ নীরব নিথর হয়ে গেছে। ফ্রেডারিক স্টাভরস রাস্তার দিকে চলে গেলেন। সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। তিনি রাস্তা পার হবার চেষ্টা করলেন। ঠিক যখন মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, একটা কালো লিমুজিন গাড়ি পাহাড়ের ওপর থেকে হেডলাইট জ্বেলে এগিয়ে এল। বিরাট দৈত্যের মতো সেই গাড়িটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহা, নির্মম এক শয়তান! স্টারস অপলক তাকিয়েছিলেন, ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলেন, পালাবার পথ নেই, তারপর? আর্তনাদ, আর্তচিৎকার। স্টাভরসের মনে হল তার শরীর হাজার হাজার টুকরো হয়ে গেছে। তারপর ঘন অন্ধকার।

.

নেপোলিয়ান ছোটাস সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। তাঁর কেবলই মনে হয়, দিনটি শুরু হবার আগে চারপাশ কী সুন্দর নীরব নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। তিনি একা একা সকালের প্রাতরাশ সারেন। খবরের কাগজগুলো মন দিয়ে পড়েন। সেই সকালে তিনি একটি বিষয় জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি দলের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। ছোটাসের মনে হল, এখুনি তাকে একটা শুভেচ্ছাসূচক তারবার্তা পাঠানো উচিত। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সেন্যরা ইয়াংসি নদীর উত্তর প্রান্তে পৌঁছে গেছে। হ্যারি ট্রুম্যান এবং অ্যালবেন বার্কলেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নেপোলিয়ান ছোটাস দ্বিতীয় পাতায় এলেন। এবং একটি খবর পড়ে তার রক্ত হিম হয়ে গেল।

মিঃ ফ্রেডারিক স্টাভরস, বিশিষ্ট ট্রিটসিস অ্যান্ড ট্রিটসিস সংস্থার অন্যতম অংশীদার, গতরাতে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি কাঁপানিকারিয়া চার্চ থেকে বেরিয়ে

সূচিপত্র

আসছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, একটি কালোরঙের লিমুজিন তাকে চাপা দেয়। এই লিমুজিন গাড়িটিতে কোনো নাম্বার প্লেট ছিল না। নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের অন্যতম আইনজীবী হিসেবে মিঃ স্টাভরস দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ল্যারি ডগলাসের অ্যাটর্নি ছিলেন।–

নেপোলিয়ান ছোটাস আর পড়তে পারলেন না। তিনি তার চেয়ারে স্থির হয়ে বসে রইলেন। ব্রেকফাস্ট খেতে ভুলে গেলেন। অ্যাকসিডেন্ট? সত্যি কি এটা একটা দুর্ঘটনা? কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বলেছিলেন, কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু? ডেমিরিসের মুখের ভাব দেখে তাঁর মনের কথা বোঝা যায় কি?

ছোটাস টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে ফোনে ডাকলেন।

–আজ সকালের কাগজ পড়েছেন কি?

ছোটাস জানতে চাইলেন।

না, এখনও পড়িনি। কেন?

–ফ্রেডারিক স্টাভরস আর বেঁচে নেই।

–কী বলছেন! আপনি এসব কী বলছেন?

–সত্যি, ছেলেটি পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

–হে ঈশ্বর, আমি অত্যন্ত দুঃখিত! ড্রাইভারটাকে ধরা সম্ভব হয়েছে কি?

না, না, এখনও ধরা পড়েনি।

পুলিশের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে। এখনকার দিনে কারও জীবন আর নিরাপদ, নয়। আচ্ছা, বৃহস্পতিবার ডিনারের আসর বসানো যেতে পারে কি?

–ঠিক আছে।

–তাহলে এই কথা রইল।

ছোটাস আবার কাগজ পড়তে শুরু করলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের এই বিস্ময়বোধটা কতখানি সত্যি? নাকি তিনি এক পাকা অভিনেতা! মনে হচ্ছে স্টাভরসের মৃত্যুর সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের কোনো যোগ নেই। এমনটাই ছোটাস ভাবতে চাইলেন।

.

পরের দিন সকালবেলা। নেপোলিয়ান ছোটাস তার প্রাইভেট গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে অফিস বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়িটা পার্ক করলেন। যখন তিনি এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি অল্পবয়সী ছেলে বেরিয়ে এল।

–আপনার কাছে ম্যাচেস আছে স্যার?

ছোটাসের মনের মধ্যে বেজে উঠল বিপদ ঘণ্টাধ্বনি। এই ছেলেটি একেবারে অজানা, এই গ্যারেজে কী করছে?

–হ্যাঁ, আছে। কোনো কথা চিন্তা না করে ছোটাস তার ব্রিফকেস দিয়ে ছেলেটির মাথায় আঘাত করলেন।

ছেলেটি যন্ত্রণায় গর্জন করে উঠল–কুক্কুররি বাচ্চা!

সে তার পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করল। বন্দুকে সাইলেনসার লাগানো আছে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল–কী হচ্ছে এখানে? এই ছোকরা? ইউনিফর্ম পরা গার্ড বেরিয়ে এসেছে।

ছোকরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর খোলা দরজার দিকে পালিয়ে গেল।

প্রহরী ছোটাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি ঠিক আছেন মিঃ ছোটাস?

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন–হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।

–ও কী করার চেষ্টা করছিল?

নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন–আমি ওর মতিগতি বুঝতে পারিনি।

.

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এটা কি একটা সমাপতন? ছোটাস নিজের কাছে জানতে চাইলেন। হতে পারে, ছেলেটি হয়তো পাতি ছিনতাইবাজ। কিন্তু সাইলেনসার লাগানো বন্দুক ব্যবহার করবে কেন? নাকি ও আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? এর অন্তরালেও কি কনস্ট্যানটিনের কালো হাত আছে? কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

আমি বুঝতে পারছি না, ছোটাস ভাবলেন, ডেমিরিস সম্পর্কে আরও সতর্ক হতে হবে। ডেমিরিসের কানে এমন কোনো খবর তুলে দেওয়া উচিত হবে না, যা বিপদসূচক হতে পারে।

এমন সময় নেপোলিয়ান ছোটাসের সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর শোনা গেল ইন্টারকমে।

–মিঃ ছোটাস, তিরিশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে আদালতে আসতে হবে।

আজ একটা সিরিয়াল মার্ডার কেসের গুরুত্বপূর্ণ ট্রায়াল আছে। কিন্তু ছোটাস তখনও ভয়ে কাঁপছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন না, আজ কোর্টে গিয়ে সওয়াল জবাবে অংশ নিতে পারবেন না। তিনি তার সেক্রেটারিকে বললেন বিচারককে ডেকে বলল, আমি আজ খুবই অসুস্থ। আমার কোনো একজন পার্টনারকে পাঠিয়ে দাও। ফোন এলে আর আমাকে বিরক্ত করো না।

তিনি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে টেপরেকর্ডার বের করলেন। কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর কথা বলতে শুরু করলেন।

.

সেদিন সন্ধেবেলা নেপোলিয়ান ছোটাসকে দেখা গেল স্টেট প্রসেকিউটিং অ্যাটর্নি পিটার ডেমোনিডাসের চেম্বারে। হাতে একটা ম্যানিলা এনভেলপ। রিসেপশনিস্ট তাকে দেখে চিনতে পেরেছে।

শুভ সন্ধ্যা, মিঃ ছোটাস! আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব?

–আমি মিঃ ডেমোনিডাসের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।

উনি একটা মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন। আপনি কি আগে থেকে বলে রেখেছিলেন?

–না, আপনি বলবেন, আমি এখানে আছি। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

–এখনই বলছি।

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। নেপোলিয়ান ছোটাস প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির অফিসের মধ্যে বসে আছেন।

-ঠিক আছে, ডেমেনিডাস বললেন, মহম্মদ পাহাড়ের কাছে এসেছে, ব্যাপার কী? আপনার জন্য আমি কী করতে পারি? আজ বিকেলবেলা কোনো ভালো লেনদেন হবে বলে মনে হয় না।

-না, পিটার। এটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বসুন, বসুন নেপোলিয়ান।

দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

ছোটাস বললেন আমি এই এনভেলপটা আপনার হাতে তুলে দিতে চাইছি। মুখটা বন্ধ করা আছে। যদি কোনো কারণে আমার মৃত্যু ঘটে, তা হলে এই এনভেলপটা খুলবেন। আপনি কথা দিন।

ছোটাসের এই আচরণে পিটার ডেমোনিডাস অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন–এমন কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে কি?

–হ্যাঁ, সম্ভাবনা আছে।

–কেন? আপনার কোনো ক্লায়েন্ট কি?

-তা জানি না, কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই পৃথিবীতে একমাত্র আপনার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। আপনি কথা দিন, এই খামটা ঠিক সময়ে খুলবেন।

ডেমোনিডাস বললেন–আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোনো কারণে আপনি আতঙ্কিত।

–আমি খুব ভয় পেয়েছি।

–আমার এই অফিসে আপনি কিছুক্ষণ থাকবেন কি? আমি একটা পুলিশকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি।

ছোটাস এনভেলপটার দিকে তাকিয়ে বললেন–আমি এই এনভেলপটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি।

-ঠিক আছে, এটা আপনি আমার জিম্মায় রেখে যান।

–ঠিক আছে। ছোটাস উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যাক, কেমন? পিটার বললেন–ঠিক আছে, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। হেলেনিক ট্রেড করপোরেশনের অফিসে ইউনিফর্ম পরা এক বার্তাবাহক এসে দাঁড়িয়েছে। সে একজন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছে।

–মিঃ ডেমিরিসের একটি প্যাকেট এসেছে।

আমি কি সেটা সই করে নেব?

–না, এটা ডেমিরিসের হাতেই তুলে দিতে হবে।

আমি দুঃখিত। এখন তাকে বিরক্ত করা যাবে না। কোথা থেকে এই প্যাকেটটা এসেছে?

নেপোলিয়ান ছোটাসের কাছ থেকে।

–এই ব্যাপারে আর কিছু বলার আছে কি?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–দেখছি মিঃ ডেমিরিস এটা গ্রহণ করেন কিনা?

সেক্রেটারি ইন্টারকমের সুইচটা টিপে ধরলেন।

–আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ ডেমিরিস। একজন বার্তাবাহক একটি প্যাকেট নিয়ে এসেছেন। মিঃ ছোটাস আপনাকে এই প্যাকেটটা পাঠিয়েছেন।

ডেমিরিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ইন্টারকমে আইরিন ওটা ভেতরে নিয়ে এসো।

উনি বলেছেন, এটা আপনার হাতে ব্যক্তিগতভাবে তুলে দেবেন। ক্ষণকালের নীরবতা ভেতরে নিয়ে এসো। আইরিন এবং ওই বার্তাবাহক ভেতরে ঢুকল।

–আপনি কি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস?

–হ্যাঁ।

–আপনি এটা সই করে দেবেন?

ডেমিরিস একটুকরো কাগজে সই করলেন। বার্তাবাহক ওই খামটা ডেমিরিসের হাতে তুলে দিলেন। বললেন–ধন্যবাদ।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার সেক্রেটারির দিকে তাকানে, বার্তাবাহক চলে গেল। সেক্রেটারিও চলে গেল। তিনি কিছুক্ষণ ওই এনভেলপের দিকে তাকিয়ে থাকলেন চিন্তিত মুখে। শেষে এনভেলপটি খুললেন। কী আছে ভেতরে? টেপ কী? অবাক লাগল। তিনি টেপপ্লেয়ারটাও দেখতে পেলেন। বোতামটা টিপলেন। টেপরেকর্ডার গমগমিয়ে শব্দ করতে শুরু করল।

নেপোলিয়ান ছোটাসের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল–প্রিয় কোস্টা, এই ব্যাপারগুলো আপনার কাছে খুবই সহজ সরল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ফ্রেডারিক স্টাভরসের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা আমি মন থেকে মুছতে পারছি না। এর মধ্যে একটা রহস্য আছে, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। আমি জানি না, এই ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করা উচিত হবে কিনা। হায়, হতভাগ্য স্টাভরস, তাকে এইভাবে মরতে হল! ভবিষ্যতে আপনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাইছেন? আমার জীবনটা আমার কাছে খুবই দামি। যেমন আপনার জীবনটা আপনার কাছে। আমি হয়তো আপনার পরবর্তী শিকার হব। তাই আমি সব কিছু খুঁটিনাটি লিখে রাখছি। নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের ব্যাপারে আমি যে কাজ করেছিলাম, এটা কি তারই শাস্তি? আমি একটি মুখবন্ধ এনভেলপের মধ্যে এই টেপটি ঢুকিয়ে রাখছি। এটিকে প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির হাতে তুলে দেওয়া হবে। যদি কোনো কারণে আমার মৃত্যু হয়, অবিশ্বাস্যভাবে, দুর্ঘটনায়, তা হলে এই খামটি ভোলা হবে। হে বন্ধু, আমি এখনও বেঁচে থাকব। জানি না, ভবিষ্যতে কী লেখা আছে!

টেপ এখানেই শেষ হয়ে গেছে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বসে থাকলেন শূন্যের দিকে তাকিয়ে।

.

নেপোলিয়ান ছোটাস অফিস থেকে বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে এলেন। এখন আর তার ভয় করছে না। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এক ভয়ংকর শয়তান। কিন্তু মানুষটি আসলে বোকা। তিনি কারোর কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। অবশ্য কোনো কোনো সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। ছোটাস ভাবলেন, আমাকে আরও কৌশলী হতে হবে। নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আহা, বৃহস্পতিবারের ডিনার পার্টি,.. সেদিন থেকে নতুন কাজ শুরু করলে কেমন হয়?

.

কয়েকদিন কেটে গেল দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে। নতুন একটা মার্ডার কেসের মামলা শুরু হয়েছে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর দুই রক্ষিতাকে হত্যা করেছে। ছোটাস রোজ সকালবেলা ওঠেন, মধ্যরাত অব্দি একনাগাড়ে কাজ করেন। ক্রস এগজামিনের প্রশ্নগুলি তৈরি করেন। তার মন কেবলই বলছে, এই ব্যাপারে তিনি আবার জয়যুক্ত হবেন।

বুধবার, রাত হয়েছে। তারপরেও অনেকক্ষণ ছোটাস অফিসে বসেছিলেন। তখন মধ্যরাত। তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এলেন। রাত একটার সময় ভিলাতে এসে পৌঁছোলেন।

বাটলার বলল–মিঃ ছোটাস, আমি আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরি করেছি। আপনি খাবেন কি?

না, অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন শুতে যাব।

নেপোলিয়ান ছোটাস বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। পরের দিন আবার অনেক সকালে উঠতে হবে। দুটোর সময় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে আছেন। এক সাক্ষীকে ক্রশ-এগজামিন করছেন। হঠাৎ ওই সাক্ষী তার জামাকাপড় ছিঁড়তে শুরু করল।

ছোটাস জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কেন এখন আচরণ করছেন?

–আমি নিজেকে শেষ করতে চাইছি।

ছোটাস জনাকীর্ণ কোর্টরুমের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সকলেই নিজেদের উলঙ্গ করছে।

তিনি বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাননীয় মহাশয়, এই ব্যাপারে আমি আমার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দেখলেন, বিচারকও তার পোশাক খুলে ফেলেছেন। তিনি বলছেন–এখানে বড্ড গরম।

ছোটাসেরও মনে হল, সত্যিই তো বড্ড গরম এবং শব্দে পরিপূর্ণ।

নেপোলিয়ান ছোটাস চোখ খুললেন। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে কী? ঘরের ভেতর এত ধোঁয়া কেন? বাইরে ওটা কী অগ্নিশিখা?

নেপোলিয়ান উঠে বসলেন। ঘুম ভেঙে গেছে তার।

বাড়িটায় আগুন লেগেছে। কিন্তু বিপদ ঘণ্টা বাজছে না কেন?

প্রচণ্ড তাপে দরজা গলে যাচ্ছে। ছোটাস জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছে। তিনি জানালা খোলার চেষ্টা করলেন। বোঝা গেল, সেটাকে শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়া, আরও ধোঁয়া, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পালাবার কোনো পথ নেই।

সিলিং-এ আগুন ধরে গেছে। একটা দেওয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আগুন ছুটে আসছে। এখনই তা ছোটাসকে গ্রাস করবে। ছোটাস চিৎকার করে উঠলেন। তার চুল এবং পাজামাতে আগুন ধরেছে। অন্ধের মতো তিনি ছুটোছুটি করতে শুরু করলেন। বন্ধ দরজায় পাগলের মতো আঘাত করলেন। জানালা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুই হল না। একটু বাদে তার জ্বলন্ত দেহটা ষোলো ফুট নীচের মাটিতে পড়ে গেল।

.

পরের দিন সকালবেলা। স্টেট প্রসিকিউটার পিটার ডেমোনিডাসকে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের স্টাডি রুমে দেখা গেল।

ডেমিরিস বললেন–কালিমেহেরা পিটার, আপনি এসেছেন। আমি খুশি হয়েছি। বলুন। কী খাবেন?

–হ্যাঁ স্যার, তিনি ডেমিরিসের হাতে ওই বন্ধ এনভেলপটা তুলে দিলেন। নেপোলিয়ান । ছোটাস যেটা তাকে দিয়েছিলেন।

–আমার মনে হচ্ছে, এটাকে এখানেই রাখা দরকার।

–ঠিকই বলেছেন পিটার। আপনি কি ব্রেকফাস্ট খাবেন?

–হ্যাঁ, হলে ভালো হয়।

–কোস্টা, আমাকে কোস্টা বলে ডাকবেন। আপনার কাজের ওপর আমার নজর আছে। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আপনি আমার বন্ধু হবেন। আমার এই সংস্থাতে আপনাকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেব। আপনি আমার সঙ্গে কাজ করবেন কি?

পিটার ডেমোনিডাস হাত কচলাতে কচলাতে বললেন–হ্যাঁ, কোস্টা, আমি তাহলে খুবই খুশি হব।

তাহলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

.

০৯.

লন্ডন

ক্যাথেরিনের সঙ্গে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের নিয়মিত দেখা হয় ক্যাথেরিন বলেছিল, সপ্তাহে অন্তত একবার যেন তিনি দেখা করেন। ডেমিরিস কথা রাখেন। মাঝে মধ্যেই ভালো মন্দ উপহার পাঠান। ক্যাথেরিন কোনো কোনো সময় নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কনস্ট্যানটিন বলেন- এগুলো হল ভালোবাসার স্মারক চিহ্ন।

ইভলিন জানিয়েছে, কীভাবে তুমি বাকসারের ব্যাপারটা সামলেছ। ইভলিনের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি, তুমি অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছ।

সত্যি কথা বলতে কি, নিজের কাজ নিয়ে ক্যাথেরিন এখন আনন্দে ডগমগ। অফিসের দিকে নানা উন্নতি হয়েছে। ফিরে এসেছে ক্যাথেরিনের পুরোনো সৌন্দর্যবোধ। প্রশাসনিক দক্ষতা। ক্যাথেরিন জানে, এইভাবে সে একদিন আরও উঁচুতে উঠতে পারবে।

ডেমিরিস বলেছিলেন- তোমার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।

এই কথায় ক্যাথেরিনের মুখে অহংকারের অভিব্যক্তি। আহা, ডেমিরিস সত্যি এক অসাধারণ পুরুষ! ওঁনাকে বিশ্বাস করা যায়।

.

এখন আমাকে আরও তৎপর হতে হবে, ডেমিরিস চিন্তা করলেন। স্টাভরস এবং ছোটাস পথ থেকে হারিয়ে গেছে। এখনও একজন আছে, সে হল ক্যাথেরিন।

ক্যাথেরিনের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে। এই ব্যাপারে আর বেশি দিন অপেক্ষা করা উচিত নয়। নেপোলিয়ান ছোটাস গোলমাল করার চেষ্টা করেছিলেন। তাকে আর বাড়তে দেওয়া হয়নি। ডেমিরিস ভাবলেন, আহা, ক্যাথেরিন এত সুন্দরী, কিন্তু আর বেশি দিন নয়। অতএব এখন আমার গন্তব্য হওয়া উচিত রাফিনার ওই ভিলাটি।

ভিলাটি কিনে নেওয়া হয়েছে। ক্যাথেরিনকে নিয়ে সেখানে যেতে হবে। ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে। ঠিক যেভাবে ল্যারি ডগলাস তার আদরিনী রক্ষিতা নোয়েলেকে ভালোবাসতো। তারপর...

.

মাঝে মধ্যে ক্যাথেরিন পুরোনো দিনের কথা মনে করে। লন্ডন টাইম-এ সে ফ্রেডারিক স্টাভরস এবং নেপোলিয়ান ছোটাসের মৃত্যুসংবাদ পড়েছে। এই নামগুলো তার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে আনছে কী? শুধু একটি তথ্য, ওরা ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েলে পেজের কেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই রাতে ক্যাথেরিন আবার সেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখল।

.

একদিন সকালবেলা, ক্যাথেরিন দেখল, খবরের কাগজে লেখা আছে

উইলিয়াম ফ্রেজার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি টুম্যানের সহকারী, লন্ডনে এসেছেন। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি নতুন বাণিজ্যিক চুক্তিতে সই করবেন।

কাগজটা ক্যাথেরিন রেখে দিল। ভাবল, এখন কী করা উচিত? উইলিয়াম, ফ্রেজার, তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন কী হবে?

ক্যাথেরিন অনেকক্ষণ ডেস্কে বসে রইল। সে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল। আবার খবরের কাগজের পাতার দিকে চোখ মেলে দিল। তার মানে? উইলিয়াম ফ্রেজার এখন লন্ডনে? এই পুরুষটিকে সে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল। আহা, সেই স্মৃতি সতত সুখের। পুরুষটি এখন লন্ডনে এসেছেন। আমি অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করব। ক্যাথেরিন ভাবল, খবরের কাগজের মতানুসারে তিনি এখন ক্লারিজে থাকবেন।

ক্যাথেরিন ওই হোটলের ফোন নাম্বার ডায়াল করল। তার আঙুলগুলো কাঁপছিল। তার মনের ভেতর অদ্ভুত আলোড়ন। একবার ভাবছে, অতীতকে জাগিয়ে তুলে কী লাভ? কিন্তু ফ্রেজারের সাথে অনেক দিন বাদে দেখা হবে, এই ব্যাপারটাই তাকে অস্থির করে তুলল। সে ফ্রেজারকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আহা, ফ্রেজার যখন আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন তখন কী হবে? উনি কি একইভাবে আমাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবেন?

অপারেটর বলল–গুড মর্নিং, ক্লারিজ।

ক্যাথেরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–উইলিয়াম ফ্রেজারকে একবার দেবেন কি?

–আমি দুঃখিত, ম্যাডাম, আপনি তো বলেননি মিস্টার না মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজার?

তিক্ত স্বপন,–এই কথা শুনে ক্যাথেরিনের মনে হল, কে বুঝি তার গালে সশব্দে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছে। হায়, কী বোকা আমি, এই সম্ভাবনার কথা কেন ভাবিনি!

–ম্যাডাম?

না, ঠিক আছে।

ক্যাথেরিন রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। কোস্টাই ঠিক বলেছে, অতীতকে অন্ধকারেই রাখা উচিত। তাকে আলোকিত সূর্যের সামনে আনলে মন আরও উদ্বিগ্ন এবং হতাশ হয়ে উঠবে।

.

নিঃসঙ্গতাকে আমরা কী বলতে পারি? নিঃসঙ্গতা আমাদের সব কিছু গ্রাস করে।

জীবনের আনন্দ এবং বেদনাকে সমানভাগে ভাগ করতে হয়। কিন্তু ক্যাথেরিন এমন একটা জগতের বাসিন্দা, যেখানে শুধুই অজানা আগন্তুকদের আনাগোনা। অন্য দম্পতিদের সুখী সম্পৃক্ত জীবনের দিকে সে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। প্রেমিক-

প্রেমিকার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর তাকে ব্যথিত এবং মর্মাহত করে। কিন্তু সে কখনোই ব্যথার কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে না।

সে ভাবে, এই বিশ্বে আমিই একক মহিলা নই, আমি বেঁচে আছি, এটাই মস্ত বড় পাওনা আমার কাছে।

লন্ডনে বিনোদনের সহস্র উপকরণ সর্বদা থরে থরে সাজানো থাকে। লন্ডনের সিনেমা হলগুলিতে হলিউডি সিনেমার দাপাদাপি। ক্যাথেরিন মাঝে মধ্যে সেইসব সিনেমা দেখতে যায়। ইতিমধ্যে সে দি রেজরস এজ অ্যান্ড অ্যানা এবং দ্য কিং অফ সিরাম দেখে নিয়েছে। জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট ছবিটা তার মোটেই ভালো লাগেনি। ক্যারি গ্রান্টকে দ্য ব্যাচিলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার ছবিতে দারুণ দেখিয়েছে।

মাঝে মধ্যে ক্যাথেরিন অ্যালবার্ট হলে কনসার্ট শুনতে যায়। স্যাডলারস ওয়েলস-এ গিয়ে ব্যালে নাচ দেখে। স্ট্যাফোর্ড-আপোন অ্যাভোন-এ গিয়ে অ্যান্থনি হুইলিকে দেখে এসেছে। দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু-তে অসাধারণ অভিনয় করেছেন। রিচার্ড থার্ডে স্যার লরেন্স অলিভারের অভিনয় তাকে পাগল করে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে একা একা যেতে ভালল লাগে না।

আর তখনই তার জীবনের রঙ্গমঞ্চে কিক রেনল্ডস-এর প্রবেশ।

কির্ক লম্বা, আকর্ষণীয়। একদিন ক্যাথেরিনকে ডেকে সে বলল–আমি কির্ক রেনল্ডস। তুমি এত নিঃসঙ্গ কেন?

–আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

এ ভাবেই গল্পটা শুরু হয়েছিল।

.

কির্ক একজন আমেরিকান অ্যাটর্নি। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের হয়ে কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। বছর চল্লিশ বয়স। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় খুবই গম্ভীর। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের অধিকারী। সব কাজ মন দিয়ে করতে ভালোবাসেন।

কির্ক রেনল্ডসের সাথে কথা হয়। ইভলিনের সাথেও আলোচনা হয়। ক্যাথেরিন জানতে চায়, কির্কের মধ্যে কী আছে বলো তো? তাকে না দেখলে মনটা কেমন হয়ে যায়।

ইভলিন বলেছিলেন- কির্ক সম্পর্কে আর বেশি আগ্রহী হয়ে উঠো না যেন। সব ব্যাপারে ভেবেচিন্তে পা ফেলবে।

ক্যাথেরিন প্রতিজ্ঞা করেছে, না, কিন্দ্রে প্রতি আমি আমার আসল মনোভাব কখনও প্রকাশ করব না।

.

একদিন কির্ক ক্যাথেরিনকে নিয়ে গেল লন্ডন শহরের এক প্রান্তে। তারা ওল্ড বেইলিতে গেল। বিচারসভায় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিনালদের বিচার হয়েছে। তারা বিভিন্ন ল কোর্ট ঘুরে বেড়াল। ল কোর্টের প্রধান হলে তারা ব্যারিস্টারদের কালো গাউন পরে ছুটোছুটি করতে

দেখল। নিউগেট প্রিজনেও তারা পা রেখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি তৈরি হয়েছিল, রাস্তাটা আরও চওড়া করা হয়েছে।

ক্যাথেরিন বলেছিল–এইভাবে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে কেন?

–আরও বেশি লোক যাতে জেলখানাটা দেখতে পায়। একসময় এখানেই সর্বসমক্ষে ফাঁসির মঞ্চে মানুষকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত।

ক্যাথেরিন শিউরে উঠেছে, ব্যাপারটা এত বীভৎস!

.

সন্ধ্যেবেলা। কিক ক্যাথেরিনকে নিয়ে গেছে ইস্ট ইন্ডিয়ার ডক রোডে। কিছুদিন আগে এখানে ক্রিমিনালদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হত।

জায়গাটা ফাঁকা এবং নিষিদ্ধ। ক্যাথেরিনের কাছে মনে হল এটা বুঝি এখনও ভয়ংকর! একদিন তারা প্রসপেক্ট অফ হুইটবি-তে গিয়ে ডিনার সারল। ইংল্যান্ডের অত্যন্ত পুরোনো শুড়িখানা। ব্যালকনিতে বসে থাকা যায়, তাকিয়ে থাকা যায় টেমসের দিকে।

লন্ডন পাবের অস্বাভাবিক নামগুলো ক্যাথেরিনকে আকর্ষণ করে। সে ভাবতে থাকে এই পাবের সাথেই লন্ডন শহরের সভ্যতা জড়িয়ে আছে।

কির্ক জিজ্ঞেস করেছিল–ছোটোবেলায় তুমি কি এসব জায়গাতে এসেছ?

ক্যাথেরিন জবাব দেয় না, আমি এসব জায়গার নামও শুনিনি।

সময় কেটে যাচ্ছে। আহা, ছোটোবেলার ছড়া মনে পড়ে যাচ্ছে। ক্যাথেরিন হেসে উঠেছে। কির্কের ব্যবহারের মধ্যে ছেলেমানুষি আছে। তারপর? কথা বলতে বলতে কির্ক হঠাৎ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে বলে- আমি সেন্ট মরটিজ-এ যাব। সেখানে স্কি খেলার ব্যবস্থা আছে। ক্যাথেরিন, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

কির্ক উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে।

-না, আমি জানি না জুটি পাব কিনা?

–বলল না আমার সঙ্গে যাবে কিনা?

–হ্যাঁ। ক্যাথেরিনের সমস্ত শরীর কাঁপছে। ল্যারিকে সে একদা ভালোবেসেছিল। এখন আবার নতুন কাউকে ভালোবাসা দান করবে কেমন করে?

.

শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন ঠিক করল, সে কির্কের সাথে উইমের আলাপ করাবে।

উইমকে তার ফ্ল্যাট থেকে তুলে নেওয়া হল। আইভিতে ডিনারের আসর বসেছে। সমস্ত সন্ধ্যে ধরে উইম কির্কের দিকে তাকায়নি। মনে হয়েছে, সে বোধহয় অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। কির্কও এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেনি।

শেষ অব্দি উইমের পেছনে লাগা হল।

–উইম, এই শহরটা তোমার কেমন লাগে?

–ভালোই লাগে।

–তোমার প্রিয় শহর কোনটা?

এই পৃথিবীতে আমার কোনো প্রিয় শহর নেই।

–তুমি তোমার কাজ ভালোবাসো?

–হ্যাঁ, আমি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই।

কির্ক ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়েছে। কাঁধ ঝাঁকানি দিয়েছে।

ক্যাথেরিন চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেছে।

কির্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। উইমের দিকে তাকিয়ে বলেছে- রবিবার আমি গল খেলব, তুমি আসবে কি?

উইম বলেছে–গলফ হল মাথার ওপর লোহা বসানো এক ধরনের খেলা।

তারপর বকবক করে অনেক কথাই বলে গেছে। কির্ক রেনল্ডস তার দিকে তাকিয়ে বলেছে- সত্যি তোমার মনের প্রশংসা না করে পারছি না।

ক্যাথেরিন বলেছে- ও কোনোদিন গলফ খেলার আসরে যায়নি। কিন্তু চোখ বন্ধ করে গলফ সম্পর্কে একশো কথা বলতে পারে।

উইমের বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করার জন্য বলেছে তুমি কি দুই-এর ঘাড়ে উনষাটের আসল অঙ্ক কত বলতে পারবে?

এক মুহূর্তে উইম জবাব দিয়েছে ৫৭৬, ৪৬০, ৭৫২, ৩০৩, ৪২৩, ৪৮৮।

কির্ক বলেছে- হায় জেসাস, এটা কি সত্যি?

উইম বলেছে–হা তুমি একবার অঙ্কটা কষেই দেখোনা।

তারপর? প্রশ্নোত্তরের পালা এগিয়ে গেছে। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে উইম এক জীবন্ত কিংবদন্তী।

কির্ক ক্যাথেরিনকে তার অফিসে ছেড়ে দিয়েছে। বলেছে- আশা করি, আমাকে তুমি ভুলবে না।

সেই রাতেই কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ফোন করেছিলেন। ক্যাথেরিন ভেবেছিল, কির্ক সম্পর্কে সব কথা বলবে। শেষ মুহূর্তে সে তার মত পরিবর্তন করল। কেন, সে তা নিজেই জানে না!

.

১০.

এথেন্স

ফাদার কনস্ট্যানটিনিউ অবাক হয়ে গেলেন। খবরের কাগজের পাতায় তিনি ফ্রেডারিক স্টাভরসের মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী পড়েছেন। জীবনে অনেক স্বীকারোক্তির সাক্ষী তিনি। ফ্রেডারিক স্টাভরসের নাটকীয় স্বীকারোক্তির যে এমন চরম পরিণতি হতে পারে, তিনি তা ভাবতেও পারেননি!

কী নিয়ে এত চিন্তা করছেন স্যার?

পাশে যে ছেলেটি উলঙ্গ হয়ে শুয়েছিল, সে প্রশ্ন করল।

ফাদার বললেন–না, নানা কারণে মনটা আমার ভালো নেই।

–আমি তো আপনাকে কখনও এমন চিন্তাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখিনি?

জর্জিয়াস একটা ব্যাপারে আমার মনটা খুবই খারাপ।

–কী ব্যাপার, বলবেন কি?

–একজন এসেছিলেন স্বীকারোক্তি দিতে। তারপরেই অটোমোবাইল অ্যাকসিডেন্টে উনি মারা গেছেন।

–এটা এত ভাববার কী আছে? আমাদের সকলকেই তো একদিন চলে যেতে হবে!

কিন্তু, এই মানুষটির অতীত খুব একটা সুবিধার ছিল না।

তার মানে? মাথার গোলমাল ছিল?

–না, উনি এমন একটা গোপন খবর জানিয়েছেন, যার বিরাট ভা, উনি আর বহন করতে পারছিলেন না।

– কী ধরনের গোপন খবর?

পাদরি সাহেব এবার ওই যুবা মানুষটির গায়ে হাত রাখলেন বললেন–বুঝতেই তো পারছ, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি মোটেই আলোচনা করতে পারি না। সেটা ধর্মবিরোধী কাজ হবে।

আমাদের মধ্যে এমন কোনো গোপনীয়তা থাকা উচিত নয়।

–ঠিকই বলেছ তুমি, তবুও...

–তাহলে? ব্যাপারটা তো ওখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত।

না,...পাদরি সাহেব আমতা আমতা করতে থাকেন।

জর্জিয়াস এবার জানতে উৎসুক আমি জানতে চাই সত্যি কী ঘটনা ঘটেছে?

জর্জিয়াস লেটো.এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। এথেন্সের বস্তি অঞ্চলে তার জন্ম হয়েছিল। বারো বছর বয়সে সে পুৰ। গণিকা হয়ে ওঠে। পথে ঘুরে ঘুরে কাজ করত। কয়েক ডলারের জন্য জঘন্য সংযোগে নিজেকে নিয়োগ করত। অনায়াসে চলে যেত ট্যুরিস্টদের ডাকে। হোটেল রুমে। লেটো দেখতে সুন্দর, ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর, সহজাত আকর্ষণ আছে।

ষোলো বছর বয়সে, এক পুরুষবেশ্যা তাকে বলেছিল- আহা, তুমি এমনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো, আমি তোমাকে আয়ের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেব।

লোকটা তার কথা রেখেছিল। সেই মুহূর্ত থেকে জর্জিয়াসের ভাগ্য পালটে গেল। সে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহচর্য দিতে থাকল। এর জন্য তাকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হল। শেষ অব্দি তার সঙ্গে নিকোস ভেরিটোজের দেখা হয়। উনি হলেন স্পাইরস লামব্রো নামে এক বিশিষ্ট বিজনেস টাইফুনের ব্যক্তিগত সহকারী। লেটোর লাইফ আরও পালটে গেল।

নিকোস ওই তরুণটিকে বলেছিল- আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি এইভাবে ঘুরে ঘুরে আর বেশ্যাবৃত্তি করতে পারবে না। তুমি এখন থেকে আমারই থাকবে।

নিকি, আমিও আপনাকে ভালোবাসি।

ভেরিটোজ এই ছেলেটিকে নানা ধরনের উপহার দিতে শুরু করেন। দামি জামাকাপড় কিনে আনেন। তার জন্য একটা ছোটো অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করেন। খরচ করার মতো যথেষ্ট অর্থ তুলে দেন তার হাতে। কিন্তু ছেলেটি সত্যি সত্যি কথা রেখেছে কিনা, তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তিনি জানতে পারলেন, ছেলেটি অন্য জায়গায়তে গিয়ে খুচরো কাজ করছে। ব্যাপারটি তাকে বিব্রত করেছিল।

এই সমস্যা সমাধান করার জন্য একদিন নিকোস বললেন–স্পাইরস লামব্রোর কোম্পানিতে তোমাকে একটা চাকরি দেব।

–এইভাবে আপনি আমায় চোখে চোখে রাখবেন। কী তাই তো?

ব্যাপারটা এভাবে ভেবো না সুইটহার্ট। আমি তোমাকে আমার কাছে চাইছি।

জর্জিয়াস লেটো প্রথমে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। কোম্পানিতে ঢুকে পড়ল সে। মেলরুমে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতে শুরু করল। আবার এই কাজেও দক্ষতা অর্জন করে ফেলল। অতিরিক্ত টাকার আশায় নামি-দামি ক্লায়েন্টদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। এইভাবেই ফাদারের সঙ্গে তার পরিচয়।

.

বিকেল হব হব। জর্জিয়াস লেটো বিছানা ছেড়ে উঠল। তার মনের সমুদ্রে আলোড়ন চলছে। পাদরি সাহেব কোন্ ঘটনাটা তাকে বলতে চাইছে না? জর্জিয়াস বুঝতে পেরেছে,

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিশ্চয়ই এই খবরটা পেলে কিছু টাকা আয় হতে পারে। নিকোস ভেরিটোজের কাছে সব কিছু খুলে বললেই হবে।

মনের ভেতর তার স্বপ্নের উড়ানপাখি। কিন্তু স্বীকারোক্তির অন্তরালে কী আছে?

.

পরের দিন সকালবেলা। লেটো হাঁটতে হাঁটতে স্পাইরস লামব্রোর রিসেপশন অফিসের দিকে এগিয়ে গেল।

ডেস্কের আড়ালে বসে থাকা সেক্রেটারি জানতে চাইলেন–কী ব্যাপার এত সকালে? কোনো ডাক এসেছে নাকি জর্জিয়াস?

জর্জিয়াস মাথা নেড়ে বলল–না ম্যাডাম, মিঃ লামব্রোর সঙ্গে একবার দেখা হবে কি?

মেয়েটি হাসলেন।

– সত্যি বলছ? কী ব্যাপারে দেখা করতে চাইছ? নতুন কোনো ব্যবসার প্রস্তাব নাকি?

মেয়েটি মাঝে মধ্যে জর্জিয়াসের পেছনে লাগতে ভালোবাসেন।

জর্জিয়াস বলল–সেরকম কিছু নয়। আমার মা মৃত্যুশয্যায়, আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

–মিঃ লামব্রোকে আমি চাকরি দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাব। এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। অবশ্য যদি উনি খুব ব্যস্ত থাকেন, তাহলে...

জর্জিয়াস পেছন দিকে হাঁটা দিতে শুরু করল।

একটু দাঁড়াও। আমার মনে হয় তোমার আগমনে উনি মোটেই রাগ করবেন না।

দশ মিনিট কেটে গেছে। জর্জিয়াস এখন স্পাইরস লামব্রোর অফিসে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র সে কখনও পায়নি। তার মনে লেগেছে অজানা উত্তেজনা।

-ঠিক আছে, তোমার মায়ের সংবাদ শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে। তোমার হাতে কিছু টাকা তুলে দেওয়া দরকার, তাই তো?

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার, কিন্তু ঠিক এর জন্য আমি এখানে আসিনি।

লামব্রো ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

–মিঃ লামব্রো, আপনার জন্য কিছু খবর আছে আমার থলিতে। মনে হচ্ছে, খবরটা আপনাকে শোনানো উচিত।

লামব্রোর মুখের ভাব কী হল, জর্জিয়াস সেটা দেখার চেষ্টা করল।

কী খবর? আমি এখন খুবই ব্যস্ত। মনে হচ্ছে তুমি...

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ব্যাপারে।

শব্দগুলো জর্জিয়াস বলেই ফেলল।

–আমার একজন ভালো পাদরি বন্ধু আছেন। তিনি একজনের স্বীকারোক্তি শুনেছেন। এর ঠিক পরে পরেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে গাড়ি দুর্ঘটনাতে। যিনি মারা গেছেন, তার স্বীকারোক্তিটা কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে কেন্দ্র করে। ডেমিরিস একটা মারাত্মক খারাপ কাজ করেছেন। এর জন্য তাকে জেলখানায় বন্দি করা উচিত। তবে যদি আপনি শুনতে না চান...

স্পাইরস লামব্রো এত অব্দি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। ছেলেটা বলছে কী? তিনি বললেন–বসো...তোমার নাম কী?

–লেটো স্যার, জর্জিয়াস লেটো।

–ঠিক আছে, তুমি গল্পটা শুরু থেকে বলো।

·

বিয়েটা খুব একটা ভালো হয়নি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এবং মেলিনার মধ্যে। কোনোরকমে দিন কেটে গেছে। তবে কিছু দিন আগে অব্দি শারীরিক আঘাতের ঘটনা ঘটেনি।

একদিন সেটাও ঘটে গেল। শোনা গেল ডেমিরিস নাকি মেলিনার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সাথে শারীরিকভাবে সংযুক্ত।

তুমি যে-কোনো মেয়েকে বেশ্যা বানিয়ে দাও। তোমার স্পর্শ আমার খারাপ লাগে। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। মেলিনা চিৎকার করে বলেছিলেন।

–চুপ, তোমার মুখখানা বন্ধ করবে কি?

না, তুমি আমাকে চুপ করাতে পারবে না। সারা পৃথিবীর কাছে আমি চিৎকার করে বলব, তোমার আসল চেহারাটা কেমন। আমার ভাই ঠিকই বলেছিল। তুমি একটা নররাক্ষস।

ডেমিরিস এই কথা শুনে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি মেলিনার গালে সজোরে আঘাত করেছিলেন। আহত মেলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

পরবর্তী সপ্তাহে আরও একটা খারাপ ঘটনা ঘটে গেল। তুচ্ছ কারণে ঝগড়া বেধে গেল। সেদিন ডেমিরিস আবার আঘাত করলেন। মেলিনা ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন। অ্যাটিকসের দিকে যাত্রা করলেন এবোপ্লেনের সওয়ার হয়ে। এই ছোট্ট দ্বীপটি তার ভাইয়ের। তিনি ঠিক করেছেন, সেখানে এক সপ্তাহ থাকবেন একা একা এবং বিষণ্ণতার মধ্যে। স্বামীর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হবেন ভেবে তিনি দুঃখিত হলেন। এমনও ভাবলেন, না, আবার স্বামীর কাছেই ফিরে যাই।

এটা হল আমার ভুল সিদ্ধান্ত, মেলিনা ভেবেছিলেন, আমি বোধহয় কোস্টাকে মানিয়ে নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে সে আমাকে আঘাত করার জন্য এ কাজটা করেনি। হয়তো

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মুখ ফসকে খারাপ খারাপ কথা বেরিয়ে গেছে। কোস্টা যদি আমাকে দেখাশোনা না করে তাহলে কী হবে?

মেলিনা এইভাবেই মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত তিনি বিয়েটাকে ভাঙতে চাননি। পরের রোববার মেলিনা বাড়িতে ফিরে এলেন।

তখন ডেমিরিস লাইব্রেরিতে ছিলেন।

মেলিনাকে দেখে তিনি বললেন–তাহলে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসাটাই স্থির করলে?

–এটা আমার বাড়ি কোস্টা, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে একটা কথা পরিষ্কারভাবে শুনে নাও, যদি আবার কখনও আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করো, তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে খুন করে ফেলব।

ডেমিরিস তাকালেন তার স্ত্রীর চোখের দিকে। হ্যাঁ, চোখের ভাষাটা এই কদিনে একেবারে পালটে গেছে।

.

একটু অদ্ভুতভাবে হলেও, তাদের দাম্পত্যজীবন এই ঘটনার পর থেকে খানিকটা হলেও ভালো হল। শেষ পর্যন্ত কনস্ট্যানটিন ঠিক করলেন, না, এইভাবে আর কখনও উদ্ধত আচরণ করবেন না। তবে বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমের ঘটনাগুলো তখনও ঘটে চলেছে। মেলিনা সেগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করছেন না। মেলিনা জানেন, কোন্ কোন মহিলার

সাথে কনস্ট্যানটিনের শারীরিক সম্পর্ক আছে। তবে তখনকার মতো তিনি সব কিছু ভুলতে চেয়েছিলেন। তিনি এই ভেবে নিজের অশান্ত মনকে আশ্বস্ত করলেন যে, স্বামী আমাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে ভালবাসে না।

.

শনিবার বিকেলবেলা, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ডিনার জ্যাকেট পরেছেন। এখুনি বেরিয়ে যাবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মেলিনা ছুটে এলেন।

–তুমি এখন কোথায় চলেছ?

-অ্যামার একটা এনগেজমেন্ট আছে।

–তুমি ভুলে গেছ, স্পাইরসের সাথে আজ আমরা ডিনার খেতে যাব।

–না আমি ভুলিনি, কিন্তু হঠাৎ একটা দরকারি কাজ এসে পড়েছে।

এই কথা শুনে মেলিনা খুবই অবাক হয়ে গেলেন। রাগত স্বরে বললেন আমি জানি, শয়তানের বাচ্চা, তুমি তোমার এক রক্ষিতার সাথে ফুর্তি লুটতে যাচ্ছ তো?

–আবার বলছি, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। নিজের আচরণটা কেমন, তা কি একবার ভেবে দেখেছ মেলিনা?

ডেমিরিস আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন।

-না, আমি তোমাকে স্পাইরসকে অপমান করতে দেব না। আমরা দুজনেই আজকে বাড়িতে থাকব।

কিন্তু স্বামীকে আটকাবেন কী করে? একটি মাত্র অস্ত্র তখনও মেলিনার হাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সেই অস্ত্রটা প্রয়োগ করলেন। যদিও সেটা কার্যকরী হবে কি না, তা তিনি জানতেন না।

মলিনা আবার বললেন–আজ রাতে আমাদের দুজনেরই বাড়িতে থাকা উচিত।

ডেমিরিস উদাসীনভাবে জানতে চাইলেন কেন?

-তুমি জানো না আজকের রাতটা কেন স্মরণীয়?

না।

–এই রাতেই আমি তোমার পুত্রকে হত্যা করেছিলাম কোস্টা। বলতে পারো আজ সেই মর্মান্তিক ঘটনার বর্ষপূর্তি উৎসব। এই রাতেই আমি গর্ভপাত করাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কথাগুলো বিষ তীর হয়ে আঘাত করেছে ডেমিরিসকে। মনে হল তিনি যেন বজ্রাহত। এর আগে কোনোদিন মেলিনা স্বামীকে এইভাবে ভেঙে পড়তে দেখেননি।

–আমিই ডাক্তারকে বলেছিলাম অপারেশনটা এমনভাবে করতে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও তোমার সন্তানের গর্ভ, আমাকে ধারণ করতে না হয়।

মেলিনা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বললেন।

এবার ডেমিরিস তার আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন। বুনো শয়তানের মতো তিনি ছুটে এলেন। বারবার মেলিনাকে আঘাত করতে থাকলেন। দেহের সর্বত্র।

মেলিনা আর্তনাদ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে হলের দিকে নেমে গেলেন। বুনো শুয়োরের মতো কনস্ট্যানটিন তাকে অনুসরণ করলেন। চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে ঠুকে দিলেন।

চাপা গর্জন করে উঠলেন–এর জন্য তোমাকে আমি খুন করে ফেলব, শয়তানি হতভাগী! মেলিনা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন, সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে।

অনেকক্ষণ তিনি পড়েছিলেন, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে আমার হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে!

ডেমিরিস কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়ালেন, বললেন আমি একজন ঝি-কে বলছি ডাক্তার ডেকে আনতে। তোর জন্য আমি আমার সন্ধ্যেটা নষ্ট করব না।

.

নৈশভোজের আগে টেলিফোন আর্তনাদ করে উঠল।

মিঃ লামব্রো, আমি ডঃ মেটাক্সিস বলছি। আপনার বোন আপনাকে ফোন করতে বলেছেন। তিনি আমাদের প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আমার মনে হচ্ছে, ওঁর বোধহয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে...

স্পাইরস লামব্রো মেলিনার হাসপাতালের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। মেলিনার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মেলিনার একটা হাত ভেঙে গেছে। সমস্ত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখ ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে।

স্পাইরস লামব্রো বললেন কনস্ট্যানটিন! রাগে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিল।

মেলিনার চোখে জল।

–ইচ্ছে করে ও কিন্তু আমাকে আঘাত করেনি। ফিসফিস করে মেলিনা বললেন।

–আমি শপথ নিচ্ছি, লোকটাকে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব। এটাই আমার শেষ শপথ।

স্পাইরস লামব্রোকে এতটা রাগ করতে কেউ কখনও দেখেনি। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কার্যকলাপ সহ্যের বাইরে চলে গেছে। কীভাবে তাকে নিবৃত্ত করা যায়? অনেকগুলো পন্থা আছে। চোখ বন্ধ করে স্পাইরস ভাববার চেষ্টা করলেন। কারোর সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু কার কাছে যাওয়া যায়? একটাই নাম মনে পড়ল, মাদাম পিরিস। ভদ্রমহিলা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। ওঁর কাছে গিয়ে একটা পরামর্শ নিতে হবে।

লামব্রো ভাবতে থাকেন, বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, শেষ পর্যন্ত আমি এক জ্যোতিষী মহিলার শরণাপন্ন হয়েছি। অবশ্য মাদাম পিরিস আমার জীবনে অনেকগুলো শুভ ঘটনার সাক্ষী। ওঁর কিছু আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। এখন আমি ওঁর কাছেই সাহায্য চাইব।

কাফের আলো-আঁধারির মধ্যে এক কোণে মাদাম বসে আছেন। কয়েক বছরে বয়েসটা তাঁর অনেক বেড়ে গেছে।

-মাদাম পিরিস, আমি আপনার সাহায্য চাইছি। মিঃ লামব্রো বললেন।

মাদাম পিরিস জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

–কীভাবে শুরু করা যায়? দেড় বছর আগে একটা খুনের মামলা শুরু হয়েছিল। ক্যাথেরিন ডগলাস নামে এক ভদ্রমহিলা...।

মাদাম পিরিসের মুখ চোখ পালটে গেছে। উনি জোর গলায় বললেন–না!

স্পাইরস লামব্রো তাকিয়ে থাকলেন ওঁর মুখের দিকে–ভদ্রমহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল!...

মাদাম পিরিস উঠে দাঁড়ালেন–না, উনি এখনও বেঁচে আছেন।

স্পাইরস লামব্রো অবাক হয়ে গেছেন ওঁর তো মরে যাবার কথা। ওঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

-না, উনি বেঁচে আছেন।

-মাদাম পিরিসের এই কথাগুলো শুনে স্পাইরস অবাক হয়ে গেছেন–এটা হতে পারে না!

উনি এখানে এসেছিলেন। কয়েকমাস আগে। কেউ বা কারা ওঁকে একটা কনভেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শব্দগুলো অচেনা অজানা ঠেকছে স্পাইরসের কাছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলছেন। –কেউ বা কারা ওঁকে কনভেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিল?– এটা ডেমিরিসির একটা প্রিয় খেলা, আওয়ানানি কনভেন্টে উনি মাঝে মাঝে কিছু অর্থ দান করে থাকেন। এই শহরেই ক্যাথেরিন ডগলাসকে হত্যা করা হয়েছে। অন্তত যতদূর খবর আছে তার কাছে। জর্জিয়াস লেটোর কাছ থেকে সেই খবরটা স্পাইরস পেয়েছিলেন। কিন্তু? ডেমিরিস দুজন মানুষকে পাঠিয়েছিলেন ক্যাথেরিনকে হত্যা করার জন্য। ব্যাপারটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

লামব্রো ভাবতেই পারছেন না, এবার কী করবেন! হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তার।

তখনই মনে পড়ে গেল আর একটি নাম–টনি রিজোলি!

সমস্যার পাহাড়

১১.

টনি রিজোলির সমস্যার পাহাড় ক্রমশ উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে, যার জন্য তাঁকে দোষারোপ করা যায় না।

অনেক ঘটনাই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্যবসাটা আর আগের মতো তেজি অবস্থায় নেই। এথেন্স অবধি মাল আনাটা কোনো সমস্যা নয়। ওয়ারহাউসের মধ্যে সেগুলোকে জমিয়ে রাখা যায়। ইতিমধ্যে টনি বুদ্ধি করে এয়ারলাইন্সের একজন স্টুয়ার্টকে কিনে নিয়েছেন। এথেন্স থেকে নিউইয়র্ক অবধি আকাশ পথে মালের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। দেখা গেল চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওই লোকটা ধরা পড়ে গেছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে।

সংবাদটা শুনে টনি রিজোলির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। এত ডলারের মাল কি তবে পচে যাবে নাকি! নাঃ, বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দিলে কেমন হয়? সত্তর বছর বয়সের একজন ট্যুরিস্ট, নাম সারা মার্চিসন, এথেন্সে এসেছিলেন তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। একটা সুটকেস নিয়ে তিনি নিউইয়র্কে চলে যাবেন। তিনি জানতেই পারবেন না, এই সুটকেসের মধ্যে কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

–আমি আমার মায়ের জন্য কতকগুলি স্যুভেনির পাঠাতে চাই। মিঃ রিজোলি বলেছিলেন–আপনাকে দেখে মনে হল, এই কাজের জন্য আপনি উপযুক্ত। আমি আপনার টিকিটের দাম দিয়ে দেব।

সারা মার্চিসন বলেছিলেন-না না, এর জন্য কিছুই দিতে হবে না। আপনার জন্য এই কাজটা করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করব। আপনার মায়ের অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই আমি থাকি। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।

–আমার মনে হয়, তিনিও আপনাকে দেখে খুশি হবেন। টনি রিজোলি বলেছিলেন, সমস্যা হল, উনি অত্যন্ত অসুস্থ। এই সুটকেসটা ওঁর কাছে পৌঁছোতে হবে।

-আহা, সারাকে দেখে মনে হয়, এমন ভালো ভদ্রমহিলা সহজে দেখা যায় না। তিনি আমেরিকার গড়পরতা ঠাকুমাদের মতো স্নেহপ্রবণ। কিন্তু ওঁর কাঁধে এমন একটা দায়িত্ব। চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত?

–আমি আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব।

ঠিক আছে, এত চিন্তা করতে হবে না। আপনার মতো এমন সুসন্তানের জননী হয়ে মা নিশ্চয়ই খুবই অহংকার বোধ করেন।

–হ্যাঁ,...যা বলেছেন।

উনি মিথ্যে করে বললেন, সত্যিটা হল দশ বছর আগে তার মা পৃথিবী থেকে চলে গেছেন।

***

পরদিন সকালবেলা রিজোলি হোটেল থেকে বেরোতে যাবেন, ওয়ারহাউস অভিমুখে যাত্রা করবেন, টেলিফোন আর্তনাদ করতে থাকে।

মিঃ রিজোলি? একটা অচেনা কণ্ঠস্বর।

–কে বলছেন?

–এথেন্স হাসপাতাল থেকে ডক্টর পাটসাকা বলছি। এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে। শ্রীমতী সারা মার্চিসন নামে একজন এখানে এসে ভর্তি হয়েছেন। গতরাতে তিনি হঠাৎ পড়ে গেছেন। কোমর ভেঙে গেছে। তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। এই খবরটা আপনাকে জানাতে বললেন।...টনি রিজোলির মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল। এখন কী করা যায়? আরেকটা জীবন্ত খচ্চরের সন্ধান করতে হবে।

রিজোলি জানেন, কাজটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। আমেরিকান নারকোটিক্স বাহিনী সজাগ হয়ে উঠেছে। তবে এথেন্সের আশেপাশে হয়তো কোনো সরল সাদা মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে। কীভাবে? এথেন্স থেকে যেসব প্লেন উড়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক যাত্রীদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। জাহাজের যাত্রীদেরও ছাড়া হচ্ছে না।

–তাহলে? কী হবে? যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশের কাছে কোনো ভাবে খবর পৌঁছে যায়। বিশ্বাসঘাতকের তো অভাব নেই। ওয়ারহাউসে তল্লাশ চালালেই হল। এমন অনেক নিষিদ্ধ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। সমস্যা বাড়ছে, পরিবারের সকলের কাছে ঘটনাটা বলবে না কি...

টনি রিজোলি হোটেল পরিত্যাগ করলেন। তাকে খুব তাড়াতাড়ি অন্য একটা জীবন্ত খচ্চর খুঁজে পেতেই হবে। প্যাটিসন স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চলে এলেন। তিনি জানেন না, তাঁর হোটেলের ফোন ইতিমধ্যেই সন্দেহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কিনা। তিনি কোনো বিপদের সামনাসামনি দাঁড়াতে চাইলেন না।

৮৫নং প্যাটিসন, একটা বাদামি পাথরের বাড়ি। সামনে অনেকগুলো পিলার দাঁড়িয়ে আছে। লেখা আছে? ও টি ই। রিজোলি ভেতরে ঢুকে পড়লেন, চারপাশে তাকালেন। দেওয়ালের ধারে চব্বিশটি টেলিফোন বুথ। প্রত্যেকটাতে আলাদা নম্বর দেওয়া। টেলিফোন ডাইরেক্টরি রয়েছে তাকে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সেগুলোকে আনা হয়েছে। চারজন ক্লার্ক বসে বসে কাজ করছেন। কখন কোথায় কাকে ফোন করতে হবে, সবকিছু তাদের নখদর্পণে।

মানুষজন উদগ্রীব চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

টনি ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন–সুপ্রভাত।

কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব? একটা ওভারসিজ কল বুক করবেন কি?

আপনাকে অন্তত ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু।

–ঠিক আছে, আমার কোনো সমস্যা নেই ম্যাডাম। আমি অপেক্ষা করছি।

আপনি কি সংখ্যাটা আমাকে দেবেন?

টনি রিজোলি ইতস্তত করতে থাকেন। তারপর ভদ্রমহিলার হাতে একটা চিরকূট দিয়ে বলেন–আপনি চেষ্টা করে দেখবেন?

–আপনার নাম?

–ব্রাউন, টম ব্রাউন।

–ঠিক আছে মিঃ ব্রাউন, আপনার পালা এলে আপনাকে ডেকে নেব।

অনেক ধন্যবাদ।

রিজোলি বেঞ্চে গিয়ে বসলেন।

কীভাবে পাঠানো যেতে পারে? অটোমোবাইলের ভেতর কি প্যাকেটটাকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে? কেউ একজন গাড়িটাকে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাবে। তাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হবে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। গাড়িগুলোকে ভীষণভাবে তল্লাশি করা হচ্ছে।

–মিঃ ব্রাউন! মিঃ টম ব্রাউন!

নামটা দুবার বলা হল।

রিজোলি বুঝতে পারলেন, নামটা তাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ডেস্কের দিকে এগিয়ে এলেন।

–যাকে আপনি ফোন করেছিলেন উনি সাড়া দিচ্ছেন। সাত নম্বর বুথে চলে যান।

-অনেক ধন্যবাদ, আমি কি ওই কাগজের টুকরোটা ফেরত পেতে পারি। নাম্বারটা আমি কেবলই ভুলে যাই।

–হ্যাঁ, কেন পাবেন না?

ভদ্রমহিলা কাগজের চিরকূটটা রিজোলির হাতে তুলে দিলেন।

টনি ৭নং বুথের কাছে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

-হ্যালো।

টনি তুমি কথা বলছ?

–স্পিট, তুই কেমন আছিস?

সত্যি কথা বলতে কি, মোটেই ভালো নেই। টনি, কাজকর্ম আর ভালোভাবে এগোচ্ছে না।

–আমারও ওই একই সমস্যা হয়েছে।

–প্যাকেটটা কি পাঠাতে পেরেছ?

–না, সেটা এখনও এখানে আছে।

এক মিনিটের নীরবতা। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে মনে হচ্ছে।

–অত চিন্তা করার কিছু নেই। আমি অন্য কোনো উপায় বের করবার চেষ্টা করছি।

দশ মিলিয়ন ডলার ব্যাপারটা কি খুব সহজ?

–চিন্তা করিস না, আমি দেখছি, সমস্যাটার সমাধান করব।

–চেষ্টা কর টনি, অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

.

ধূসর রঙের স্যুট পরা একজন টনি রিজোলির ওপর কঠিন কঠোর নজর রেখেছিলেন। টনি সেখান থেকে চলে আবার সঙ্গে সঙ্গে উনি ওই ভদ্রমহিলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

–যে মানুষটা এখুনি বেরিয়ে গেলেন তার সম্বন্ধে কিছু খবর দেবেন কী?

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন–কী?

–আমি জানতে চাইছি উনি কোন নম্বর চেয়েছিলেন?

–আমি দুঃখিত, এইভাবে আমরা কাউকে নম্বর দিই না।

ভদ্রলোক তার পেছনের পকেট থেকে একটা ওয়লেট বের করলেন। পরিচয়পত্র সেখানে ছিল। উনি বললেন, আমি পুলিশের তরফ থেকে আসছি, আমি হলাম ইন্সপেক্টর টিন্যু।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার মনোভাব পালটে গেল। তিনি নাম্বারটা লিখে একটা কাগজের টুকরো ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিলেন।

–আপনারা তো সব রেকর্ডের একটা কপি রাখেন, তাই নয় কি?

–হ্যাঁ, তা তো রাখতেই হয়।

–আপনি কি নম্বরটা সেখান থেকে আমাকে দেবেন।

–ঠিক আছে।

নাম্বারটা লিখে ভদ্রমহিলা ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন। ইন্সপেক্টর তাকিয়ে দেখলেন। : দেশের কোড নম্বর ৩৯। এক্সচেঞ্জের ৯১। ইটালি। পালেরমো।

-ধন্যবাদ, ভবিষ্যতে দরকার পড়লে লোকটাকে শনাক্ত করতে পারবেন তো?

–হ্যাঁ, উনি হলেন ব্রাউন, টম ব্রাউন।

টেলিফোনের কথাবার্তা টনি রিজোলিকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তিনি বাথরুমে গেলেন। কী হবে? শেষ পর্যন্ত কাজটা ভালোভাবে হবে তো? নাকি সব কিছু বেচতে হবে।

চারজন মানুষ কনফারেন্স টেবিলে বসে আছেন পালেরমো অফিসে।

–পিট, মনে হচ্ছে এখনই এতটা চিন্তা করার কিছু নেই। সমস্যাটা কী হয়েছে?

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। টনি রিজোলির দিক থেকে সমস্যা আসতে পারে।

এর আগে তো কখনও টনির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি।

–আমি জানি। কোনো কোনো সময় মানুষ আরও লোভী হয়ে ওঠে। এখন অন্য কোনো এজেন্টের সন্ধান করতে হবে।

না, আমি টনিকে এখনও বিশ্বাস করি।

.

১০ নং স্টাডিও স্ট্রিট। পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ডাউনটাউন, এথেন্স। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলেছে। পুলিশ প্রধান লাইভেরি ডিমিট্রি হাজির আছেন। ইন্সপেক্টর টিন্যুকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকান লেফটেন্যান্ট ওয়াল্ট কেলিও হাজির হয়েছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের কাস্টমস্ ডিভিশনের অন্যতম অফিসার।

কেলি বললেন–আমি জানি এখানে একটা মস্তবড় ড্রাগ পাচার চক্র সক্রিয়। এথেন্স থেকে যে-সমস্ত জাহাজগুলো বাইরে যায়, তাদের অধিকাংশ নিষিদ্ধ ড্রাগ বহন করে। সেই ব্যবসাটার সঙ্গে টনি রিজোলি যুক্ত।

ইন্সপেক্টর টিন্যু চুপ করে বসেছিলেন। গ্রিস পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বাইরের দেশের মানুষকে নাক গলাতে দেয় না। কিন্তু এখন তারা অসহায়। সত্যিই তো, ড্রাগ পাচারের সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না। আমেরিকানরা উন্নাসিক। তারা সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্ব ফলাও করার চেষ্টা করেন।

পুলিশপ্রধান বললেন–আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি লেফটেন্যান্ট। টনি রিজোলি পালেরমোতে কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন করেছিলেন। আমরা নাম্বারটা বের করে ফেলেছি। সমস্ত সোর্স কাজে লাগানো হয়েছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। ডিমিট্রি এবং ইন্সপেক্টর টিন্যু পরস্পরের দিকে তাকালেন।

ইন্সপেক্টর টিন্যু ফোনটা তুললেন–সেটা কি পাওয়া গেছে?

তিনি কী একটা শুনলেন। তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

–সবকিছু ঠিক আছে?

নাম্বারটা পাওয়া গেছে।

–আর?

–একটা পাবলিক টেলিফোন বুথে ফোন করা হয়েছে। টাউন স্কোয়ারে।

তার মানে?

মিঃ রিজোলি সংক্রান্ত যে-কোনো খবর আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াল্ট কেলি অধৈর্য হয়ে বললেন–আমি গ্রিক ভাষাটা বুঝতে পারছি না।

–স্যরি লেফটেন্যান্ট, আমরা বলতে চাইছি রিজোলি লোকটা মারাত্মক।

কেলি বললেন ওর ওপর আরও বেশি নজরদারি রাখুন।

ডিমিট্রি ইন্সপেক্টর টিন্যু-র দিকে তাকালেন। –ঠিক আছে, তোমার দেওয়া তথ্যটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

-স্যার, আমি এখনও বলছি, এর মাথা হল রিজোলি, তাকে একবার ধরতেই হবে।

পুলিশপ্রধান ডেমিট্রি ওয়াল্ট কেলির দিকে তাকিয়ে বললেন–ঠিক আছে, কিছু চিন্তা করবেন না। আসলে ওকে ধরার মতো উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

কিন্তু রিজোলি?

–, আমাদের নিজস্ব সোর্স আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে, মিঃ কেলি। ভাববার কোনো কারণ নেই। যদি আপনি আর কোনো তথ্য দিতে পারেন তাহলে খুশি হব।

ওয়াল্ট কেলি পুলিশপ্রধানের দিকে তাকালেন, হতাশ এবং বিরক্তিকর ছাপ তার চাউনিতে।

–আমরা কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারব না। মনে রাখবেন, জাহাজটা যে কোনো মুহূর্তে বন্দর ছেড়ে চলে যাবে।

.

রফিনা ভিলা। রিয়েলটর কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে বললেন মনে হচ্ছে কাজটা শেষ হয়ে গেছে। আমার কিন্তু কিছু নতুন ফার্নিচার আনাতে হবে।

না, আমি সবকিছু ঠিক আগের মতোই চাই।

নোয়েলে এবং তার প্রেমিক ল্যারি, এরা দুজন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নেমেছিল। ডেমিরিস লিভিং রুমে এগিয়ে গেলেন। আহা, এখানেই কি নারী-পুরুষ একে অন্যকে ভালোবাসতো? নাকি কিচেনে? ডেমিরিস বেডরুমে গেলেন। বিশাল একটা বিছানা, শূন্য, একদিকে পড়ে আছে। এই বিছানাতে কত সঙ্গম দৃশ্যের অভিনয় অভিনীত হয়েছে। ডগলাস নোয়েলেকে দেখেছেন, তার উলঙ্গ দেহ, যে দেহটা ডেমিরিস নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন। ডগলাসকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দাম দিতে হয়েছে। আবারও কাউকে হয়ত দাম দিতে হবে। ডেমিরিস শূন্য চোখে বিছানার দিকে তাকালেন। ...আমি এখানে ক্যাথেরিনকে নিয়ে আসব। তার নগ্ন দেহটাকে ভালোভাবে দেখব। ডেমিরিস ভাবলেন তারপর অন্যান্য ঘরে গেলেন। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি ক্যাথেরিনকে ফোন করলেন।

-হ্যালো।

–আজ কেন জানি না সকাল থেকে আপনার কথা খুব মনে পড়ছে।

.

সিসিলি থেকে দুজন অপরিচিত আগন্তুক এসেছেন টনি রিজোলির সঙ্গে দেখা করতে। তারা হোটেলের ঘরে বসে আছেন। রিজোলি বিপদের গন্ধ পেয়েছেন।

দুজনের আলফ্রেডো একজন, চেহারাটা বিরাট, জিনো লাভেরি তার চেয়েও বড়ো আকারের।

আলফ্রেডো বললেন–পেটে লুক্কা আমাদের পাঠিয়েছেন।

রিজোলি নিজের উদ্বেগ চেপে রাখার চেষ্টা করলেন- খুব ভালো এথেন্স শহর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। বলুন, আপনাদের জন্য আমি কী করতে পারি?

–রিজোলি, আপনি সমস্যাটার সমাধান করতে পারেন। আমরা জানি, আপনি কী ধরনের মানুষ, কিন্তু কোথায় সমস্যা তা বলবেন কী?

–হ্যাঁ, ছোট্ট একটা সমস্যা।

আমাদের কোনো সাহায্য লাগবে?

–এক মিনিট অপেক্ষা করুন। রিজোলি বললেন, মনে হচ্ছে এখন প্যাকেটটা নিরাপদ জায়গাতেই আছে।

–পেটে ব্যাপারটার ওপর নজর রাখতে বলেছেন। এই ব্যাপারে উনি অনেক টাকা ঢেলেছেন তো।

লাভেরি রিজোলির দিকে এগিয়ে এলেন। তাকে চেয়ারে বসে থাকতে বাধ্য করলেন। তিনি বললেন–আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। রিজোলি, বুঝতেই তো পারছেন, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পেটে কিন্তু খুবই রেগে গেছেন। চড়া সুদে তাকে টাকা ধার করতে হয়েছে। আশা করি, আমার কথার অর্থ আপনি বুঝতে পারছেন?

রিজোলি ভাবলেন, আমি এই দুটো জীবন্ত গরিলার সাথে লড়াই করে পারব তো? নাকি এখন পেটে লুক্কার কথাই শুনতে হবে।

হ্যাঁ, আপনাদের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। রিজোলি নিজেকে আশ্বস্ত করার সুরে বলে উঠলেন–কিন্তু ব্যাপারটা তো এত সহজে সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। গ্রিক পুলিশ সর্বত্র কড়া নজর রেখেছে। ওয়াশিংটন ডিভিশন থেকেও একজন অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। আমি অন্য একটা পরিকল্পনার কথা ভাবছি।

লাভেরি বললেন–পেটেও তাই বলেছেন। ওই পরিকল্পনাটা আমাদের কাছে খুলে বলবেন কী? যে করেই হোক আগামী সপ্তাহের মধ্যে মালটা পাচার করতেই হবে।

রিজোলি বললেন–এত তাড়াতাড়ি কী করে হবে?

–এটাই পেটের নির্দেশ। যদি আপনি কাজটা করতে রাজি না থাকেন, তাহলে আমরা অন্য কোনো এজেন্টের সন্ধান করব।

অন্য এজেন্ট? তার মানে আমার সাম্রাজ্য ভেঙে যাবে? টনি রিজোলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–না, সব কিছু শান্ত হয়ে যাবে। আমাকে আরেকটু সময় দিন।

-ঠিক আছে, দেখা যাবে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হল।

.

টনি রিজোলি কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেন। তিনি দুপুরের আগে পান করতে ভালোবাসেন না। দুজন লোক চলে গেলে, তিনি স্কচের বোতল খুললেন। বেশ খানিকটা গিলে ফেললেন। আঃ, সমস্ত শরীরে একটা আদরণীয় উষ্ণতা, কিন্তু কে আমাকে সাহায্য করবে? টনি ভাবলেন, কোনো বৃদ্ধ মানুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কি? মাত্র এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আরেকটা খচ্চর? এখুনি একবার ক্যাসিনোতে যেতে হবে। সেখানে গেলে অনেক বোকা খচ্চরের সন্ধান পাওয়া যাবে।

***

রাত দশটা বেজেছে, রিজোলি এথেন্সের পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটি ক্যাসিনোর দিকে ছুটে চলেছেন, অবশ্যই গাড়িতে। ক্যাসিনোতে পৌঁছে দেখলেন সকলেই খেলতে ব্যস্ত। অনেকে হারতে ভালোবাসেন, অনেকে উত্তেজনার বশে এখানে ছুটে আসেন, কাকে চিহ্নিত করা যায়?

রিজোলি একটা গোলটেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা লোকের দিকে তার নজর পড়ে গেল। পাখির মতো চেহারা তার। ধূসর চুল। বয়স মধ্য পঞ্চাশ। মাথা মুছছেন রুমাল দিয়ে। বার বার ভাবছেন, ঘাম হচ্ছে সমস্ত শরীর থেকে।

রিজোলির চোখে বিদ্যুতের দ্যুতি। তিনি আরও ভালোভাবে তাকিয়ে থাকলেন। এই অভিব্যক্তি তার খুবই চেনা। এরা হলেন সেই বোকা গ্যাম্বলারের দল, যারা সাধ্যের অতিরিক্ত খেলতে ভালোবাসেন।

শেষ সম্বলটাও বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল। রিজোলি বললেন–কী? আরেকটু খেলবেন নাকি? আমি সাহায্য করতে পারি।

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে রিজোলির দিকে তাকিয়ে রইল। আবার কপালের ঘাম মুছলেন।

–ঠিক আছে এই শেষ বারের মতো, কেমন?

টনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটা তার পাশের সীটে বসে পড়লেন। এককথায় তিনিই লোকটাকে খেলার আসরে ফিরিয়ে আনলেন। রিজোলি এই খেলার হালহকিকৎ সবই জানেন। তিনি জানেন, কীভাবে জিততে হয়। পরাজয় শব্দটাকে তিনি ঘৃণা করেন। লোকটাকে জেতার রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে পারব কি? রিজোলি ভাবলেন।

শেষ টাকাটাও বোধহয় চলে গেল। আহা, আগন্তুক এখানে বসে আছেন, ভাবলেশ হীন বুকে।

–আরেকটু সাহায্য করব?

এবার লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–না, অনেক হয়েছে।

টনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রিজোলি একই সময় উঠে দাঁড়ালেন।

-খুবই খারাপ, ভাগ্যটা বোধহয় আজ আপনাকে সাহায্য করছে না। আসুন, আপনাকে এক পাত্র মাল খাওয়াই।

লোকটার চোখে কৌতুক আভা। কণ্ঠস্বর ঘ্যাসঘেসে।

–স্যার, তাহলে অশেষ অনুগ্রহ হবে স্যার।

স্যার, তাহলে, আমি আমার খচ্চরকে পেয়ে গেছি! রিজোলি ভাবলেন। লোকটার হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে, উনি কপর্দকশূন্য। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। সেই স্বপ্নকে সফল করতে পারেন না। ওঁর টাকার প্রয়োজন। তাহলে? ওই প্যাকেটটা উনি যদি নিউইয়র্কে পৌঁছে দেন। তাহলে একশো ডলার দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াতের টিকিট। আর কী চাই?

–আমার নাম টনি রিজোলি।

–আমি ভিক্টর।

–আপনার কাছে এখন কত আছে?

–না না, আমি একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছি।

টনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এরজন্য চিন্তা করছেন কেন? মনে হয় ভগবান ঠিক সময় আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

রিজোলি ওয়েটারকে বললেন রিগ্যাল নিয়ে এসে তো ভাই।

আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

লোকটা জানতে চাইলেন।

রিজোলি হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। এটা খুব সুন্দর জায়গা।

লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। তবে এখানে থাকাটা খুবই খরচের। যদি আপনার হাতে অনেক টাকা না থাকে, তাহলে মনের মতো ফুর্তি করতে । পারবেন না। বিশেষ করে সঙ্গে যখন স্ত্রী আর চার চারটি ছেলে মেয়ে।

ভিক্টরের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা। আরও ভালো আরও ভালো, রিজোলি মনে মনে আনন্দিত। হয়ে উঠলেন।

–আপনি কী করেন ভিক্টর?

–আমি এথেন্স স্টেট মিউজিয়ামের কিউরেটার।

–বাঃ, আপনি একজন কিউরেটার? আপনাকে কী কাজ করতে হয়?

বিভিন্ন জায়গা থেকে যে-সমস্ত দুষ্প্রাপ্য স্মারকগুলি আসে সেগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করতে হয়। মদের পাত্রে এক চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বলতে থাকেন, আমাদের বেশ

কয়েকটা যাদুঘর আছে। অ্যাক্রোপলিশ আছে, ন্যাশনাল আর্কোলজিক্যাল মিউজিয়াম আছে। প্রত্যেকটা মিউজিয়ামেই নামি দামি জিনিসপত্র থাকে।

টনি রিজোলি ব্যাপারটাতে আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

–কী রকম দাম হতে পারে?

–দাম? অমূল্য বললে বোধহয় কম বলা হবে। জানেন তো, এইসব স্মারক বস্তুগুলোকে আমরা দেশের বাইরে পাঠাতে পারি না। তাই সতর্ক নজর রাখতে হয়। মিউজিয়ামে ছোটো ছোটো দোকান আছে, সেখানে অবিকৃত প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

রিজোলির মাথা কাজ করতে শুরু করেছে।

–এই কপিগুলো কি একেবারে আসলের মতো দেখতে?

-হ্যাঁ, চট করে দেখলে তফাতটা বুঝতেই পারবেন না। অভিজ্ঞ চোখ হয়তো বলতে পারবে কোনটা নকল আর কোনটা আসল।

–আমি আপনাকে আরেকটু মদ দেব কী? রিজোলি জানতে চাইলেন।

–অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে দেখে আমার কী যে ভালো লাগছে! আমি কি এই সাহায্যের প্রতিদান দিতে পারব?

রিজোলি হাসলেন–তার জন্য অত চিন্তা করছেন কেন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। এখন বলুন তো, আমি কবে আপনার মিউজিয়াম দেখতে যাব? আপনার কথা শুনে আমি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছি।

–আসবেন, আসবেন, অবশ্যই আসবেন! এই মিউজিয়ামটিকে আমরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা যাদুঘর বলতে পারি। আপনার সেবা করতে পারলে খুব খুশি হব। বলুন আপনি কখন ফাঁকা থাকেন?

কাল সকালে একবার গেলে কেমন হয়?

টনি রিজোলির মনে হল, এই ভদ্রলোকটাকে শুধু একটা খচ্চর বলে ভাবলে হবে না, এর ওপর টাকা লগ্নি করা যেতে পারে। সুদে-আসলে সেই টাকা একদিন টনির পকেটে ফিরে আসবে–এ ব্যাপারে তিনি একশো ভাগ নিশ্চিত।

.

এথেন্সের স্টেট মিউজিয়াম দাঁড়িয়ে আছে প্লাটিয়া সাইনটাগমাতে। শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, অসাধারণ সুন্দর একটি বাড়ির মধ্যে। বাড়িটিকে দেখলে মনে হয় বুঝি হারানো দিনের এক উপাসনালয়। চারটি আইওনিয়ান কলাম আছে সামনে। মাথায় উড়ছে গ্রিকদেশের জাতীয় পতাকা। সর্বোচ্চ তলের ওপর চারটি সুন্দর ভাস্কর্য।

ভেতরে একটির পর একটি মার্বেল হল। গ্রিক ইতিহাসের নানা স্মারক চিহ্নে ভরপুর। আছে হারানো দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু। সোনার কাপ, সোনার ক্রাউন, সুন্দর করে সাজানো তরবারি, আরও কত কী!

ভিক্টর টনি রিজোলিকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকটা বস্তুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল কোষ্টা কী তা জানতে উনি খুবই উদগ্রীব।

ভিক্টর একটি মূর্তি দেখিয়ে বললেন–এটা হল আফিমের দেবীর মূর্তি। তারপর– ফিসফিসানো কণ্ঠস্বরে বললেন, এই দেবীকে আমরা নিদ্রার দেবী বলে থাকি। অনেকে আবার এঁকে মৃত্যুর দেবতাও বলে থাকেন।

কত দাম হবে এটার?

–এটা বিক্রির জন্য নয়। অনেক লক্ষ মিলিয়ন ডলার।

–সত্যি?

কিউরেটারের চোখে আনন্দের পরিস্ফুরন। –আহা, টাকা দিয়ে কি এদের হিসেবনিকেশ হয়? তিনি বলে চলেছেন

৫৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের এই স্মারকটি। এটি হল করেনথিয়ান হেলমেট, ১৪৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এটি পাওয়া গিয়েছিল। এর দাম কত বুঝতেই পারছেন? এটি পাওয়া গিয়েছে আরাকাপলিস থেকে, ষষ্ঠদশ শতাব্দী আগমাশেননের কোষাগারে ছিল।

–ভীষণ অবাক লাগছে আমার। শহরের মধ্যে এমন একটা সুন্দর মিউজিয়াম আছে, অথচ আমি এতদিন খবর রাখিনি!

-হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই আশ্চর্যের। কথাবার্তা এগিয়ে চলেছে। কী করে লোকটিকে ফাঁদে ফেলা যায়? টনি ভাবতে থাকলেন। চারপাশে আছে মহার্ঘ বস্তু। কিন্তু কোনো কিছুতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। কী হবে? ভিক্টর এবং টনির মধ্যে কথাবার্তা এগিয়ে চলেছে।

মিউজিয়াম থেকে টনি বাইরে এলেন। তখন তাঁর মাথায় অনেক স্বপ্নের ভূত। একটু বুদ্ধি করলে ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরতে পারে। তিনি সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন। খচ্চরের অনুসন্ধান করছিলেন, তার বদলে গুপ্তধনের চাবিকাঠি এখন তার পকেটে। হেরোইনের ব্যবসা করে তিনি কত টাকা লাভ করেন? নানা দিকে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি। পুলিশের লাল চোখ। মস্তানের উৎপাত। এখন যদি ব্যবসার ধারাটা পালটানো যায় তাহলে কেমন হয়? গ্রিস দেশে প্রাচীন বস্তুর অভাব নেই। দু-চারটিকে বাইরে পাচার করলে অনেক টাকা আসবে। রিজোলি মনে মনে ভাবতে থাকেন। এখন কী করব? ওই খচ্চরটার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। মনে হচ্ছে টাকা দেখালে লোকটার মত পরিবর্তিত হতে পারে।

.

সেদিন বিকেলবেলা রিজোলি তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে মসট্রভ আথেনাতে গেলেন। এটি শহরের এক বিখ্যাত নাইট ক্লাব। সুন্দরী মহিলারা খদ্দেরদের সেবা করে থাকে। রিজোলি বলেছিলেন- যখন এথেন্সে এসেইছেন, নৈশ জীবনটা একবার দেখবেন না?

-না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, বাড়িতে গিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

–আপনি আমার অতিথি, আমার খরচে সব কিছু হবে। আপনি কেন চিন্তা করছেন।

ভিক্টরকে ঠিক সময় বাড়িতে ফিরিয়ে দিলেন টনি। ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। তবেই তো আসল খেলা শুরু হবে।

.

পরের দিন সকাল বেলা। টনি মিউজিয়ামে হাজির হয়েছেন। আজ যথেষ্ট জন সমাগম হয়েছে।

ভিক্টর রিজোলিকে তার অফিসে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন–আমি গত রাতের জন্য কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। টনি, মেয়েটি সত্যিই চমৎকার ছিল। জীবনে এত আনন্দ আমি কখনও পাইনি।

রিজোলি হাসলেন ভিক্টর, এই না হলে বন্ধুত্ব?

–প্রতিদানে আপনাকে কী যে দেব!

–আপনার কাছ থেকে কিছুই আশা করছি না আমি। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আপনার সাহচর্য আমার ভালো লাগে। আচ্ছা, হোটেলে আজ পোকার খেলা হবে। আমি খেলব। আপনি কি আসবেন?

-না, আমি এটা খেলতে ভালোবাসি। কিন্তু এখন আমার আর্থিক অবস্থাটা...

–ঠিক আছে, কেন ভুলে যাচ্ছেন, আমি তো আপনাকে সাহায্য করবই। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি তার দায়িত্ব নিলাম।

ভিক্টর মাথা নেড়ে বললেন না না, বারবার এভাবে আপনি কেন আমাকে সাহায্য করছেন। যদি আমি ওই খেলাতে হেরে যাই, আপনার টাকা ফেরত দেব কী করে?

উনি বললেন আপনি হেরে যাবেন? এমনটা কখনও আর ভাববেন না।

তার মানে?

রিজোলি হাসলেন–আগে থেকে সব ঠিক করা থাকবে। আমার এক বন্ধু অটো ডালটন ওই খেলাটা চালায়। তার হাতে প্রচুর টাকা আছে। আমেরিকার ট্যুরিস্টরা মনের আনন্দে এই খেলাতে অংশ নেয়। অটো ব্যাপারটা ম্যানেজ করে দেবে। আপনি কিছু ভাববেন না।

ভিক্টরের চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল তার মানে? তার মানে? আমরা প্রতারণা করব? না না, এ ধরনের কাজ আমি কখনও করিনি।

রিজোলি মাথা নেড়ে বললেন–হ্যাঁ, আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এভাবেই তো পৃথিবী চলছে। ভেবে দেখুন তো, আধঘণ্টার মধ্যে যদি আপনার পকেটে তিন হাজার ডলার এসে যায় তাহলে কেমন হবে?

ভিক্টরের বিষাদক্লিষ্ট মুখে তখন আনন্দের উদ্ভাস আভা। তিনি বললেন–বলছেন কী! দুই-তিন হাজার ডলার?

–হ্যাঁ, কমপক্ষে।

জিভ কেটে ভিক্টর বললেন–না না, আমি ভাবছি ব্যাপারটা কত বিপজ্জনক! একবার ধরা পড়লে কী হবে?

টনি হাসলেন–না, ব্যাপারটা মোটেই বিপজ্জনক হবে না। তাহলে আমি কি এত টাকা লগ্নি করতাম। অটো সবকিছু জানে, অটোর পরিচিত একজন মেকানিক ডিলার আছে। সে এই ব্যাপারে খুবই তুখোর। বছরের পর বছর ধরে সে এই কাজটা করে আসছে। কখনও ধরা পড়েনি।

ভিক্টর শেষ পর্যন্ত বললেন কত টাকা ঢালতে পারবে?

মাত্র পাঁচশো ডলার। আমি তো বলছি টাকাটা আমি আপনাকে ধার হিসেবে দেব। হেরে গেলেও সেই ধার শোধ করতে হবে না।

-ঠিক আছে, আপনার মহানুভবতার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি এটা কেন আমার জন্য করছেন?

–আমি তো আগেই বলেছি, আপনার মতো মানুষের সঙ্গে আমার খুব একটা দেখা হয়নি। আপনি কিউরেটরের মতো একটা মহান পদে কাজ করছেন। যে মিউজিয়ামের সঙ্গে আপনি যুক্ত তাকে সারা পৃথিবীর অন্যতম সেরা যাদুঘর বলা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র কি আপনার যথেষ্ট দেখভাল করে? আপনার হাতে ভালো টাকা দেয় বেতন হিসেবে? আপনার পরিবার নিয়ে আপনাকে বিব্রত থাকতে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি ভিক্টর, ব্যাপারগুলো চিন্তা করে আমি কেমন যেন হয়ে গেছি। আপনাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

–হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, ওরা আমাকে দাঁড়াতে দেবে না।

-ঠিক আছে, আপনি এখন আপনার ভাগ্যের চাকাটাকে ঘোরাতে পারবেন ভিক্টর। আজ রাতে আসুন। কথা দিচ্ছি, আজ রাতেই আপনি বড়োলোক হয়ে যাবেন। এক হাজার ডলার আপনার পকেটে এলে মনটা তরতাজা হয়ে যাবে। যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারবেন। এই জীবনের ভার আপনাকে বহন করতে হবে না।

টনি, টনি আমি বুঝতে পারছি না আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া উচিত কিনা!

টনি রিজোলি বললেন–আমি বুঝতে পারছি। আমি এথেন্সে আবার আসব, আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে। মনে করুন না আমাদের বন্ধুত্বটা চিরস্থায়ী।

রিজোলি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভিক্টর বললেন ঠিক আছে, আজ রাতে আপনার সঙ্গে হোটেলে যাব।

টনি ভিক্টরের হাত চেপে ধরে বললেন, বাঃ, ঠিক আছে, এই তো, এবার আমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবে কী?

ভিক্টর ইতস্তত করতে থাকেন আমার বোকামির জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু পাঁচ ডলারও যদি হারিয়ে ফেলি, তাহলে তো আপনাকে কিছু শোধ দিতে পারব না। ব্যাপারটা আমাকে বিব্রত করছে।

-হ্যাঁ, তবে আপনি ভাববেন না এ নিয়ে সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

–কোথায় খেলাটা হবে?

–মেট্রোপোল হোটেলে, চব্বিশ নম্বর ঘরে। রাত দশটাতে স্ত্রীকে বলবেন, অফিসে কাজ আছে। বাড়ি ফিরতে রাত হবে।

.

১২.

টনি রিজোলি এবং ভিক্টর ছাড়াও হোটেলের ঘরে আরও চারজন ছিল।

রিজোলি বললেন আমি আমার বন্ধু অটো ডালটনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি ভিক্টর।

দুজন মানুষ হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন হল।

চকিতে অন্য দুজন ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রিজোলি বললেন–ডালটন, উনি কে? আর ওই ভদ্রলোক?

অটো ডালটন প্রত্যেকের পরিচয় দিলেন এইভাবে ডেট্রয়েট থেকে এসেছেন পেরি ব্রেসলার, হাউসটন থেকে মারভিন সেমেয়ার, নিউইয়র্ক থেকে স্যাল প্রিজি।

ভিক্টর সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। নিজের এই আচরণকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অটো ডালটনের বয়স ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। মাথায় চুল কমে এসেছে। পেরির বয়স কম। মুখ দেখে মনে হয়, তিনি কোনো চিন্তায় আচ্ছন্ন। মারভিন এক রোগা পাতলা চেহারার মধ্যবয়স্ক মানুষ। স্যালের চেহারাটা বিরাট। ওক গাছের মতো দেখতে তাকে। হাত পা অনন্ত শক্তির আধার, দেখলেই বোঝা যায়। চোখদুটো ছোট এবং কুতকুতে। মুখটা দেখলে মনে হয়, সেখানে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি লাগানো আছে।

রিজোলি ভিক্টরকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। এই লোকগুলোর পকেটে অনেক টাকা আছে। হারলেও তারা কিছু মনে করবেন না। সেমেয়ারের আছে একটা মস্তবড়ো ইনসিওরেন্স কোম্পানি। ব্রেসলার সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অটো মোবাইল ডিলারের

ব্যবসা ছড়িয়ে রেখেছেন। স্যাল প্রিজি হলেন নিউ ইয়র্কের একটা মস্তবড়ড়া ইউনিয়নের সর্বময় কর্তা।

অটো ডালটন বলতে থাকেন মাননীয় ভদ্রমহোদয়রা, এবার কী খেলাটা শুরু করব? সাদা চিপের অর্থ পাঁচ ডলার, নীল চিপের অর্থ দশ, লাল পঁচিশ এবং কালো হল পঞ্চাশ। দেখা যাক আপনাদের হাতে কী রঙের চিপ আছে?

ভিক্টরের হাতে পাঁচশো ডলার আছে। টনি রিজোলি ধার বাবদ ওই টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়েছেন। না, ধার তো নয়, দেওয়া হয়েছে উপহার হিসেবে। তিনি রিজোলির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আহা, ঈশ্বর এমন বন্ধুকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন!

সকলে টেবিলে গিয়ে বসলেন। ভিক্টরের মনে হঠাৎ অপরাধ বোধ জেগে উঠেছে। কোনো কিছু খারাপ হলে কী হবে? পাঁচশো ডলার পকেট থেকে চলে যাবে? শীতল শিহরণ। টনি হয়তো কিছু মনে করবেন না। কিন্তু জিতলে, নতুন এক জগতের দুয়ার খুলে যাবে?

খেলাটা শুরু হল।

প্রথমে ছোটো ছোটো দান খেলা হচ্ছে। পাঁচটি তাসের খেলা। তারপর সাত তাস, এইভাবে তাসের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

প্রথম দিকে দেখা গেল হারজিতের পরিমাণটা সমভাবে বন্টিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভাগ্যের চাকাটা ঘুরতে শুরু করল।

বোঝা গেল ভিক্টর আর টনি কোনো খেলায় ভুল চাল দিতে পারে না। প্রত্যেকবারই তাদের হাতে ভালো তাস উঠছে। অন্যেরা খারাপ তাস পাচ্ছে। এর অন্তরালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? ঈশ্বর হয়তো আজ ওই দুজনকে সাহায্য করছেন।

ভিক্টর ভাগ্যের এই উত্থানে অবাক হয়ে গেছেন। সন্ধ্যে এগিয়ে চলেছে রাতের দিকে। দেখা গেল ইতিমধ্যে ভিক্টর দুই হাজার ডলার জিতে নিয়েছেন। ব্যাপারটা তার কাছে অলৌকিক এবং আশ্চর্য বলে মনে হল।

মারভিন সেমেয়ার গজ গজ করতে করতে বললেন–তোমরা এত ভালো খেলছ কী করে? ঈশ্বরের বরপুত্র নাকি?

ব্রেসলার বললেন ঠিক আছে, কাল দেখা যাবে।

রিজোলি বললেন–কাল আসুন, আবার দেখা হবে, তখন বোঝা যাবে ভাগ্য কাকে সাহায্য করছে।

ভিক্টর বললেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, দুই হাজার ডলার!

রিজোলি হাসছিলেন। সাফল্যের হাসি–এটা তো সামান্য টাকা! আমি বলেছিলাম না, অটোর সাথে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। ওই লোকগুলো আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চেয়েছে। পার কী? মনে হচ্ছে, আপনি এই খেলাটায় উৎসাহী হয়ে উঠেছেন?

-হ্যাঁ, ভিক্টরের একগাল হাসি। এখন বুঝতে পারছি, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা ছিল এক অলৌকিক ঘটনা।

পরবর্তী রাতে ভিক্টর আবার তিন হাজার ডলার জিতলেন।

রিজোলিকে তিনি বললেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! ওঁরা কি কিছুই বুঝতে পারছেন না? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন?

টনি বললেন–এই ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি তো আগেই বলেছি সব সাজানো আছে। আসলে ওরা ভাবছে, এইবার বুঝি ওদের জেতা শুরু হবে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না। কালকে আসছেন তো?

আচ্ছন্নের মতো ভিক্টর বললেন–হ্যাঁ, কাল রাতে আবার এখানেই দেখা হবে কেমন?

.

খেলা শুরু হতে চলেছে। সকলেই নিজের জায়গামতো বসে পড়েছেন।

স্যাল প্রিজি বললেন আপনারা জানেন, একদিন আমরা ক্রমাগত হেরে এসেছি। আজকে ঠিক চাল দিতে হবে।

টনি তাকালেন ভিক্টরের দিকে।

–আমার কোনো অসুবিধে নেই।

–দেখা যাক, আপনার বন্ধুরা কী বলে? সকলে মুখ চাওয়াচয়ি করলেন।

অটো ডালটন চিপ ঢালতে শুরু করেছেন। তিনি বললেন–সাদা চিপের দাম পঞ্চাশ ডলার, নীল চিপের দর একশো ডলার, লাল পাঁচশো ডলার আর কালো এক হাজার ডলার।

ভিক্টর এই কথা শুনে রিজোলির দিকে তাকালেন। এত টাকার খেলা হবে তিনি ভাবতেই পারেননি। রিজোলি মাথা নাড়লেন। আশ্বাসের চিহ্ন ফুটে বেরোচ্ছে তার আচরণের মধ্যে।

খেলা শুরু হল।

ভাগ্য পালটায়নি। ভিক্টরের হাতে যেন ম্যাজিক আছে। যে তাস তিনি ধরছেন, সেটাতেই বাজিমাত করছেন। ট্রায়ো ট্রায়ো বলে চিৎকার করছেন। টনি রিজোলিও জিতছেন, কিন্তু তত বেশি নয়।

প্রিজি চিৎকার করে বললেন–শুয়োরের বাচ্চা এই কার্ডগুলো। দেখা যাক, ডেক পরিবর্তন করা হোক।

অটো ডালটন সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা নতুন ডেক এনে দিলেন।

ভিক্টর টনির দিকে তাকালেন। হাসলেন। তিনি জানেন, কিছুতেই তার ভাগ্যের চাকা উলটো দিকে ঘুরবে না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মধ্যরাত। তাদের জন্য স্যান্ডউইচ পাঠানো হল। পনেরো মিনিটের ব্রেক নেওয়া হল।

টনি ভিক্টরকে বললেন আমি অটোকে সবকিছু বলেছি। ওদের একটু জিততে দিতে হবে।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–ওঁদের হাতে দুটো-একটা জয় পাঠাতে হবে। সবসময় হারলে ওঁরা খেলা থেকে বেরিয়ে যাবেন। আর ফিরে আসবেন না ডেস্কে। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

–বাঃ, ব্যাপারটা খুব সুন্দর তো! আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।

বুঝতেই তো পারছেন সব কিছু দেখতে হবে। তা নাহলে পকেটে টাকাপয়সা আসবে কী করে?

ভিক্টর কী যেন বলতে গেলেন অনেক টাকাই তো পেলেন। টনি, এবার খেলা থেকে উঠে যাওয়াই উচিত।

টনি ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে বললেন ভিক্টর, আজ আপনার পকেটে পঞ্চাশ হাজার ডলার আমি পুরে দেবই। আমি শপথ নিচ্ছি।

.

খেলা আবার শুরু হল। তিন মার্কিনদেশীয় এবার জিততে শুরু করেছেন। তবে ভিক্টরের অবস্থা এখনও ভালো। আর ওঁদের অবস্থা আজ আগের থেকে একটু ভালো।

অটো ডালটনকে এক প্রতিভা বললে কম বলা হয়। ভিক্টর ভাবলেন। খেলার ওপর নজর রেখেছেন। তার প্রতারণা কেউ ধরতে পারছে না।

খেলা এগিয়ে চলেছে। ভিক্টর এখনও হারছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, সব টাকা চলে গেলে কী হবে? তার মানে...

প্রিজি বলতে থাকেন কী হল? ভাগ্যের চাকা ঘুরছে নাকি?

টনি মাথা নেড়ে বললেন–হ্যাঁ হতেই পারে। তাসের খেলায় কখন কী হয় তা কি বলা যায়?

মারভিন মন্তব্য করলেন এবার দেখো বন্ধুরা, কীভাবে আমরা জিতছি।

পেরি বললেন–তাহলে? স্টেকস বাড়াবেন নাকি?

টনি তার উদ্বেগ-আকুল অবস্থা ঢাকার চেষ্টা করলেন। চিন্তিত অবস্থায় তিনি বললেন–ভিক্টর, আপনি কী মনে করছেন?

ভিক্টর তখনও সুখ স্বপ্ন দেখে চলেছেন। পকেটে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে আজ রাত শেষ হবে। আমি একটা গাড়ি কিনব, নতুন একটা বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে ছুটিতে বেড়াতে যাব।

ভিক্টর তখন কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেছেন। তিনি চিৎকার করলেন–খেলা চলবে! খেলা চলবে!

স্যাল প্রিজি বললেন–ঠিক আছে, আমরা দাম বাড়াচ্ছি। আকাশ হোক আমাদের সীমা।

পাঁচ তাসে খেলা শুরু হল।

–এবার আমি প্রথম দান দেবো। ব্রেসলার বললেন, পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে খেলা শুরু হবে।

প্রত্যেকেই টাকাটা জমা রাখলেন।

ভিক্টর দুটো রানি নিয়ে খেলা শুরু করলেন। তিনটে তাস বের করলেন। আহা, আরেকটা রানি পাওয়া গেছে? রিজোলি তার দিকে তাকালেন। বললেন–এক হাজার।

মারভিন বললেন–আমি দুহাজার দাম দিচ্ছি।

অটো ডালটন তার তাস ছুঁড়ে ফেলেছেন- না, এত বেশি টাকায় খেলা উচিত নয়।

স্যাল প্রিজি বললেন–আমি এখনও ডাক শুরু করিনি।

পরের হাত খেলা হচ্ছে। ভিক্টর আটে গিয়ে থেমে গেছেন। নয় দশ, অনেক পেয়েছেন তিনি। একটি মাত্র তাস.একটি মাত্র কার্ড হলেই এই টেবিলটা তার।

ডালটন বললেন–এক হাজার ডলার?

-আমি আরও এক হাজার বাড়িয়ে দিলাম।

–ঠিক আছে, আমি তিন হাজারে পৌঁছে যাচ্ছি। স্যাল প্রিজি বললেন।

ভিক্টরের মন কাঁপছে। এই খেলায় তাকে জিততেই হবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার, পঞ্চাশ। হাজার ডলার, কে যেন তার কানে কানে মন্ত্র পড়ছে।

ভিক্টর কার্ড বের করলেন। ব্রেসলার তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শেষ অবধি কী হল?

ভিক্টরের মুখের দিকে সকলে তাকিয়ে আছেন। ভিক্টর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না, এবারও তিনি জিততে পারেননি। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় তিনি সব কার্ড ফেলে দিলেন।

.

খেলা এগিয়ে চলেছে। ভিক্টর একটির পর একটি চিপ তুলছেন। ভাগ্যটা এমন বিরূপ হল কেমন করে? তিনি টনির দিকে তাকালেন। টনি হাসছেন। হাসির মধ্যে লেখা আছে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

টনি পরবর্তী তাসটা বিলি করলেন।

–একহাজার ডলার পেরি বললেন, মারভিন বললেন–আমি আরও দুই চাপিয়ে দিলাম।

স্যাল প্রিজি বলতে থাকেন বুঝতেই তো পারছেন খেলাটা কোথায় পৌঁছে গেছে। ঠিক আছে আমি আরও পাঁচ চাপিয়ে দিলাম।

ভিক্টর তখন আচ্ছন্নের মতো খেলে চলেছেন। কখন ভাগ্যের চাকা ঘুরবে?

ভিক্টর?

ভিক্টর কার্ডের দিকে তাকালেন। একটির পর একটি টেক্কা, দুটি টেক্কা, তার সাথে একটা রাজা, তার রক্তে কে যেন দামামা বাজিয়ে দিয়েছে।

–আপনি খেলায় ফিরে এসেছেন?

ভিক্টরের মুখে হাসি।তিনি জানেন, এইভাবে তার ভাগ্যের চাকা একদিন ঘুরে যাবে। তিনি চিৎকার করছেন উন্মত্তের মতো। আর একটি মাত্র কার্ড, একটি মাত্র!

অটো বলতে থাকেন–আমি দুটি কার্ডের অর্ডার দিলাম। এক হাজার ডলার বাজি রাখছি।

টনি বললেন ঠিক আছে, আমিও আপনার সঙ্গে একমত।

প্রিজি বলে উঠলেন–আমি পাঁচ হাজার ডলারে উঠে গেলাম।

মারভিন বললেন–আমি আর খেলব না।

ভিক্টর এবং স্যাল ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

প্রিজি ডাকলেন–আপনি কী ডাক দেবেন? পাঁচ হাজার ডলার?

ভিক্টর তাকিয়ে আছেন চিপের দিকে। পাঁচ হাজার? কত বাকি আছে? কিন্তু যখন খেলা শুরু হয়েছিল। অবিশ্বাস্য একটা আবেদন।

তিনি চিৎকার করে বললেন–হ্যাঁ আমি খেলব।

তিনটি টেক্কা আছে। প্রিজি বললেন–চারটি টুইন।

ভিক্টর বসেছিলেন, হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনি দেখলেন, পিজি খেলাটা জিতে গেছেন। মনে হল কে যেন তাকে গর্তের ভেতর ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তাহলে? স্যাল কি মিথ্যে কথা বলছেন নাকি?

এবার প্রিজির পালা সাত বারে খেলা হবে। প্রিজি ঘোষণা করলেন। প্রত্যেকটা কার্ডের জন্য এক হাজার ডলার দেওয়া হবে।

ভিক্টর টনির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন–আমার কাছে টাকা নেই।

রিজোলি বললেন–ঠিক আছে, চিন্তা করছে কেন, আমি আরও টাকা ধার দেব। শেষ অবধি আমরা খেলব। কীভাবে জিততে হবে সেটা আমি জানি। লড়াইয়ের আসর থেকে এখন কোথাও যাব না।

অটো ডালটন ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আপনার কত লাগবে?

টনি রিজোলি কথাটা লুফে নিয়ে বললেন–এখুনি ওঁকে দশ হাজার দাও।

ভিক্টর অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। দশ হাজার ডলার? দু বছর ধরে তিনি এত ডলার আয় করতে পারেননি। কিন্তু রিজোলি নিশ্চয় জানেন এর মধ্যে একটা কারসাজি আছে।

ভিক্টর ঢোক গিলে বললেন–হা তাহলে তো ভালো হয়।

ভিক্টরের সামনে একগাদা চিপস রাখা হল।

.

মনে হল সে রাতে প্রত্যেকটি তাস বুঝি ভিক্টরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। খেলা এগিয়ে চলেছে। নতুন চিপ এনে ঠাই করে রাখা হয়েছে তার চোখের সামনে। মুহূর্তের মধ্যে চিপ নষ্ট হয়ে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে। টনি রিজোলিও যেন পাল্লা দিয়ে হারছিলেন।

রাত দুটো বেজেছে, কিছুক্ষণের বিরতি ঘোষণা করা হল। ভিক্টর টনি রিজোলিকে এক কোণে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভিক্টর জানতে চাইলেন কী হচ্ছে বলুন তো? কত টাকা হারতে হবে আজ আমাকে।

স্পষ্ট বোঝা গেল ভিক্টর এই অভাবিত ঘটনাতে খুবই ভেঙে পড়েছেন। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভয় এবং আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ।

–এত ভেঙে পড়ার কী আছে ভিক্টর? আমি আছি না, ঠিক সময় অটোকে আমি ইঙ্গিত করব। এবার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরতে শুরু করবে। দেখুন না, আজ কত ডলার আমাদের পকেটে আসে।

আবার খেলা শুরু হল।

রিজোলি বললেন–আমার বন্ধুকে আরও পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে দাও।

মারভিন চিৎকার করে উঠলেন–আপনি কি নিশ্চিত এই বাজি জিততে পারবেন?

রিজোলি ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে বললেন–হ্যাঁ, আমরা জিতবই।

ভিক্টর কিন্তু কিন্তু করছিলেন। অটোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কী? তারপর ভিক্টর বললেন–হ্যাঁ আমি খেলব।

-ওকে।

পঁচিশ হাজার ডলারের চিপস রাখা হল। ভিক্টরের সামনে। তিনি চিপসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ভাবলেন, হায়, আজ ভাগ্যদেবী সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে চলেছেন।

অটো ডালটন খেলাটি পরিচালনা করছিলেন। তিনি বললেন–আসুন ভদ্রমহোদয়রা, পাঁচ কার্ডের খেলা শুরু হবে। ডাক শুরু হবে এক হাজার ডলার থেকে।

প্রত্যেক খেলোয়াড় টেবিলের ওপর চিপস রেখে দিলেন।

ডালটন পাঁচ কার্ড সকলকে বেটে দিলেন। ভিক্টর হাতের দিকে তাকালেন না। আমি অপেক্ষা করব, তিনি ভাবলেন, মনে হচ্ছে এবার সত্যি সত্যি জিততে চলেছি।

আপনাদের তাস দেখান। মারভিন ডালটনের পাশে বসেছিলেন। তিনি হাত দেখলেন, বললেন, এই হল আমার তাস।

তিনি তাস ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

স্যাল পাশে বসেছিলেন, তিনিও ডাকতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি এক হাজার পর্যন্ত ডাকব।

তিনি টেবিলের ওপর রাখা চিপসের দিকে তাকালেন।

এবার টনি রিজোলির পালা। টনি রিজোলি তার হাত দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমিও তাস ফেলে দিচ্ছি।

পেরি হাত দেখে গুনগুনিয়ে বললেন–আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। পাঁচ হাজার ডলার দাম চড়িয়ে দিলাম।

তার মানে? ভিক্টরকে এখন টিকে থাকতে হলে ছহাজার ডলার ঢালতে হবে। ধীরে ধীরে তিনি হাতের দিকে তাকালেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, এ ধরনের হাত হতে পারে। আহা, পাঁচ ছয় সাত আট এবং নয়। হরতনের সবকটি তাস পরপর সাজানো আছে। ভগবান বোধহয় এমন হাত দিয়েছেন। টনি কাজ করতে শুরু করেছেন। হায় ঈশ্বর, আমি এতক্ষণ টনিকে ভুল বুঝছিলাম। ভিক্টর চিৎকার করে বললেন–আমি সকলের তাস দেখতে চাইছি। আরও পাঁচ হাজার ডলার বাড়িয়ে দিলাম।

তার মানে? এই একটি মাত্র হাত খেলেই ভিক্টর বড়োলোক হয়ে যাবেন।

ডালটন বললেন এখনই এই কাজ করবেন না।

স্যাল প্রিজি বলে উঠলেন–ঠিক আছে, মনে হচ্ছে কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। আমি আরও পাঁচ হাজার বাড়িয়ে দিলাম।

ভিক্টরের রক্তের মধ্যে তখন উন্মাদনা জেগেছে। এই প্রথম ভিক্টর বুঝতে পারলেন, এই খেলাটায় একটা মরণজয়ী আকর্ষণ আছে। এটা হল চক্রবহের মতো, ঢোকার মন্ত্র জানলে বেরিয়ে আসারও জানা যাবে।

খেলা জমে উঠেছে। বেশ ভালোই জমে উঠেছে। ভিক্টর জীবনের সবথেকে বড়ড়া জ্যাকপটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পেরি সাবধানতার সঙ্গে হাত পর্যবেক্ষণ করে বললেন–এবার আমার ডাক শুরু হবে। আমি আরও পাঁচ চড়িয়ে দিলাম।

ভিক্টরের পালা। গভীর শ্বাস নিয়ে তিনি বললেন আরও পাঁচ। ভিক্টর এখন এক অচেনা জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। তিনি বুঝতে পারছেন, ধীরে ধীরে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

পেরি কাঁধে একটা ঝকানি দিলেন, মুখের প্রতিটি রেখার বিজয়ীর চিহ্ন আঁকা। তিনি বললেন তিন রাজা।

আমি জিতে গেছি, ভিক্টর ভাবলেন। কিন্তু এখনও খেলাটা শেষ হয়নি। তিনি হাসলেন। কার্ড নামিয়ে দিলেন। ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব।

স্যাল বললেন–ধরে রাখুন, আমি রয়্যাল মেরে আপনাদের সকলকে হারিয়ে দেব। আহা, আমার কাছে তিন টেক্কা রয়েছে।

ভিক্টরের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মনে হল তিনি যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দন করতে শুরু করেছে।

টনি বলে উঠলেন যিশু, এভাবে জিতব ভাবতেই পারছি না, কী হল? ভিক্টর? তারপর বললেন, ভিক্টর আমি দুঃখিত, আমি জানি না কীভাবে আপনাকে সমবেদনা জানাবো।

অটো ডালটন বলে উঠলেন–আজকের মতো খেলা শেষ হল। তিনি ভিক্টরের দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার কাছে আপনার ধার হল পঁয়ষট্টি হাজার ডলার।

ভিক্টর বোকার মতো টনি রিজোলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হল কে যেন তাকে মাটির সঙ্গে লেপ্টে দিয়েছে। রিজোলি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন। ভিক্টর একটি রুমাল বের করলেন, কপাল মুছলেন।

ডালটন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কীভাবে টাকাটা শোধ দেবেন? নগদ নাকি চেকে?

প্রিজি বললেন–না, আমি চেক নিই না। তিনি কঠিন চোখে ভিক্টরের দিকে তাকালেন। আমি ক্যাশ টাকা নেব।

ভিক্টর তখন কথা ভুলে গেছেন। শব্দরা হারিয়ে গেছে। তিনি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। তিনি বললেন–আমি...আমি..আমার কাছে...

স্যালের মুখ অন্ধকার হয়ে এসৃেছে। কী বলছেন? তিনি কুকুরের মতো চিৎকার করলেন।

টনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন–এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। ভিক্টর বলছেন এই মুহূর্তে টাকাটা ওঁর সঙ্গে নেই। আমি বলছি, আমি এ ব্যাপারে জিম্মা নিচ্ছি।

না, এ নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না রিজোলি। আমি এখুনিই টাকাটা চাইছি।

রিজোলি বললেন ঠিক আছে, কয়েকদিনের মধ্যেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।

স্যাল সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে তিনি বললেন–আমি এখানে দানসত্র খুলতে আসিনি। কালকের মধ্যে টাকাটা আমার চাই। তা নাহলে?

স্যালের এই রণংদেহী মূর্তি দেখে সকলে ভয় পেয়ে গেছেন।

তখনও আমতা আমতা করে টনি বলছেন–ঠিক আছে, ভিক্টর টাকাটা দিয়ে দেবেন। আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।

ভিক্টরকে মনে হল, তিনি যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তিনি এমন একটা ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো মন্ত্র তার জানা নেই। তিনি চুপ করে চেয়ারে বসে থাকলেন। সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। টনি এবং ভিক্টর ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে।

ভিক্টর বললেন আমি বুঝতে পারছি না, এত টাকা জোগাড় করব কী করে?

টনি রিজোলি ভিক্টরের কাঁধে একটি হাত রাখলেন। বললেন–জানি না ভিক্টর, ব্যাপারটা এমন হল কী করে! মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আমিও আপনার মতোই সর্বস্বান্ত হলাম।

ভিক্টরের চোখ জলে ভরে এসেছে।

কিন্তু আপনি সেটা পূরণ দিতে পারবেন টনি। আমি জানি না, আমি কী করে আমার পরিবারের কাছে মুখ দেখাব। আজ বাদে কাল কী হবে ভাবতে গেলে আমার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠছে।

টনি বললেন কিছু একটা সমাধান করতেই হবে। ভিক্টর, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক। স্যাল প্রিজির অতীত ইতিহাস আমার জানা আছে। ইনি হলেন ইস্টকোস্ট সিম্যানস ইউনিয়নের প্রধান। তার হাতে অনেক গুণ্ডা বদমাইশ পোষা আছে।

জানি না কী হবে, কিন্তু আমাকে ছিঁড়ে ফেললেও আমি টাকাটা দিতে পারব না। ওই টাকাটা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও দেখিনি। উনি আমার কী করবেন?

বলব? আপনি ভয় পাবেন না তো? রিজোলি জানতে চাইলেন। আপনাকে গুলি করে আঁঝরা করে দেওয়া হবে। ওই ভদ্রলোক এ ব্যাপারে খুব সুনাম অর্জন করেছেন। আপনার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়া হবে। আপনি একেবারে অন্ধ হয়ে যাবেন। এমন যন্ত্রণা দেওয়া হবে আপনি তা জীবনে ভুলবেন না। আমি জানি না, ওরা কীভাবে আপনাকে হত্যা করবেন। হয়তো একেবারে মেরে ফেলবে না, কিন্তু হাত পা কেটে রাখবে। পঙ্গু হয়ে আপনাকে ভিক্ষা করতে হবে।

ভিক্টর টনির মুখের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন না, আপনি সব মিথ্যে করে বলছেন বলুন? আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

–আমার কোন দোষ নেই ভিক্টর, আমি এভাবে খেলতে আসতে বলিনি। আপনি যা করেছেন সবই নিজের ইচ্ছেয়। স্যাল প্রিজির সঙ্গে লেগেছেন। এই অন্যায়ের শাস্তি তো আপনাকে ভোগ করতেই হবে।

–হায় ঈশ্বর! জানি না কী হবে আমার ভাগ্যে?

টাকা তোলার কোনো পন্থা জানা আছে?

ভিক্টর অবাক হয়ে বললেন টনি, আমি আমার পরিবারের লোকজনের মুখে খাবার তুলে দিতে পারি না আর টাকা তোলা? কী ভেবেছেন আপনি আমাকে?

–তাহলে এই শহর ছেড়ে চলে যান ভিক্টর। সম্ভব হলে দেশ ছেড়ে চলে যান। এমন একটা জায়গায় চলে যান যেখানে প্রিজির কালো হাত আপনাকে ছুঁতে পারবে না।

না, আমি তা করতে পারব না। ভিক্টর বললেন, আমার একটা বউ আছে, চারটে বাচ্চা আছে।

তিনি টনির দিকে তাকালেন আপনি বলেছিলেন সবকিছু আগে থেকে বন্দোবস্ত করা আছে। আমরা কোনোদিন হারব না। আপনিই তো বলেছিলেন।

-হ্যাঁ আমি জানতাম, বিশ্বাস করুন, এই প্রথম আমিও হেরে গেলাম। আগে সেই ব্যাপারটা কাজ করেছে। মনে হচ্ছে কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমি একটা ব্যাপার বলতে পারি, প্রিজি আমাদের সকলকে ঠকিয়েছেন।

ভিক্টরের মুখ আশায় দীপ্ত হয়ে উঠল।

-তাহলে? আমরা যদি ওঁকে ঠকাই? শঠে শঠ্যাং হবে।

-না, প্রিজির সঙ্গে লাগতে গেলে ফল ভালো হবে না। লোকটা একেবারে নরপিশাচ। মৃত্যুই তার একমাত্র অস্ত্র।

ভিক্টর আমতা আমতা করতে থাকেন। হায়, আমাকে তো আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কাল কী হবে ভাবতে গেলে হাত পা শিউরে উঠছে।

–হ্যাঁ, আমিও চিন্তা করছি। কোনো জায়গা থেকে টাকাটা ধার করতে পারেন কী?

–না, একশো বার জন্মালেও আমি এই টাকাটা ধার করতে পারব না। হাজার বারেও পারব না। আমার যা কিছু আছে সব বাধা আছে। কোথা থেকে আমি টাকা পাব?

এইবার বোধহয় টনি মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন–এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন ভিক্টর। আপনি বলেছিলেন না ওই মিউজিয়ামের জিনিসগুলোর দাম অনেক।

–হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু তাতে কী?

–আমার কথা শেষ করতে দিন। আপনি আরও বলেছিলেন যে নকল জিনিসগুলো আসলের মতো দামি, বলেননি?

-হ্যাঁ, তবে কোনো বিশেষজ্ঞের চোখে আসল আর নকলের পার্থক্যটা ধরা পড়ে যাবে।

–ঠিক আছে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন? কোনো একটা আসল দ্রব্যকে সরিয়ে তার জায়গায় নকল রাখতে পারেন? মিউজিয়ামে অনেক ট্যুরিস্ট আসে, তাঁরা কি এই • তফাতটা বুঝতে পারবেন?

–না, তা হয়তো পারবে না, কিন্তু তা আমি করব কেমন করে? বিবেকের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

রিজোলি বললেন হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি ভিক্টর। আমি ভাবছি যে এই কাজটা করলে আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ভিক্টর বললেন আমি কুড়ি বছর ধরে মিউজিয়ামে কিউরেটর হিসেবে কাজ করছি। আমি কখনও এই কাজ করতে পারব না। মরে গেলেও না। খেতে না পেলেও না।

আমি দুঃখিত, এই ব্যাপারটা বলা উচিত হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো এইভাবে আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবেন।

রিজোলি বেরোবার জন্য উদ্যত হলেন। ঠিক আছে, রাত হচ্ছে, আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। বউদি নিশ্চয়ই আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।

ভিক্টর বললেন হা, কিন্তু ওই ব্যাপারটা করলে আমার জীবন বাঁচবে কী করে?

–হ্যাঁ বাঁচবেন, যদি আপনি সব আসল জিনিস সরিয়ে আনেন?

–আসল জিনিস?

-হ্যাঁ, আসল জিনিসগুলো, সেগুলো আমার হাতে তুলে দিতে হবে। আমি সেগুলো; দেশের বাইরে পাচার করব। বিক্রি করব। যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা প্রিজির হাতে তুলে দেব। তবেই প্রিজির হাত থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন। এছাড়া বাঁচার আর

কোনো উপায় নেই। ভেবে দেখুন, আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমি কত পরিশ্রম করব। কত সমস্যার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। কারণ আপনি যা সমস্যায় পড়েছেন তার অন্তরালে আমার একটা ছোট্ট কালো ভূমিকা আছে। ভাববেন না এর ভেতর আমার কোনো লভ্যাংশ থাকবে। বিবেকের তাড়নায় আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি।

সত্যি এখনও আপনি আমার কত বড় বন্ধু, ভিক্টর বললেন, কিন্তু আমি আপনাকে দোষ দেব কী করে? আমি তো ইচ্ছে করেই এই খেলায় এসেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন মাত্র।

–হ্যাঁ আমি জানি, ভেবে দেখুন আমার প্রস্তাবটা আপনার মনোমত হবে কিনা। এবার বড় ঘুম পাচ্ছে। আপনার সঙ্গে কাল কথা বলব। শুভ রাত্রি ভিক্টর।

শুভরাত্রি টনি।

***

সকালবেলা। টেলিফোনটা বেজে উঠেছে, মিউজিয়ামে।

ভিক্টর?

–হ্যাঁ।

–আমি স্যাল প্রিজি বলছি।

সুপ্রভাত মিঃ প্রিজি।

–আমি পঁয়ষট্টি হাজার ডলারের ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি। কখন টাকাটা আনতে যাব?

ভিক্টর আমতা আমতা করে বলেন–এখনও টাকাটা জোগাড় করতে পারিনি, মিঃ প্রিজি।

নীরবতা ভেসে আসে, তারপর কী ভেবেছিস তুই? আমার সাথে খেলা করছিস? তুই জানিস আমি কী?

বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সাথে কোনো খেলা খেলতে চাইছি না।

–বল শূয়োরের বাচ্চা, টাকাটা কখন আমাকে দিবি? পরিষ্কার বাংলা বুঝতে পারছিস তো?

-ইয়েস স্যার।

–কখন তোর মিউজিয়াম বন্ধ হবে?

ছটার সময়।

–আমি ওখানে পৌঁছে যাব। ডলারটা আমার জন্য তৈরি রাখবি। নাহলে তোর মুখটা আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। দেখিস তোর কী করি আমি। হাত পা বেঁধে বস্তায় পুরবো।

লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

ভিক্টর কাঁপতে শুরু করেছেন। কোথায় লুকোবেন এখন তিনি? হতাশার মধ্যে দিয়ে তাকে এখন যেতে হবে। একটি মাত্র সুযোগ আছে। কী সুযোগ? না, যদি ঘটনাগুলো না ঘটতো তাহলে, যদি তিনি ক্যাসিনোতে না যেতেন? যদি টনি রিজোলির সঙ্গে দেখা না হত? যদি স্ত্রীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন, বলেছিলেন জীবনে কখনন জুয়ার আসরে যাবেন না। এখন যা হবার তাই হয়ে গেছে। এখন কী করে মৃত্যুর পরোয়ানা থেকে বাঁচা যায় তাই দেখতে হবে।

–তখনই ভিক্টরের মনে হল, তিনি বোধহয় ঘন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। এমন সময় আশার আলোর মতো সেখানে এসে হাজির হলেন টনি রিজোলি। রিজোলি বললেন–ভিক্টর সুপ্রভাত।

.

– ছটা বেজে ত্রিশ মিনিট। মিউজিয়ামের স্টাফেরা সব বাড়ির দিকে যাত্রা করেছেন। আধঘণ্টা আগে যাদুঘরের প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবেশ পথের সামনে ভিক্টর এবং টনি দাঁড়িয়ে আছেন।

ভিক্টর ক্রমশ আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন–যদি উনি এখুনি টাকা চান? যদি আর সময় দিতে না চান?

টনি শান্তভাবে বললেন–ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। এই ব্যাপারে যা কিছু বলার আমিই বলব।

–জানি না, জানি না কী হবে! উনি কি কাউকে পাঠাবেন আমাকে হত্যা করতে? উনি কি এত সাহসী হয়ে উঠবেন?

না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিজি ভাববেন যে টাকাটা ফেরত দিতে পারেন ততদিন এমন কাজ উনি করবেন না। আপনি মরে গেলে ঋণ চোকাবে কে? রিজোলি শান্তভাবে বললেন।

সন্ধ্যা সাতটা।

স্যাল প্রিজিকে দেখা গেল। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। ভিক্টর দরজা খুলে দিলেন। একগাল হেসে বললেন–শুভ সন্ধ্যা।

প্রিজি অবাক হয়ে রিজোলির দিকে তাকিয়েছেন–আপনি এখানে কী করছেন? তারপর ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে মেটাতে হবে। আপনি নাক গলাবেন না।

রিজোলি বললেন–ব্যাপারটা সহজভাবে নিন না, আমি আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি।

আমি কারও সাহায্য প্রার্থনা করি না। প্রিজি ভিক্টরের দিকে তাকালেন। আমার টাকা কোথায়?

–এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।

প্রিজি ভিক্টরের গলার কলার চেপে ধরে বললেন–শোন, এই মুহূর্তে পুরো টাকাটা আমায় দিতে হবে। তা না হলে তোর কী দশা হবে, আশা করি বুঝতে পারছিস?

টনি রিজোলি বাধা দিয়ে বললেন–কী, হচ্ছে কী? মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। আপনার টাকা পুরো পেয়ে যাবেন।

প্রিজি বললেন–আমি আবার বলছি আপনি নাক গলাতে আসবেন না, এটা আপনার ব্যাপার নয়।

–আমি ভিক্টরের বন্ধু, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? আমি বলছি, ভিক্টরের হাতে এখন ক্যাশ টাকা নেই। কিন্তু একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই হবে।

–পরিষ্কারভাবে বলুন, টাকা আছে কি নেই? আমি আর কিছু শুনব না।

–আছে, আবার নেইও। রিজোলি ধাঁধা জুড়ে দিলেন।

–এটা কী ধরনের উত্তর?

টনি ঘরের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন–টাকাটা ওখানে আছে।

স্যাল থ্রিজি অবাক হয়ে গেলেন কোথায়?

কাচের বাক্সের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন।

দুপ্রাপ্য বস্তু? কথাটা বেরিয়ে এল ভিক্টরের মুখ থেকে।

–হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ ডলার। কত আপনি ভাবতেও পারছেন না।

প্রিজি কাচের শোকেসের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন আপনারা কি আমাকে পাগল ভেবেছেন? মিউজিয়ামের এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি কী করব? আমার নগদ টাকা চাই। এখুনি। তা না হলে আমি কিন্তু....

–আপনি আপনার নগদ টাকা পেয়ে যাবেন, রিজোলি বলতে থাকেন, যত টাকা ধার করা হয়েছে, তার দ্বিগুণ। আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ভিক্টর কখনোই পালিয়ে যাবেন না। তিনি আর একটু সময় চাইছেন। আপনি পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলছি। ভিক্টর। এই দামি জিনিসগুলো চুরি করে বাইরে নিয়ে আসবেন। বিক্রি করার চেষ্টা করবেন। বিক্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতে প্রাপ্য টাকা তুলে দেওয়া হবে।

স্যাল প্রিজি মাথা নাড়লেন।

এ ব্যবস্থাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এই সব জিনিসগুলোর মাথামুণ্ডু। আমি কিছুই বুঝি না।

আপনাকে বুঝতে হবে না, ভিক্টরকে আমরা এই ব্যাপারে একজন কৃতি মানুষ বলতে পারি।

টনি একটা শোকেসের দিকে এগিয়ে গেলেন। মার্বেলের তৈরি মাথার দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি কি বুঝতে পারছেন ভিক্টর এটার দাম কত?

ভিক্টর বললেন–এটা হল হাইজিয়া দেবীর মূর্তি। এটার বয়স অনেক হাজার বছর। জিশু খ্রিস্টের জন্মের চোদ্দো শো বছর আগে এটা তৈরি হয়েছিল। এটার জন্য যে-কোনো সংগ্রহক অনায়াসে ২০-৩০ লক্ষ ডলার দিয়ে দেবেন।

রিজোলি স্যাল প্রিজির দিকে তাকিয়ে বললেন–বুঝতে পারছেন, আমি কী বলতে চাইছি?

প্রিজি বললেন আমি এখনও বুঝতে পারছি না। খোলসা করে বলুন তো, আমাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

–আপনি দ্বিগুণ টাকা পাবেন এক মাসের মধ্যে।

প্রিজি কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ঠিক আছে, আমি একমাস অপেক্ষা করব। আরও বেশি কিছু আমায় দিতে হবে। তবে আমার মুখ বন্ধ হবে।

টনি ভিক্টরের দিকে তাকালেন।

ভিক্টর হা-সূচক ইঙ্গিত করলেন।

রিজোলি বললেন–ঠিক আছে, আপনার কথা আমরা মেনে নিচ্ছি।

স্যাল প্রিজি কিউরেটরের দিকে এগিয়ে গেলেন তোমাকে আমি তিরিশদিন সময় দিলাম। তার মধ্যে যদি দ্বিগুণ টাকা শোধ করতে না পারে, তা হলে রাস্তার কুকুর তোমাকে খেয়ে ফেলবে। আশা করি, আমার বক্তব্য, তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

ভিক্টর আমতা আমতা করে বলতে থাকেন- হ্যাঁ, স্যার।

-মনে রেখো, আজ থেকে গুনে গুনে তিরিশ দিন। তারপর তিনি তাকালেন টনি রিজোলির দিকে, অনেকক্ষণ। বললেন–না, আপনাকে আমি মোটেই পছন্দ করছি না।

স্যাল প্রিজি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ভিক্টর ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর সমস্ত চোখে মুখে ঘাম জমেছে।

উনি বললেন–হায়, ভগবান! আমি ভেবেছিলাম, উনি বুঝি আমাকে মেরেই ফেলবেন। আপনি কি মনে করছেন, তিরিশ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ টাকা শোধ করা সম্ভব হবে?

টনি রিজোলি বললেন–হ্যাঁ, আপনাকে একটাই কাজ করতে হবে, ওই আসল বস্তুটাকে বের করে আনতে হবে, আর নকল জিনিসটা সেখানে ভরে দিতে হবে।

–এটাকে দেশের বাইরে পাচার করবেন কী করে? ধরা পড়লে কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

টনি রিজোলি আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন–আমি সব জানি। ওই ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার জন্য আমি এটুকু করব না!

.

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। টনি রিজোলি, স্যাল প্রিজি, অটো ডালটন, পেরি ব্রেসলার এবং মারাভিন সেমেয়া ডালটনের হোটেলের স্যুইটে বসে মদ পান করছেন।

রিজোলি বললেন–আহা, লোকটাকে দেখে আমার মায়া হচ্ছিল। ওই বেজম্মার বাচ্চাটা বোধহয় প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে।

স্যাল প্রিজি বলল এই লোকের সাথে কারবার করে কী লাভ?

রিজোলি বললেন–আপনি খামোকা আমার প্রতি রেগে যাচ্ছেন। দু-চারটে খচ্চর না পেলে জীবন চলবে কী করে?

মারভিন সেমেয়াজিজ্ঞাসা করলেন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

রিজোলি বলতে থাকেন–ব্যবসাটা হল, ও একটির পর একটি দামি জিনিস আমাদের হাতে তুলে দেবে। জিনিসগুলো আমরা দেশের বাইরে পাচার করব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু টাকা কমিশন বাবদ আমাদের পকেটে আসবে।

পেরি ব্রেসলার বললেন–বাঃ, পরিকল্পনাটা চমৎকার! আমার বেশ ভালো লাগছে।

মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় একটা সোনার খনির সন্ধান পেয়েছি, রিজোলি ভাবতে থাকেন। ভিক্টর একবার এই কাজে হাত দিলে আবার একই কাজ করতে বাধ্য হবেন।

এই গর্ত থেকে উনি আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। অর্থাৎ মিউজিয়ামের সব কিছু বাইরে চলে আসূবে। কোটি কোটি ডলার!

মারভিন জিজ্ঞাসা করলেন মালটাকে বাইরে পাচার করবেন কী করে?

টনি রিজোলি বললেন–একটা পন্থা বের করতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অ্যালফ্রেডো মানকুসো আর জিনো লাভেরি তার অপেক্ষা করছেন।

.

১৩.

স্ট্যাডিও স্ট্রিটের পুলিশ হেডকোয়ার্টার। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসেছে। ডিমিট্রিকে দেখা গেল, ইন্সপেক্টর টিকেও দেখতে পাওয়া গেল। হাজির হয়েছেন ইন্সপেক্টর নিকোলিনো, ওয়াল্ট কেলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি এজেন্ট এবং আরও জনাছয়েক ধুরন্ধর গোয়েন্দা এবং বাতাসে কেমন একটা গম্ভীরভাব। মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো বলতে থাকেন আপনার দেওয়া তথ্য সঠিক, এটা আমরা বিশ্বাস করছি মিঃ কেলি। আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে, টনি রিজোলি বিপুল পরিমাণ হেরোইন এথেন্সের বাইরে পাচার করার চেষ্টা করছে। সব জায়গাতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ারহাউসের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। এরকম কোনো একটা জায়গায় মালটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

–রিজোলির ওপর নজরদারি কায়েম হয়েছে তো?

হ্যাঁ, সকালের লোক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রধান ডিমিট্রি মন্তব্য করলেন।

ওয়াল্ট কেলি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন–ব্যাপারটা হাত ফসকে যাবে না তো?

.

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো দু-দল গোয়েন্দাকে নিয়ে এসেছেন। টনি রিজোলির ওপর নজর রাখাটাই তাঁর দায়িত্ব। তবে কাজের গুরুত্ব কতখানি তিনি তা বুঝতে পারেননি। বিকেলবেলা টনি বুঝতে পারলেন, তার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস পড়ছে। ছোট্ট হোটেলটা তিনি ছেড়ে, দিলেন। তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে ভেবে যখন তিনি পেছন ফিরে তাকালেন কেউ একজন ঠিক একই সময়ে পেছন ফিরে তাকাল। সত্যি, এই গোয়েন্দারা সত্যিকারের পেশাদার! রিজোলির ভালো লাগল। সমানে সমানে লড়াইটা জমে ওঠে।

তাহলে? এথেন্স থেকে হেরোইনের প্যাকেট বাইরে পাঠানো হবে কী করে? আর, শুধু তো এটাই নয়? অমূল্য কিছু জিনিসপত্রও তো বাইরে পাঠাতে হবে। অ্যালফ্রেডো ম্যানকুসো আর জিনো লাভেরির সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ সর্বত্র নজরদারি কায়েম করেছে। অতি দ্রুত কাজ করতে হবে। কার সাহায্য নেওয়া যায়? সেই মুহূর্তে টনির মনে আইভভা ব্রুগির নাম এল। আহা, রোমে উনি একটা ছোটো জাহাজের মালিক। রিজোলি এর আগে ব্রুগির সাথে ব্যবসা করেছেন। ব্রুগির সাহস আছে, চট করে ভয় পান না। দুনম্বরি কাজ করতে গেলে এই সমস্ত লোককে হাতে রাখতে হয়।

.

রিজোলি জানেন, তার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হয়েছে। তাহলে? অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করতে হবে। অনেকক্ষণ তিনি চিন্তা করলেন। শেষ অব্দি উঠে গেলেন। হল পেরিয়ে উলটোদিকের প্যাসেজের একটা দরজায় শব্দ করলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন।

-কে আপনি?

রিজোলি বললেন–আমায় ক্ষমা করবেন, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে আমি দুঃখিত। আমি আপনার প্রতিবেশী, হলের ওপাশে থাকি। আপনি কি আমার সাথে এক মুহূর্ত কথা বলবেন?

ওই ভদ্রলোক সন্দেহের সুরে বললেন–আপনি আগে আপনার ঘরটা খুলুন তো দেখি। ভেতরে ঢুকতে পারলে তবেই তো আপনি সৎ কি না বুঝতে পারব।

টনি হাসলেন- ঠিক আছে।

টনি আবার হল পার হলেন। চাবি নিলেন, দরজা খুলে দিলেন।

লোকটি বললেন–ঠিক আছে, আপনি ঘরে আসতে পারেন।

টনি রিজোলি নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হল পার হয়ে বৃদ্ধের ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন।

–কী চাইছেন আপনি?

–এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা। আমি আপনাকে সমস্যায় ফেলতে চাই না। সত্যি কথাটা হল, আমি ডির্ভোস নিতে চলেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী সব সময় আমার ওপর কঠিন নজর রেখেছে। এমনকি সে আমার ফোন ট্যাপ করছে।

ভদ্রলোক বললেন–মেয়েরাই যত নষ্টের গোড়া। আমি গত বছর আমার স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়েছি। দশ বছর আগে দিতে পারলে বোধহয় ভালো হত।

–ঠিকই বলেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে একটা সাহায্য চাইছি। আমি কি আপনার ঘরের ফোন নাম্বারটা দু-একজন বন্ধুকে দেব? তাঁরা মাঝে মধ্যে ফোন করবেন। আমি কথা দিচ্ছি, খুব বেশি ফোন কল আপনাকে ধরতে হবে না।

ভদ্রলোক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন–ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করব না।

রিজোলি সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে একশো ডলার তুলে দিয়ে বললেন–এটা আপনার পরিশ্রমের জন্য দিলাম।

ভদ্রলোক জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন–ঠিক আছে, আমার মনে হচ্ছে, সব কিছু আমি সামলে দেব। আপনার মতো এক দুঃখী লোককে সাহায্য করতে পারছি, এটা ভেবে আমার ভালো লাগছে।

-আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যখনই কেউ ফোনে আমাকে ডাকবেন, আমার দরজায় শব্দ করবেন, আমি ঠিক সময়ে এখানে পৌঁছে যাব।

-ঠিক আছে।

.

পরের দিন সকালবেলা, রিজোলি পাবলিক পে স্টেশনে গেলেন ফোন করবেন বলে। আইভভা ব্রুগিকে ফোন করলেন। অপারেটরের কাছে নম্বরটা চেয়ে নিলেন।

সিগনর ব্রুগি...।

ইতালি ভাষায়, কিছু কথা হল দুজনের মধ্যে। রিজোলি টেলিফোন নাম্বারটা সুইচবোর্ডের ওপর রেখে দিলেন আর উল্টোদিকের প্রতিবেশীর হাতে নাম্বারটা দিয়ে দিলেন। নিজের ঘরে ফিরে এলেন। এই ঘরটা তার মোটেই ভালো লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, কে যেন তার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। রিজোলি ভাবলেন, এই ঘরটার পরিবেশ খুবই খারাপ। ফার্নিচারগুলো একেবারে বিচ্ছিরি দেখতে। পুরোনো ধরনের একটা সবুজ সোফা আছে। দুটো টেবিল ল্যাম্প আছে একটা রাইটিং ডেস্ক, ডেস্ক চেয়ার, খাটটাও কহতব্য নয়।

পরবর্তী দুদিন টনি রিজোলি ওই ঘরে ছিলেন। ভেবেছিলেন, কেউ বোধহয় দরজায় শব্দ করবে। কিন্তু কেউ এল কি? আইভভা ব্রুগি, বেজন্মার হল কী!

.

ইন্সপেক্টর নিকোলিনে এবং ওয়ান্ট কেলি নিয়মিত তথ্য বিনিময় করছেন।

রিজোলি হোটেলে নিজের ঘরে আটকে আছেন, আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল।

এ ব্যাপারে আপনি কি সুনিশ্চিত?

–হ্যাঁ, স্যার। সকালবেলা কাজের মেয়েরা তাকে দেখেছে। রাত্রিরবেলাও তাকে দেখা গেছে।

-কোনো ফোন কল এসেছে কি?

–এখনও পর্যন্ত একটাও আসেনি।

-ঠিক আছে, মনে হচ্ছে এবার রিজোলি কাজে বেরোবে। দেখ, তার ফোন কল ট্যাপ করতে পারো কিনা।

.

পরের দিন রিজোলির ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। সিট! ব্রুগি নিশ্চয়ই এভাবে ডাকবেন না। বলাই আছে, প্রতিবেশীর ঘরে ফোন করতে। আরও সাবধানী হতে হবে কি? রিজোলি টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

-কে?

একটা গলা পাওয়া গেল–আমি কি টনি রিজোলির সঙ্গে কথা বলছি?

আইভো ব্রুগির গলা নয়, তাহলে কে?

–একদিন আপনি আমার অফিসে এসেছিলেন একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব নিয়ে, আমি কিন্তু আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, এবার আবার এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

টনি রিজোলি বুঝতে পারলেন, স্পাইরস লামব্রো। শেষ অব্দি বেজম্মটা পথে এসেছেন। এত সৌভাগ্য তার হতে পারে, রিজোলি ভাবতেই পারেননি! সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখান থেকেই আমি হেরোইন বাইরে পাঠাতে পারব। একই সঙ্গে কিছু দামি জিনিসপত্র জাহাজে চাপিয়ে দেব।

–ঠিক আছে, আমি খুব খুশি হয়েছি, আপনার কথা শুনে। কখন যোগাযোগ করা যেতে পারে?

–বিকেলে আপনার সময় হবে কী?

ক্ষুধার্তের কাছে খাবার দিয়ে সময় চাওয়া হচ্ছে?

–ঠিক আছে, কোথায়?

–আপনি আমার অফিসে চলে আসুন।

–আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।

টনি রিজোলি রিসিভারটা রেখে দিলেন।

হোটেলের লবিতে হতাশ গোয়েন্দাকে দেখা গেল হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাচ্ছেন। রিজোলি একটা টেলিফোন পেয়েছেন। কারোর সাথে দেখা করতে চলেছেন ওঁনার অফিসে। কিন্তু ওই লোকটা নিজের নাম বলেনি, আমরা কোথা থেকে ফোনটা এসেছে বুঝতে পারছি না।

– ঠিক আছে। রিজোলি হোটেল ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করবে। দেখা যাক সে কোথায় যায়।

-ইয়েস, স্যার।

দশ মিনিট পর টনি রিজোলি বেসমেন্টের জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে ছোট্ট একটা গলিপথ আছে। সেটা দিয়ে হোটেল থেকে বাইরে এলেন। দুবার ট্যাক্সি পালটালেন। যখন বুঝতে পারলেন, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। তিনি সোজা স্পাইরস লামব্রোর অফিসে গিয়ে পৌঁছোলেন।

.

স্পাইরস লামব্রো সেদিন মেলিনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন হাসপাতালে। আবার প্রতিশোধের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল স্পাইরসের। কিন্তু কীভাবে এই প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এক শক্ত ধাঁচের শত্রু। তারপর জর্জিয়াস লেটোর সঙ্গে দেখা হল। মাদাম পিরিস সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া গেল। হাতে কী অস্ত্র আছে? কী অস্ত্র দিয়ে শালাবাবুকে কাত করা যায়?

সেক্রেটারি বলল–অ্যান্থনি রিজোলি নামে কেউ একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন, মিঃ লামব্রো। তিনি কোনো অ্যাপয়মেন্ট করেননি, আমি বলেছি, তিনি দেখা করতে পারবেন না।

ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দাও।

–ঠিক আছে, স্যার।

স্পাইরাস লামব্রো রিজোলিকে দেখলেন, রিজোলির মুখে হাসি। আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রিজোলি সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন।

মিঃ রিজোলি, আপনি এসেছেন বলে আমি খুবই আনন্দিত।

টনি রিজোলি বললেন–আমিও খুশি হয়েছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে। শেষ অব্দি আপনি আর আমি এক সঙ্গে ব্যবসা করব, তাই তো?

না।

টনি রিজোলি অবাক হয়ে গেলেন তাহলে আপনি কেন আমায় ডেকেছেন?

–আমি আবারও বলছি, আপনার সাথে ব্যবসা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

টনি রিজোলির চোখ স্থির হয়ে গেছে। তিনি বললেন–তাহলে কী জন্য আমায় এখানে ডেকে আনা হল? আপনি বললেন, আমার জন্য একটা ভালো প্রস্তাব আছে।

–হ্যাঁ, আপনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের জাহাজ ব্যবহার করবেন কি?

টনি রিজোলি চেয়ারে চুপ করে বসে পড়লেন–কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস? আপনি কার সম্বন্ধে একথা বলছেন? তিনি কখনোই...।

-হ্যাঁ, তিনি রাজি হবেন। এ ব্যাপারে আমি জামিন হচ্ছে। মিঃ ডেমিরিস আপনাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

–আপনি কী করে এমন কথা বলছেন?

–আমি ঠিকই বলছি।

–ডেমিরিস এমন একটা অনৈতিক কাজে নামবেন?

-হ্যাঁ। লামব্রো ইন্টারকমের বোতামটা টিপলেন। কিছুটা কফি পাঠাবে এখানে? তিনি টনি রিজোলির দিকে তাকালেন–আপনার কী কফি লাগবে?

–ব্ল্যাক, চিনি লাগবে না।

–মিঃ রিজোলির জন্য ব্ল্যাক কফি পাঠাও। চিনি দিও না। ইনফিউশন।

কফি দেওয়া হল। সেক্রেটারি অফিস থেকে চলে গেলেন।

স্টাইরস লামব্রো বললেন–মিঃ রিজোলি, আমি আপনাকে একটা ছোট্ট গল্প বলব?

টনি রিজোলি বললেন–ঠিক আছে, বলুন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে। অনেক বছর আগে ডেমিরিসের এক রক্ষিতা ছিল। তার নাম নোয়েলে পেজ।

–ওই অভিনেত্রী, তাই তো?

-হ্যাঁ, নোয়েলে বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছিল। ল্যারি ডগলাস নামে একজনকে সে বিয়ে করে। ডগলাস আর নোয়েলেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডগলাসের বউকে তারা হত্যা করেছিল। কারণ বউটি ডির্ভোস দিতে চায়নি। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস নেপোলিয়ান ছোটাস নামে একজন আইনজ্ঞকে ভাড়া করেছিলেন, নোয়েলেকে সাহায্য করার জন্য।

–হ্যাঁ, মনে পড়ছে, খবরের কাগজের পাতায় এই মামলা সম্পর্কে পড়েছিলাম।

–সব কথা কি আর খবরের কাগজের পাতায় লেখা থাকে। আপনি কি জানেন, আমার শালাবাবু তার বিশ্বাসঘাতিকা উপপত্নীকে মারতে চেয়েছিলেন? সে এইভাবেই প্রতিশোধ

নিতে চেয়েছে। সে নেপোলিয়ান ছোটাসকে ভাড়া করেছিল, যাতে নোয়েলের প্রাণদণ্ড হয়। যখন মামলা শেষ হয়ে আসছে। নেপোলিয়ান ছোটাস অভিযুক্তদের বলেছিল, বিচারকদের সঙ্গে তিনি একটা বোঝাপড়া করেছেন। এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আরও বলেছিলেন, যদি অভিযুক্তরা দোষ স্বীকার করে তাহলে মুক্তি পাবে। তারা দোষ স্বীকার করেছিল। এবং তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়।

হয়তো ছোটাস ভুল করেননি।

–আমাকে গল্পটা শেষ করতে দিন। ক্যাথেরিন ডগলাসের মৃতদেহটা কখনও পাওয়া যায়নি। কোনোদিন পাওয়া যাবে না মিঃ রিজোলি। আসলে উনি বেঁচে আছেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ওঁনাকে কোথাও আটকে রেখেছেন।

টনি রিজোলি তাকালেন পরিষ্কারভাবে–এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন তো, ডেমিরিস জানতেন ওই ভদ্রমহিলা বেঁচে আছেন! অথবা উনি ভেবেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকবেন, সাজানো কেসে রক্ষিতা আর তার প্রেমিক মারা যাবে, এই তো?

–হ্যাঁ, আপনার মাথাটা খুবই পরিষ্কার। আমি জানি না, এ ব্যাপারে আইন কী বলেছে। কিন্তু আমি জানি যে এটাই হল আসল সত্যি। আমার শালাবাবুকে বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টানতে হবে। সে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

টনি রিজোলি বসে থাকলেন। যে কথাগুলো এই মাত্র শুনেছেন তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলেন। শেষ অব্দি বললেন–মিঃ লামব্রো, আপনি আমাকে এসব কথা বলছেন কেন?

স্পাইরস লামব্রোর মুখে শয়তানের হাসি–আমি একটা সাহায্য চাইছি। আমি আন্তরিকভাবে চাইছি, আপনি আমার শালাবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। আমার মনে হচ্ছে সে বোধহয় আপনাকে সাহায্য করবে।

.

১৪.

এমন একটা ঝড় উঠল যার ওপর আমাদের কারোর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ঠান্ডা আরও প্রবল হল। এমন কোনো উষ্ণ স্মৃতি নেই, যা দ্রবীভূত হতে পারে। এক বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল। নোয়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, উনি ভেবেছিলেন এখানেই ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে, অতীত ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা কবরস্থ হয়েছে। মনের মধ্যে অনুশোচনা, অভাবিতভাবে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার আবার তার নিজস্ব জীবনে ফিরে গেছে। কিন্তু? ফ্রেডারিক স্টাভরস আর নেপোলিয়ান ছোটাস নেই। তাদের সঙ্গে মারাত্মক খেলা খেলা হয়েছিল। এই খেলায় উনি জিতেছেন। সত্যি কী? কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস জানেন না, কতটা দুঃখ তাকে পেতে হবে। উত্তেজনার বশে তিনি এই কাজ করে ফেলেছেন। ব্যবসাটা সাংঘাতিক।

জীবন এবং মৃত্যুর খেলা। আমি একজন খুনি–ডেমিরিস ভেবেছিলেন, না-না, আমি নিয়তি মাত্র। এইসব কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার হারানো সাহস আবার ফিরে এসেছিল।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের কাজকর্ম সম্পর্কে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেতে থাকেন। এখনও পর্যন্ত সবকিছু সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে। ক্যাথেরিনের

সামাজিক কাজকর্ম সীমাবদ্ধ আছে। ইভলিনের কাছ থেকে নিয়মিত খবর পাচ্ছেন তিনি। ক্যাথেরিন কোনো কোনো সময় কির্ক রেনল্ডসের সঙ্গে বেড়াতে যায়। রেনল্ডস ডেমিরিসের হয়ে কাজ করছেন, তাই সমস্যা হবে না। আহা, ওই বেচারি মেয়েটি বোধহয় এখন অসহায় হয়ে উঠেছে। ডেমিরিস ভাবলেন, রেনল্ডসের সাহচর্য সত্যিই ভালো। রেনল্ডস আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এটাই বোধহয় ভালো হয়েছে। ক্যাথেরিনকে আরও উৎসাহী করে তুলতে হবে, তবেই সে সাহচর্যের জন্য পাগল হবে। আহা, এরজন্য রেনল্ডসকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

কির্ক রেনল্ডসের সঙ্গে ক্যাথেরিনের রোজ দেখা হচ্ছে। তারা নিভৃত নিরালায় বেশ কিছুটা সময় কাটাচ্ছে। কি দেখতে খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু আচরণটা আকর্ষণীয়। ল্যারির সাথে দেখা হয়েছিল আমার। তার রূপে আমি মজে ছিলাম। ক্যাথেরিন ভাবতে থাকে। একটা পুরোনো প্রবাদ মনে রাখতে হবে দেখতে সুন্দর হলেই হয় না মনটা ভালো হতে হয়। কির্কের মনটা খুবই ভালো। তাকে বিশ্বাস করা যায়। সে এমন একজন পুরুষ যার ওপর নির্ভর করা যায়। ক্যাথেরিন ভাবল। আমার তো বয়েস হচ্ছে, আমি কি আর আগের মতো উচ্ছলা হতে পারব? ল্যারিকে আমি ভালোবেসেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে ওই ভালোবাসার মধ্যে ভুল ছিল। এখন আমি আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। আমি এমন একজন পুরুষকে চাইছি, যাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারব। যে আমার সত্যিকারের বন্ধু হবে। যার সাথে আমি একটা সুন্দর জীবন কাটাতে পারব। কোনো ব্যাপারে আর আমাকে চিন্তা করতে হবে না। কেউ আমাকে পাহাড়চূড়া থেকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে না। আমাকে কবরের অন্ধকারে দিন কাটাতে হবে না।

একদিন তারা দ্য লেডিস নট ফর বার্নিং– থিয়েটার দেখতে গেল। ক্রিস্টোফার ফ্রাই এই থিয়েটারের পরিচালক। আর একদিন বিকেলে গেল সেপ্টেম্বর টাইড নামে আর একটি থিয়েটার দেখতে। গারট্রুড লরেন্স এই বইতে দারুণ অভিনয় করেছেন। মাঝে মধ্যে তাদের নাইট ক্লাবে দেখা যায়। অর্কেস্ট্রার তালে তালে তারা নেচে ওঠে, বেজে ওঠে দ্যা থার্ডম্যান থিম অথবা লা ভি এন রোজ।

.

–আমি আগামী সপ্তাহে সেন্ট মরি-এ যাব। কিক রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে বলল, তুমি কি এই ব্যাপারে কিছু মনস্থির করেছ?

ক্যাথেরিন অনেক দিন ধরেই ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে। কির্ক তাকে ভালোবাসে, এ ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত। আমিও তাকে ভালোবাসি, ক্যাথেরিন ভাবল। কিন্তু ভালোবাসা হলেই কি বিয়ে হয়? আমি কি চিরদিন এভাবেই এক বোবা মেয়ের ভূমিকাতে অভিনয় করব? আমি কি আর একজন ল্যারির সন্ধান করব যে আমাকে আঘাত করবে? যে আমার সাথে ভাললাবাসার অভিনয় করবে কিন্তু আর একজন মেয়েকে শরীর দেবে? শেষ পর্যন্ত । আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। কির্ক কি সেই ধরনের? না, কির্ক এক অসাধারণ স্বামী হতে পারে। আমি কেন এই ব্যাপারে এত চিন্তাভাবনা করছি।

.

সে রাতে ক্যাথেরিন এবং কির্ক মিরাবেল-এ নৈশ আহার সারল। তারা যখন ডেজার্ট খাচ্ছে, কির্ক বলল, ক্যাথেরিন, আমি জানি না, তুমি বোঝ কি না,...আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এই কথা শুনে ক্যাথেরিনের মন কেমন করল কির্ক,...সে আর কোনো কথা বলতে পারল না। সে হয়তো বলতে চেয়েছিল, তোমার সাহচর্য আমার জীবনটাকে একেবারে পালটে দিয়েছে। কিন্তু মুখে কোনো কথা সে বলতে পারছে না কেন? অতীত কি তাকে ভয় দেখাচ্ছে? সে কি আবার একই পরিণতির আশঙ্কা করছে?

ক্যাথি...

–কির্ক...আমরা একসঙ্গে সেন্ট মরিত-তে যেতে পারি না।

কির্কের মুখে আলো জ্বলে উঠেছে–তুমি কী বলতে চাইছ?

দেখ, তুমি যদি সত্যি সত্যি আমাকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে এখন থেকে আরও কিছুটা সময় আমাদের একসঙ্গে কাটানো উচিত।

কির্ক হেসে উঠেছে ঠিকই তো, পৃথিবীর কোনো বাধাকে আমি মানব না। তোমাকে আমি খুব সুখী করব। চলো, নভেম্বরের পাঁচ তারিখটা আমরা একসঙ্গে কাটাই। জানো তো, এই দিনটা কত আনন্দের।

-কেন?

–এটা একটা কাল্পনিক গল্প। রাজা জেমসের নাম শুনেছ? উনি ক্যাথলিক বিরোধী ছিলেন। একদল বিশিষ্ট রোমান ক্যাথলিক সরকার ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। গাই ফক্স নামে একজন সৈন্যকে স্পেন থেকে নিয়ে আসা হয়। তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের নায়ক। তিনি একটন গানপাউডারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছত্রিশটা ব্যারেলের মধ্যে গানপাউডার ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। হাউস অফ লর্ডস-এর বেসমেন্টের নীচে এগুলি রাখা ছিল। সেই সকালে হাউস অফ লর্ডস উড়িয়ে দেবার কথা ছিল। কেউ একজন পুরো ঘটনাটা ফাস করে দেয়। সকলকে ধরে ফেলা হয়। গাই ফক্স-এর ওপর অত্যাচার করা হয়। কিন্তু তিনি কোনো কথা বলেননি। সকলকে ফাঁসি দেওয়া হল। প্রত্যেক বছর ইংল্যান্ডে এই দিনটা আনন্দের সঙ্গে কাটানো হয়। আতসবাজি পোড়ানো হয়। জায়গায় জায়গায় বনফায়ারের আগুন-আঁচ জ্বলে ওঠে। ছোটো ছোটো ছেলেরা নানা সাজে সেজে ওঠে।

ক্যাথেরিন মাথা নেড়ে বলল–বাহ্, এটা তো সুন্দর একটা ছুটির দিন?

কির্ক হেসে বললেন–হ্যাঁ, এসো, এই দিনটা আমরা একসঙ্গে কাটাব।

.

বাইরে যাওয়ার আগের রাত। ক্যাথেরিন চুল পরিষ্কার করছিল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। সে জানে, এতদিন পর্যন্ত তার জীবনে দুজন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে–উইলিয়াম ফ্রেজার এবং তার স্বামী। এবার কি তৃতীয় পুরুষ আসতে চলেছে? ক্যাথেরিন মনে মনে ভাবল, হায় ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি কবে সদয়

হবে? আমি কি আবার ভুল করতে চলেছি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই কি আমার সময় কেটে যাবে। জানি না, ভবিষ্যতে কী লেখা আছে আমার।

.

–মিঃ ডেমিরিস?

–বল।

–ক্যাথেরিন এই সকালে সেন্ট মরিত-এর উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

এক মুহূর্তের নীরবতা- সেন্ট মরিতজ?

-হ্যাঁ, স্যার।

–সে কি একা গেছে?

–না, কির্ক রেনল্ডসের সঙ্গে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা।

–অনেক-অনেক ধন্যবাদ ইভলিন।

কির্ক রেনল্ডস! অসম্ভব! কির্কের মধ্যে মেয়েটি কী দেখেছে? আমি বহুদিন অপেক্ষা করেছি, আমাকে এবার আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। আমি ওকে ভালোবাসা নিবেদন করব। কিন্তু কী করে?

সেক্রেটারি বলে উঠল–মিঃ ডেমিরিস, মিঃ অ্যান্থনি রিজোলি নামে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেননি। আমি...।

তাহলে কেন আমাকে বিরক্ত করছ? ডেমিরিস জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ইন্টারকমটা বন্ধ করে দিলেন।

ওটা আবার বিপ-বিপ শব্দ করতে শুরু করল আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মিঃ রিজোলি বলছেন যে, মিঃ লামব্রো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়েছেন। খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খবর? অবাক কাণ্ড! কী বলতে চাইছে ওই লোকটা?

-ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

–ঠিক আছে।

টনি রিজোলি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের অফিসে ঢুকে পড়লেন। তিনি প্রশংসার চোখে চারপাশে তাকালেন। স্পাইরস লামব্রোর থেকে অনেক সুন্দর সাজানো।

–আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুবই ভালো লাগছে আমার।

–আমি তোমাকে দুমিনিট সময় দেব।

–স্পাইরস আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি জানেন, আপনি আর আমি কিছুক্ষণ আলোচনা করলে ভালো হবে।

-সত্যি? কী বিষয়ে আমরা কথা বলব?

–আমি যদি বসি, আপনি কি কিছু মনে করবেন?

মনে হচ্ছে, তুমি বেশিক্ষণ এখানে থাকবে না। তাই তো?

টনি রিজোলি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমার একটা ম্যানুফাকচারিং প্ল্যান্ট আছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে জাহাজে করে আমি মাল পাঠাই।

এবার বুঝতে পারছি, তার মানে তুমি আমার একটা জাহাজ ভাড়া করতে চাইছ, তাই তো?

–আপনি ঠিক ধরেছেন।

–স্পাইরস কেন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে বলো তো? স্পাইরসের নিজের জাহাজের কী হল? ওর দুটো জাহাজ তো সবসময় চুপচাপ বসে থাকে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

টনি রিজোলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন–আমার মনে হচ্ছে, আমার কাজটা উনি করতে পারবেন না।

-কেন? কী ধরনের কাজ তোমার?

ড্রাগস, টনি বললেন, হেরোইন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস অবিশ্বাসের চোখে তাকালেন–তুমি বলতে চাইছ কী? এখুনি এখান থেকে চলে যাও। তুমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য

রিজোলি ফোনের দিকে তাকালেন। বললেন–ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তার আগে...

ডেমিরিস টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

–আমি ওদের দুজনের কথা বলব। আমি বলব নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের বিচারের কথা।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ফিরে এলেন।

–এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?

–আমি জানি, এমন একজন মেয়েকে হত্যার অপরাধে তাদের দুজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যে মেয়েটি কিন্তু বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

মনে হল, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

–আপনি কি মনে করেন পুলিশ এই গল্পটা একেবারেই বিশ্বাস করবে না, মিঃ ডেমিরিস? যদি একবার প্রেসের লোকজনদের ডেকে এই মুখরোচক খবরটা খাইয়ে দিই, তাহলে কী হবে? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হেড লাইন। আমি কি আপনাকে কোস্টা নামে ডাকতে পারি? স্পাইরস বলেছেন, বন্ধুরা আপনাকে কোস্টা বলে ডাকেন। মনে হচ্ছে, এখন থেকে আমরা দুজন ভালো বন্ধু হব। হব তো, নাকি? বন্ধুরা একে অন্যকে আঘাত করে না। আমি সব ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখব। কী, থাকব তো?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস চেয়ারে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত তার ঘড়ঘড় কণ্ঠস্বর শোনা। গেল–তুমি কী বলতে চাইছ?

-আমি আগেই বলেছি, আপনার একটা জাহাজ আমাকে দিতেই হবে। আমি আর আপনি এবার থেকে খুব ভালো বন্ধু হব। আপনি আর কখনও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না, এটা হল ব্যবসায়িক চুক্তি।

ডেমিরিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমি ব্যাপারটা ভাবতেই পারছি না। যদি কোনো সময় পুলিশ জানতে পারে যে, আমার জাহাজে চোরাই ড্রাগস আছে, তা হলে আমার ব্যবসাটা পুরো চৌপাট হয়ে যাবে।

–কে জানবে? এটা আমার ব্যবসা। আমি কোথাও মাইক খুঁকে বলে বেড়াব না। আপনি তো আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বললেন–তুমি আবার ভুল করছ। তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না। তুমি কি আমার আসল পরিচয় জানো?

-হ্যাঁ, এখন থেকে আপনি আমার নতুন অংশীদার হবেন। আমি আর আপনি একসঙ্গে অনেক দিন ব্যবসা করব। কাস্টা, থোকা আমার, আমি আপনাকে এই নামে ডাকছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি এখনই পুলিশের কাছে যাব। খবরের কাগজে খবরটা দিয়ে দেব। পুরো গল্পটা বলব। তারপর, তারপর দেখব, আপনার এই প্রভাব-প্রতিপত্তি কোথায় যায়। আপনার বিশাল সাম্রাজ্য তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে। আর আপনি রাস্তার ড্রেনে মুখ লুকোতে বাধ্য হবেন।

দীর্ঘ যন্ত্রণাদগ্ধ নৈঃশব্দ্য।

কী করে লোকটা এত খবর জেনেছে বলো তো?

রিজোলি বললেন–এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, আপনার পুরো ব্যাপার কিন্তু উনি জানেন। আপনি এখনও বোকামি করছেন। আপনি ভেবে দেখুন, কোন দিকে যোগ দিলে আপনার জীবনটা ভালো কাটবে? সামান্য এদিক-ওদিক হলেই কিন্তু বাকি জীবনটা আপনাকে কারাগারের মধ্যে কাটাতে হবে।

টনি রিজোলি ঘড়ির দিকে তাকালেন।

-ওঃ, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি আপনাকে ষাট সেকেণ্ড সময় দিলাম। এর মধ্যে মনস্থির করুন। আপনি কি আমার অংশীদার হবেন নাকি আমি এখনই অফিস থেকে বেরিয়ে যাব।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে দেখে মনে হল, এক মুহূর্তে তার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। তার মুখের রং হয়েছে ফ্যাকাশে। তিনি কোনো কিছু ভাবতে পারছেন না। সত্যিই তো, এত বড়ো সমস্যার সামনে তাকে কখনও দাঁড়াতে হয়নি। প্রেসের লোকেরা তাঁকে জীবন্ত চিবিয়ে খাবে। তাকে এক ভয়ংকর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এক জঘন্য হত্যাকারী।

স্টাভরস আর ছোটাসের অপমৃত্যু নিয়েও নতুন করে তদন্ত শুরু হবে।

ষাট সেকেন্ড কেটে গেছে কিন্তু।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মাথা নেড়ে বললেন–ঠিক আছে, ফিসফিসিয়ে বললেন, ঠিক আছে।...

টনি রিজোলি বললেন–আপনাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছে। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে আমি পারছি না।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস উঠে দাঁড়ালেন আমি এখনই রাজি হচ্ছি। তবে ব্যাপারটা চাপা থাকবে তো? তোমার কেউ একজন আমার জাহাজে থাকবে। তাই তো?

টনি রিজোলি বললেন হ্যাঁ, এটা ভদ্রলোকের চুক্তি।

মনে মনে তিনি ভাবলেন, আহা, আমার সমস্যার কী সুন্দর সমাধান হয়ে গেল!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মুখে বললেন–ঠিক আছে, এই চুক্তি আমরা কেউ কোনোদিন ভাঙব না।

.

হোটেলে ফিরে টনি রিজোলি আনন্দে আত্মহারা। জ্যাকপট, শেষ পর্যন্ত এই জ্যাকপটে তিনি জিতেছেন। তিনি কখনও ভাবতেই পারেননি, স্বপ্ন সফল হবে। হায় ক্রাইস্ট, তুমি কত সদয় আমার প্রতি! পুলিশ কখনও কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের জাহাজে হাত দেবে না। আর এইভাবে, কত কিছু বাইরে চলে যাবে। হেরোইনের পাশাপাশি দামী প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস। দুঃখিত ভিক্টর, হেসে উঠলেন টনি, আহা, ওই দামি জিনিসগুলো...

রিজোলি পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে দুটো ফোন করলেন। প্রথমটি গেল পেটে লুক্কার কাছে, পালারমোতে।

–দুজন গরিলাকে এখান থেকে নিয়ে যাও পেটে, তাদের চিড়িয়াখানায় ভরে দাও। সেটাই তাদের আসল বাসস্থান। আমি খুব শীঘ্রই কাজ করতে শুরু করব।

–ব্যাপারটা ঠিক থাকবে তো? নিরাপদ?

রিজোলি হেসে উঠলেন–ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড-এর থেকে নিরাপদ। আমি তোমাকে সব কথা বলব দেখা হলে। আরও খুশির খবর আছে। প্রত্যেক সপ্তাহে জাহাজ যাবে।

সুন্দর টনি! তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে আমি পারছি না। সত্যি, সত্যি তুমি প্রশংসার যোগ্য।

টনি মনে মনে একটা খারাপ গালাগালি দিলেন। তারপর? তারপর আর কী?

.

দ্বিতীয় ফোনটি করেছিলেন স্পাইরস লামব্রোকে।

–সবকিছু ঠিকঠাক এগিয়েছে। আপনারা শালা রাজি হয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে ব্যবসা করবেন।

ধন্যবাদ। খবরটা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে মিঃ রিজোলি।

স্পাইরস লামব্রো রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। হাসলেন। তা হলে? নারকোটিক্স স্কোয়াড কাজ করতে শুরু করেছে!

.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস অফিসে ছিলেন, মধ্যরাত অব্দি। চুপ করে বসেছিলেন ডেস্কের ওপর। তিনি নতুন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। নোয়েলে পেজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, এখন বোধহয় কবর থেকে নোয়লে পেজ উঠে এসেছে। তাঁকে অনুসরণ করছে ছায়ার মতো। তিনি ডেস্ক ড্রয়ারের দিকে তাকালেন। নোয়েলের একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। কুকুরী! ঈশ্বর, ও এখনও এত সুন্দরী! তবে সে কেন আমাকে মারতে চাইছে? দেখা যাক, কী করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

.

১৫.

সেন্ট মরিতজ একটুকরো স্বর্গ। সেখানে স্কি খেলার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে হাইকিং উপত্যকায়। শ্লেজের পিঠে চড়েও যাওয়া যায়। পোলো টুর্নামেন্টের আসর বসে। বিনোদনের কত উপকরণ থরথরে সাজানো। উজ্জ্বল আলোকিত ঝরনা আছে। আছে নীল জলের হ্রদ। এনগাডিন ভ্যালি, ছ হাজার ফুট উঁচুতে। আলপসের দক্ষিণ দিকে সেলেরিনা এবং পিজ নায়ারের মধ্যে। সেখানে আছে এক ছোট্ট গ্রাম। ক্যাথেরিন তো আনন্দে আত্মহারা।

ক্যাথেরনি এবং কির্ক প্যালেস হোটেলে আছে। লবিতে নানা দেশের ট্যুরিস্টদের ভিড়।

কির্ক রিসেপশন ক্লার্ককে বলেছে- মিঃ এবং মিসেস রেনল্ডসের জন্য একটি ঘর বুক করতে হবে।

ক্যাথেরিন তাকিয়ে থেকেছে, আমার হাতে একটা বিয়ের আংটি পরা উচিত ছিল। সে জানে, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাজকর্ম দেখছে।

–মিঃ রেনল্ডস, ২১৫ নম্বর ঘর। ক্লার্ক জবাব দিয়েছে। বেলবয়ের হাতে চাবিটা তুলে দিয়েছে। বেলবয় বলেছে, এই দিকে চলুন প্লিজ।

আহা, অসাধারণ সাজানো একটি ছোট্ট সুইট। এখানে দাঁড়ালে পাহাড়ের দৃশ্য চোখে পড়ে প্রত্যেকটি জানালা থেকে।

বেলবয় চলে গেছে। কির্ক ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে বলেছে–ডার্লিং, সত্যি করে বলো তো, তুমি খুশি হয়েছ কিনা?

–হ্যাঁ, ক্যাথেরিন জবাব দিয়েছে। অনেক দিন ধরে আমি এমন একটা ছুটির স্বপ্ন দেখেছি।

–ভয় পেও না, তোমাকে আমি আরও সুখ দেব।

ও আমার এত কাছের মানুষ, ক্যাথেরিন ভেবেছে। কিন্তু আমি আমার অতীতের কথা বললে ও কি চলে যাবে? আমাকে ঘৃণা করবে? ল্যারির কথা এখনও পর্যন্ত সে কির্ককে বলেনি। এমনকি ওই হত্যার বিচারের কথা। কিন্তু তার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে, সেগুলো না বললে সে ভারমুক্ত হতে পারবে না। ক্যাথেরিনের হঠাৎ মনে হল, সবকিছু তাকে বলতেই হবে।

–আমি জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখি, ক্যাথেরিন বলল।

সে ধীরে ধীরে সব কিছু খুলছে। ধীরে ধীরে, আনন্দের মুহূর্তটিকে সে আরও দীর্ঘায়ত করতে চাইছে। সে জানে অতীতের কথা বললে হয়তো স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

অন্য একটা রুম থেকে কির্কের গলা শোনা গেল ক্যাথেরিন...

কির্ক? এখনই কির্ক জামাকাপড় খুলবে নাকি? বিছানায় যাবার জন্য অনুরোধ করবে?

ক্যাথেরিন ঢোক গিলে বলল–কী বলছ?

–চল না, আমরা বাইরে বেরিয়ে আসি, চারপাশ দেখে আসি।

ক্যাথেরিনের মন থেকে আশঙ্কার কালো মেঘ উড়ে গেল।

–বাঃ তোমার পরিকল্পনাটা চমৎকার।

বিশ্বের অন্যতম রোমান্টিক জায়গা। একজন প্রিয় মানুষ আমাকে ভালোবেসেছে। আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছি।

রেনল্ডস, তার দিকে তাকিয়ে আছে তুমি ঠিক আছ তো?

ক্যাথেরিন বলল–ঠিক আছি।

–তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

না, আমি অনেক কিছু ভাবছি। স্কি-এর কথা ভাবছি। স্কি করতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না। স্কি করা বেশ বিপজ্জনক।

রেনল্ডস হাসলেন। ভয় পেও না, কাল তোমাকে একটা সুন্দর ঢালু জায়গাতে নিয়ে যাব। কাল সকালেই যাবে।

সোয়েটার পরা হয়েছে, জ্যাকেটও। তারা বাইরের ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে বেড়িয়ে এল। ক্যাথেরিন একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল–আঃ, কিক, আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি।

-সত্যিই তো! কির্ক বলে ওঠে, গরমকালে এলে দেখবে জায়গাটা আরও সুন্দর হয়েছে।

গরমকালে কেন তারা আসতে চায়? ক্যাথেরিন ভাবল, আমি কি সত্যি সত্যি তার কাছে এক অসাধারণ মহিলা? নাকি সে ভালোবাসার অভিনয় করছে!

.

সেন্ট মরিতজ, নামটি সত্যি সুন্দর। মধ্যযুগীয় ছাপ আছে সর্বত্র। পুরোনো দিনের দোকান, রেস্টুরেন্ট, আছে রাজকীয় সৌন্দর্যের পটভূমি।

তারা এক দোকান থেকে অন্য দোকানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। ক্যাথেরিন ইভালিন আর উইমের জন্য উপহার কিনল। তারা একটা ছোট্ট কাফেতে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কফি খেল।

বিকেলবেলা কির্ক একটা শ্লেজ ভাড়া করেছিল। তারপর তুষার ঢাকা পথ দিয়ে এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

কেমন লাগছে?

দারুণ! ক্যাথেরিন চোখ বুজে জবাব দিয়েছিল। তোমাকে আমি আরও আরও সুখ দেব। আজ রাতে। হ্যাঁ আজ রাতে। তুমি কত সন্তুষ্ট হবে, প্রিয় আমার, ক্যাথেরিন মনে মনে উচ্চারণ করেছিল।

.

সেইদিন বিকেল বেলা, তারা স্টুবলি হোটেলে খাওয়া সারল। এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে পুরোোনো কাউন্ট্রি সরাইখানার ছাপ আছে।

–এটা ১৪৮০-র, দেখেছ? কির্ক জানতে চাইল।

–তাহলে তো আমরা পাউরুটি অর্ডার না দিলেই ভালো হয়।

–কী?

–কিছু না। এমনি ঠাট্টা।

ছোটো ছোটো কৌতুক কির্ক কি বুঝতে পারছে? ল্যারি কিন্তু সব জোকস বুঝতে পারত। ল্যারির কথা কেন মনে হচ্ছে? আমি কেন আগামী রাত্তিরের কথা ভাবছি না? আমি কি মারি আর্তোনিয়া যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে? ডিজার্টটা তার মোটেই ভালো লাগল না।

মিলটা ছিল সত্যিই সুস্বাদু। ক্যাথেরিন এত ভয় পেয়েছে যে, ভালোভাবে খাওয়াটাকে উপভোগ করতে পারেনি। খাওয়া শেষ হল।

রেনল্ডস বলল–আমরা ওপরে যাব? কাল সকালে তোমার স্কি খেলার আসর বসবে।

দারুণ দারুণ লাগছে। ওরা ওপরে চলে গেল। ক্যাথেরিনের হৃদয় লাফাচ্ছে। এখানে এভাবে কতক্ষণ থাকব? এখনই বিছানায় শুতে যেতে ইচ্ছে করছে। ও কেন এত দেরি করছে।

রেনল্ডস দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালাল। বেডরুমের দিকে হেঁটে গেল। ক্যাথেরিন বিরাট বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে, খাটটা বোধহয় গোটা ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কির্ক তাকে দেখছিল–ক্যাথেরিন, তুমি কি কোনো ব্যাপারে চিন্তিত?

-কেন? ছোট্ট হাসি। নানা, আমি কিছু ভাবছি না।

–কী ভাবছ বলো তো সত্যি করে?

হাসি উজ্জ্বল হল–না, আমি ভালোই আছি।

এসো, আমরা পোশাক খুলে বিছানাতে চলে যাই।

ক্যাথেরিন মনে মনে বলল–এটাই আমি ভয় করছিলাম। কিন্তু এখন ও আর কী বা বলবে? এখন তো এ কথাই বলবে।

–তুমি কী বলছ? ক্যাথেরিন বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। এবার চিৎকার করে বলল, না, আমি কিছুই বলছি না।

ক্যাথেরিন বিছানার দিকে এগিয়ে গেছে। এত বড়ড়া খাট সে এ জীবনে কখনও দেখেনি, এই খাট কি প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য তৈরি হয়েছে। শুধু প্রেম নিবেদনের জন্য? না, এই খাটে শুধুমাত্র শোওয়া হয় না, তার থেকেও বেশি কিছু।

ডার্লিং, তুমি কি নিজেকে উন্মোচিত করবে না। আমার যে সবকিছু দেখতে ইচ্ছে করছে।

–আমি? ক্যাথেরিন ভাবল, শেষ কবে এক পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি? এক বছরের বেশি হয়ে গেছে, সে ছিল আমার বিবাহিত স্বামী।

-ক্যাথি?

–হ্যাঁ, বল।

আমি পোশাক খুলব কেমন করে? কেনই বা বিছানাতে যাব? না, আমি তোমাকে হতাশ করব। সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনও ভালোবাসতে পারিনি তোমায়, কির্ক, একটা সরল সত্য তোমাকে শুনতেই হবে, আজ রাতে আমি তোমার পাশে শোব না।

এই সবই ক্যাথির স্বগতোক্তি।

সে কেবল বলল–কির্ক।

কির্কের পোশাক আর্ধেক খোলা হয়েছে। কির্ক বলল, বল, কী বলছ?

–কির্ক, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। তুমি হয়তো আমাকে ঘেন্না করবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি...

কথারা সব হারিয়ে গেছে, ক্যাথির চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের হতাশা।

কির্ক হাসল, জোর করে। ক্যাথি, আমি ধৈর্য ধরতে ভালোবাসি। তুমি যদি আজ তৈরি না হও, আমি কিছুই মনে করব না। এখানে দিনগুলো ভালোই কাটছে, হতাশার মেঘ কেন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করবে বলো?

ক্যাথি এগিয়ে এল। কির্ক এত বুঝদার, সে ভাবতেই পারেনি। সে কির্কের ঠোঁটে চুমু খেল। বলল–কির্ক, অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম।

-এত ভাববার কী আছে। আমি বুঝতে পেরেছি।

মনে মনে কির্ক আহত হয়েছে। মুখে প্রকাশ করেনি।

ক্যাথি বলল, তোমাকে এক দেবদূতের মতো মনে হচ্ছে।

কির্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল–আমি লিভিং রুমের কৌচে গিয়ে শুয়ে পড়ছি।

-না, তা কখনো হবে না। ক্যাথি বলল, আমিই তো এই সমস্যার সৃষ্টি করেছি। দেখা যাক। এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারি কিনা। তুমি এই বিছানাতে শোও, আমি কৌচে শোব।

–তা কখনওই হবে না।

.

ক্যাথেরিন বিছানাতে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না তার। রাত এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার চোখদুটো খোলা। অনেক কিছু ভাবছে সে। বিশেষ করে কির্কের কথা। ভাবছে, আমি কি অন্য এক পুরুষের সঙ্গে ভালোবাসার খেলা খেলতে পারি? ল্যারি কি আমাকে ভস্ম করে দেবে? ল্যারি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন ঘুমিয়ে পড়ল।

.

মাঝরাতে কির্ক রেনল্ডসের ঘুম ভেঙে গেল। একটা আর্ত চিৎকার। সে কৌচের ওপর উঠে বসল। তখনও চিৎকারটা ভেসে আসছে। সে দ্রুত বেডরুমে চলে এল।

ক্যাথেরিন বোধহয় বিছানা থেকে পড়ে যাবে। তার চোখ দুটো বন্ধ। সে গোঙাচ্ছে—না না, আমাকে একা ছেড়ে দাও।

রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে তুলে ধরল। কোলে করে রাখল কিছুক্ষণ। তার মুখে হাত দিল–শ-শ-শ! তুমি ঠিক আছো, তুমি ঠিক আছে তো?

ক্যাথেরিনের সমস্ত শরীর কাঁপছে। রেনল্ডস ক্যাথেরিনকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

–ওরা আমাকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করছে।

রেনল্ডস বলল–এটা একটা স্বপ্ন, তুমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছ।

ক্যাথেরিন চোখ খুলল, উঠে বসল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে না, এটা দুঃস্বপ্ন নয়, এটা সত্যি। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

কির্ক ক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক এবং বিব্রত।

কারা তোমাকে মারতে চেয়েছিল?

আমার স্বামী এবং তার রক্ষিতা।

কির্ক অবাক হয়ে গেছে–ক্যাথেরিন, এটা একটা দুঃস্বপ্ন!

–না এটাই সত্যি। ওরা আমাকে খুন করতে এসেছিল। এজন্য ওদের ফাঁসি হয়েছে।

কির্কের মুখে অবিশ্বাসের ছায়া–ক্যাথেরিন?

–আমি আগে বলিনি, কারণ এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আমি মনে মনে কষ্ট পাই।

কির্ক বুঝতে পারল, ক্যাথেরিন সত্যি কথাই বলছে–কী ঘটেছিল খুলে বলবে কী?

–আমি আমার স্বামী ব্যারিকে ডিভোর্স দিতে রাজি ছিলাম না। সে শেষ পর্যন্ত আর এক মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। ওরা দুজনে মিলে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।

কির্ক আরও ভালোভাবে শুনতে চাইছে কখন এই ঘটনাটা ঘটেছিল বলবে?

–একবছর আগে।

–ওদের কী হয়েছে?

–ওদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র এই অপরাধের বিচার করেছে।

রেনল্ড, একটা হাত তুলল এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো, ওদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তোমাকে হত্যার চেষ্টা করার জন্য?

-হ্যাঁ।

রেনল্ডস বলল–আমি কিন্তু এই দেশের আইনকানুন খুব একটা ভালো জানি না। তবে আমি একটা ব্যাপারে বাজি ফেলতে পারি, সত্যি সত্যি যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি, তার অপরাধে কখনও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। কোথাও একটা ভুল হয়েছে। এথেন্সের এক আইনজীবীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। ওই ভদ্রলোক রাষ্ট্রের হয়ে মামলা লড়েন। কাল সকালে আমি ওঁনাকে ডেকে পাঠাব। ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে হবে। ওঁনার নাম হল পিটার ডেমোনিডাস।

.

ক্যাথেরিন ঘুমিয়ে পড়েছে। কির্ক রেনল্ডস জেগে আছে। সে ভালোভাবে পোশাক পরে নিয়েছে। বিছানার দিকে হেঁটে গেছে। সেখানে সে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাথেরিনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল। আমি ওকে এত ভালোবাসি, আসল রহস্যটা উদ্ঘাটন করতেই হবে। ওর মন থেকে ভয়ের মেঘগুলোকে সরাতে হবে।

.

কির্ক রেনল্ডস হোটেলের লবিতে চলে গেল। এথেন্সে ফোন বুক করল অপারেটর, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। পিটার ডেমোনিডাস।

আধ ঘণ্টা বাদে ফোন বেজে উঠল।

–মিঃ ডেমোনিডাস, আমি কির্ক রেনল্ডস বলছি। আপনি কি আমাকে মনে রেখেছেন?

–হ্যাঁ, আপনি তো কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ওখানে কাজ করেন। তাই না?

–হ্যাঁ।

মিঃ রেনল্ডস, আমি আপনাকে কি কোনো সাহায্য করতে পারি?

–আপনার মতো ব্যস্ত মানুষকে বিরক্ত করছি বলে আমায় ক্ষমা করবেন। একটা খবর পেয়ে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি। এটা গ্রিক আইনের ব্যাপার।

–গ্রিক আইন সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু পড়াশোনা আছে। কী বলতে চাইছেন, খুলে বলুন তো। হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

–যদি কাউকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, সেই অপরাধীর কি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে? ওদিকে দীর্ঘ নীরবতা। তারপর

–আমি কি জানতে পারি, কার ব্যাপারে আপনি এই প্রশ্ন করছেন?

-আমি এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে এখানে আছি। সে হল ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। সে তার স্বামী এবং স্বামীর রক্ষিতার কথা বলছে। এরা দুজনে মিলে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ওই অপরাধের জন্য রাষ্ট্র তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা ফঁক আছে বলে মনে হচ্ছে। আশা করি আপনি আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছেন।

–হ্যাঁ। ডেমোনিডাসের কথা শুনে মনে হল তিনি চিন্তিত।

আমি ভেবে দেখছি, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করা যেতে পারে। আপনি এখন কোথায় আছেন মিঃ রেনল্ডস?

–আমি সেন্ট মরিতজ-এর প্যালেস হোটেলে আছি।

–দেখছি, আমি আপনাকে ফোন করে সবকিছু জানাব।

–তাহলে তো ভালোই হবে। আমার মনে হচ্ছে, আলেকজান্ডার হয়তো কল্পনা করছে। আমি এই ব্যাপারটা ওর মন থেকে দূর করতে চাইছি।

–আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, আমি বলছি, শিগগিরই আপনাকে জানাব।

.

বাতাস পরিষ্কার, আলোকোজ্জ্বল একটি দিন। ক্যাথেরিনের চারপাশ আনন্দে ভরপুর। রাতের আতঙ্ক কোথায় উবে গেছে।

তারা একটা গ্রামে বসে সকালের প্রাতঃরাশ সারল। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

রেনল্ডস বলল চলো, আমরা স্কি স্লোপে চলে যাই, তোমার জন্য একটা দারুণ উপহার অপেক্ষা করে আছে।

কির্ক ক্যাথেরিনকে প্রশিক্ষণের স্লোপে নিয়ে গেল। একজন প্রশিক্ষককে ভাড়া করল।

ক্যাথেরিন অনভ্যস্তের মতো স্কি-তে উঠে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাপারটা তার কাছে সত্যিই হাস্যস্পদ মনে হতে লাগল।

–কী হল? কির্ক জিজ্ঞাসা করল।

–কির্ক, ভীষণ ভালো লাগছে।

প্রশিক্ষক হেসে উঠলেন- ভয় পাবেন না। প্রথমদিকে এমনই অবস্থা হবে। মিস আলেকজান্ডার, চলুন আমরা কোরভিগ্লিয়ার দিকে চলে যাই। ওই জায়গাতেই স্কি করতে সুবিধা।

খুব তাড়াতাড়ি তুমি এই খেলাটা শিখে যাবে। রেনল্ডস আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে ওঠে।

একটা স্কি দূরে ছুটে যাচ্ছে দেখে সে প্রশিক্ষককে বলল–আমি কোথায় যাব? গ্রিসচাতে?

-হ্যাঁ, সেখানেই ভালো হবে। ক্যাথেরিন জবাব দিল।

–হাসি নয়, এবার সত্যি সত্যি স্কি খেলা শুরু হয়ে গেছে। কির্ক বলল, আমার স্কিটা কিন্তু দৌড়াতে শুরু করেছে।

ক্যাথেরিন কেমন অবাক হয়ে গেছে। আমাকে ওর সঙ্গেই থাকতে হবে, ক্যাথেরিন ভাবল।

প্রশিক্ষক বললেন–গ্রিসচা খুব সুন্দর জায়গা। ভালোভাবে সেখানে স্কি খেলা যেতে পারে। আপনি কোরভিগ্লিয়া স্ট্যান্ডার্ড-এ চলে যান।

-ঠিক বলেছেন, ওখানেই যাব। ক্যাথেরিন, দুপুরে লাঞ্চে দেখা হচ্ছে, কেমন?

–ঠিক আছে।

রেনল্ডস অতি দ্রুত চোখের বাইরে চলে গেল। ক্যাথেরিন চিৎকার করে বলল–ভালোভাবে সময় কাটিও কিন্তু।

–ঠিক আছে, প্রশিক্ষক বললেন, এবার আমাদের কাজ শুরু হবে।

.

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাথেরিন এই খেলাতে মেতে উঠল। প্রথম দিকে সে খুবই ভয় পেয়েছিল। পরে বুঝতে পারল, না, বরফের মধ্যে পড়ে গেলেও লাগবে না।

–সামনের দিকে ঝুঁকুন। সামনের দিকে স্কি-কে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

–ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি মন দিচ্ছি।

–আপনি খুব তাড়াতাড়ি এই খেলাতে উন্নতি করবেন। যেখানে বাঁক আছে, সেখানে সাবধানে চালাবেন। হাঁটু মুড়ে বসবেন। ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

প্রথমবার ক্যাথেরিন পড়ে গেল।

–আরও একবার। এবার আপনি পারবেন। আবার ক্যাথেরিন পড়ে গেল। প্রত্যেক বারই পা হড়কে যাচ্ছে তার। শেষ পর্যন্ত সে ভারসাম্য বুঝতে পারল। আহা, সে বুঝি এক মুক্ত বিহঙ্গ, দুপাশে দুটি ডানা হয়েছে তার। সে সাবধানে ঢালুর ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। আহা, এই খেলাটায় উত্তেজনা আছে। সত্যি সে আকাশে ভেসে উঠেছে। বাঁকের মুখে

অদ্ভুত উত্তেজনা। মাটির তলায় এত বরফের টুকরো, বাতাস তীক্ষ্ণ ছুরির মতো তাকে আঘাত করছে।

ক্যাথেরিন বলল–ভালো লাগছে। এখন বুঝতে পারছি কেন লোকেরা স্কি খেলতে চায়। আমি বড়ো ধাপে কখন যাব?

প্রশিক্ষক হাসলেন–আজকে এই পর্যন্ত থাক। কাল আমরা অলিম্পিকসে যাব।

আহা, সব মিলিয়ে মনে রাখার মতো একটি সকাল।

.

কির্কের জন্য ক্যাথেরিন অপেক্ষা করছে, গ্রিল রুমে। কখন কির্ক ফিরবে? কির্ক এল। সে ক্যাথেরিনের কাছে এসে দাঁড়াল।

-কেমন লাগল?

দারুণ! আমি তো বুঝতে পারিনি, এই খেলাটার মধ্যে এত উত্তজনা লুকিয়ে আছে। ছ-ছবার আমি পড়ে গিয়েছি। তোমার কেমন কটেছে? একটা খবর দেব। কাল আমরা অলিম্পিকসে যাব।

রেনল্ডস বলল–বাঃ, একদিনে দারুণ উন্নতি!

পিটার ডেমোনিসের কথা রেনল্ডস শোনালো। ক্যাথেরিনকে আর ভয় দেখিয়ে কী লাভ?

লাঞ্চ শেষ হয়ে গেছে। বরফের রাজত্বে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কদাচিৎ কোনো দোকানে দাঁড়াচ্ছে কিছু কেনাকাটা করার জন্য। ক্যাথেরিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

চলো, আমরা ঘরে ফিরে যাই। দুপুরবেলা না ঘুমোলে আমি আর পারব না।

-ঠিক বলেছ, এখানে বাতাস বেশ পাতলা? তাই বোধহয় এতটা তাড়াতাড়ি তুমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছ। তুমি এতে অভ্যস্ত নও। তোমার ঘুমিয়ে নেওয়াই ভালো।

–কির্ক, তুমি এখন কী করবে?

–আমি ভাবছি, গ্রিসচাতে চলে যাব। সেখানে গিয়ে স্কি করব। সেখানে কখনও স্কি করিনি। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

–তুমি বলতে চাইছ, সবকিছু ওখানেই আছে।

–কী?

–এই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ।

রেনল্ডস মাথা নাড়ল।

–আমার কাছে এই স্কিটা একটা মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ।

–ক্যাথেরিন মাথা নেড়ে বলল–কির্ক, কালরাতের ঘটনাটা ভুলে যাও। আজ আমি আরও ভালো হবার চেষ্টা করব।

-না-না, তোমার ব্যবহারে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখ পাইনি। তুমি হোটেলে ফিরে যাও। একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো।

-ঠিক আছে।

ক্যাথেরিন তাকিয়ে থাকল কির্কের দিকে। আঃ, সত্যি কির্ক এক দারুণ পুরুষ! সে যে কেন আমার মতো একটা বোকা মেয়ের প্রেমে পড়ল!

.

ক্যাথেরিন অনেকক্ষণ ঘুমোল। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙল। কী ভাগ্য তার। আজ ঘুমের মধ্যে সে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে আর্তনাদ করেনি। সন্ধ্যে ছটা বেজে গেছে। কির্ক এখনই। ফিরবে।

ক্যাথেরিন চান করল। পরিপাটি করে সাজল। সামনে যে সন্ধ্যাটা এগিয়ে আসছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করল। না, রাতটা, এই রাতটা সে আজ কির্ককে উপহার দেবে।

জানালার ধারে এগিয়ে গেল। তাকিয়ে থাকল। অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে। কির্ক নিশ্চয়ই এখনও আনন্দঘন মুহূর্ত কাটাচ্ছে, ক্যাথেরিন ভাবল। সে দূরের ওই পাহাড় চূড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ওটাই কি গ্রিসচা? জানি না, ওখানে স্কি করতে কেমন লাগে?

.

সাতটা বেজে গেজে, কির্ক রেনল্ডস এখনও ফিরল না কেন? গোধূলির আলো চারপাশের পরিবেশকে মায়াবি করে তুলেছে। একটু বাদেই অবশ্য এই আলো ঘন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। অন্ধকারে কেউ কি স্কি করতে পারে? ক্যাথেরিন মনে মনে ভাবল। মনে হচ্ছে, ও বোধহয় কোথাও বসে ড্রিঙ্ক করছে।

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ক্যাথেরিন হাসল, আমি ঠিকই ভেবেছি। ও বোধহয় আমাকে ডাকছে।

রিসিভারটা তুলল। উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠস্বরে–তুমি কোথায়? তুমি কি কোনো শেরপার দেখা পেয়েছ?

একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর–শ্রীমতী রেনল্ডস?

ক্যাথেরিন নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, হোটেলের খাতায় এই নামই লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি শ্রীমতী রেনল্ডস বলছি।

–একটা খারাপ খবর আছে। আপনার স্বামীর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট? মারাত্মক কিছু কী?

সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে আমার কেমন যেন হচ্ছে।

–বলুন, কী হয়েছে?

–অ্যাকসিডেন্টে উনি মারা গেছেন। লাগাল্প-এ উনি স্কি করছিলেন। ঘাড় ভেঙে পড়ে আছেন।

একেবারে উলঙ্গ

১৬.

টনি রিজোলি তাকে দেখল। আহা, বাথরুম থেকে সে একেবারে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে। ভাবল, গ্রিক মহিলাদের স্তনদুটি অত বড়ো হয় কেন?

সে অতি দ্রুত বিছানায় চলে গেল। তার গলা জড়িয়ে ধরল। ফিসফিসিয়ে বলল তোমাকে পেয়ে আমি খুবই খুশি। তোমায় দেখে ইস্তক আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।

টনি রিজোলি এখন আনন্দে আছে। কুকুরীর বাচ্চা, আহা, কত সুখ আজ দেবে তাকে।

সে বলল–হ্যাঁ, এসো। আজ তোমার সব আনন্দ আমি মিটিয়ে দেব।

.

কালারি স্ট্রিটের দি নিউইয়র্কার একটি নাইট ক্লাব, সেখানেই মেয়েটির সাথে দেখা হয়েছে টনির। মেয়েটি সেখানে গায়িকা হিসেবে কাজ করে। সে ভারি সুন্দর গান গায়। কিন্তু গলাটা কেমন? কুকুরের চিৎকার? সেখানে যে-সমস্ত মেয়েরা গান গায়, তারা কেউই গায়িকা হিসেবে নাম করতে পারেনি, তারা শরীরের ছলাকলায় একে অন্যকে হারিয়ে দেয়, তাদের সকলকে বাড়িতে আনা যায়, উপযুক্ত টাকার বিনিময়ে। এ মেয়েটির নাম হেলেনা, দেখতে খুব একটা খারাপ নয়, কালো চোখ আছে, মুখে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার আভাস। শরীরটা খুবই সুন্দর। যেখানে যতটা মেদ থাকা দরকার, ততটাই আছে। বয়েস

চব্বিশ বছর, রিজোলির পছন্দের তুলনায় একটু বুড়ি। কিন্তু এথেন্সের আর কোনো মেয়ের সাথে তার পরিচয় নেই। তাই এ মেয়েটিকে নিয়েই...

–তুমি কি আমাকে পছন্দ করেছ? হেলেনা জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, না হলে তোমাকে ভাড়া করব কেন?

টনি ধীরে ধীরে মেয়েটির স্তনবৃন্তে হাত ঘোরাতে থাকল। বুঝতে পারল, মেয়েটির বৃন্তদুটি দৃঢ় হয়ে উঠছে। মোচড়ালো। উঃ, যন্ত্রণার শিৎকার।

–বেবি, মাথাটা একবার নীচু করবে কী?

হেলেনা বলল–আমি এটা করতে পারি না।

রিজোলি বলল–সত্যি?

পরের মুহূর্তে সে মেয়েটির চুলে হাত দিল।

হেলেনা বলল–কী করছ?

রিজোলি তার গালে চড় মেরে বলল–আর একটা শব্দ করলে আমি তোমার ঘাড় ভেঙে দেব।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

রিজোলি তার মাথাটা নামিয়ে দিল, দুটি পায়ের ফাঁকে। বলল, কাজটা এখনই শুরু করো। আমাকে আনন্দ দাও। দেখবে, তোমার দুহাতে আমি টাকার থলে তুলে দেব।

হেলেনা বিড়বিড় করে বলছে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ।

রিজোলি ক্ষেপে গেছে। সে দুটি পা দিয়ে শক্ত করে মেয়েটির মুখ চেপে ধরেছে।

যা বলছি তা এখুনি করো।

রিজোলি একহাতে মেয়েটির চুল ধরে টানছে। আহা, মেয়েটির লাগছে বোধহয়।

–তুমি যেতে পারো...।

সে রিজোলির মুখের দিকে তাকাল। না এই খদ্দেরটা মনে হচ্ছে খুবই খারাপ। তার কথা অমন অসমাপ্ত থেকে গেল।

মারমারি করে কী লাভ? মেয়েটি বলল, তোমার আর আমার মধ্যে ভালোবাসা থাকা দরকার।

রিজোলির আঙুলগুলি দ্রুত খেলা করছে।

আমি তোমাকে কথা বলার জন্য ভাড়া করিনি। আর একটা ঘুষি, মেয়েটির মুখ লক্ষ্য করে চুপ করো, কাজ শুরু করো।

-ঠিক আছে, সুইট হার্ট, হেলেনা বলল, ঠিক আছে।

.

রিজোলি আজ স্বাভাবিক ছন্দে ছিল না। কিন্তু যখন সে সুখী হল, তখন হেলেনা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। সহ্যের সীমার একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে সে। হেলেনা চুপ করে জেগে থাকল যতক্ষণ না রিজোলি ঘুমিয়ে পড়ছে। শেষ অব্দি সে পোশাক পড়ে নিল। তার সর্বত্র যন্ত্রণা হচ্ছে। অন্য সময় হলে সে হয়তো ওয়ালেট থেকে টাকা ছিনিয়ে নিত। কিন্তু এখন কিছুই করল না। তার কোনো একটা অনুভূতি তাকে বাধা দিতে লাগল। সে প্রাপ্য বা বকশিশ, কোনো ধরনের টাকা না নিয়েই ঘর থেকে চলে গেল।

এক ঘন্টা কেটে গেছে। টনি রিজোলির ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় কে আঘাত করছে? রিজোলি উঠে বসলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। ভোর চারটে বেজে গেছে। মেয়েটা কোথায়?

তিনি বললেন কে?

বাইরের কণ্ঠস্বরে রাগ ঝরে পড়ছে–তোমার জন্য একটা টেলিফোন এসেছে।

রিজোলি মাথায় হাত দিলেন আমি এখুনি আসছি।

রিজোলি পাশের ঘরে গেলেন। ট্রাউজারে হাত দিলেন। ওয়ালেটটা দেখলেন। সব টাকা ঠিকই আছে। তারা মানে কুকুরীর বাচ্চা টাকা নেয়নি কেন? তিনি একটা একশো ডলার সঙ্গে নিলেন। দরজার ওপাশে চলে গেলেন। দরজা খুলে দিলেন।

লোকটি হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনে একটা রোব আর স্লিপার। কটা। বাজে জানো কী? তুমি বলেছিলে আমাকে...

রিজোলি একশো ডলারটা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন।

–আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এত ভোরে আপনার ঘুম ভেঙে গেছে।

ভদ্রলোক বলতে থাকেন- ঠিক আছে, হয়তো কেউ খুব দরকারে ফোন করেছে। না হলে সকাল চারটের সময় কেউ ফোন করে?

রিজোলি টেলিফোন রিসিভার তুলে ধরলেন।

–রিজোলি।

একটা কণ্ঠস্বর- রিজোলি, আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে কী?

–আপনি কে বলছেন?

–স্পাইরস লামব্রো আমাকে বলেছেন, আপনাকে ফোন করতে।

–হ্যাঁ।

কী সমস্যা?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ব্যাপারে।

কী হয়েছে?

–তার একটা ট্যাঙ্কার থেলে মারসেইলেস-এ ছিল। সেটা বেসিন ডে লা গ্রান্ডে পৌঁছে গেছে।

–তাতে কী?

মিঃ ডেমিরিস বলেছেন, এই জাহাজটিকে এথেন্সে নিয়ে যেতে। এটা রোববার সকালে সেখানে পৌঁছে যাবে। রোববার রাত্রিবেলা আবার বেরিয়ে পড়বে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এই জাহাজে থাকবেন।

–কী বলছেন?

উনি থাকবেন।

–এমন তো চুক্তি ছিল না।

–মিঃ লামব্রো বলেছেন, ডেমিরিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছোতে চাইছেন। উনি বোধহয় আপনার হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

-ঠিক আছে। আমি দেখছি, মিঃ লামব্রোকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন।

–ঠিক আছে আমি জানাব।

রিজোলি রিসিভার রেখে দিলেন।

সব কিছু ঠিক আছে রিজোলি? বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

–হ্যাঁ, সব কিছু ঠিক আছে। টনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে জবাব দিলেন।

.

রিজোলি এই টেলিফোন নিয়ে ভাবতে থাকলেন। ব্যাপারটা তাঁকে আনন্দ দিয়েছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে তিনি দৌড় করাতে পেরেছেন। আহা, এবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। রোববার, তার মানে হাতে আরও দুটো দিন আছে।

রিজোলি জানেন, তাঁকে আরও সাবধানী হতে হবে। যেখানেই তিনি যাচ্ছেন, এক জোড়া চোখ তাকে অনুসরণ করছে। ওই কুত্তির বাচ্চাগুলোকে সাবধান। এখানকার পুলিশ নাকি বাতাসের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়। রিজোলি মনে মনে ভাবলেন, আমারও যখন সময় আসবে,আমিও প্রতিশোধ নেব।

.

পরের দিন সকালবেলা রিজোলি পাবলিক টেলিফোন বুথে পৌঁছে গেলেন। এথেন্সের মিউজিয়ামের নাম্বারে ফোন করলেন।

রিজোলি দেখতে পেলেন, একজন মানুষ দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে। রাস্তার ধারে আর একজন মানুষকে দেখা গেল। সে ফুল বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলছে। এই দুজন যে গোয়েন্দা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, রিজোলি ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা দুজনকে দেখা গেল, এটা বোধহয় সৌভাগ্য।

কিউরেটরের অফিস।

কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

ভিক্টর? আমি টনি।

–কোনো কিছু খারাপ খবর আছে?

ভিক্টরের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা।

–না, রিজোলি বললেন, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। ভিক্টর, আপনি কি সেই সুন্দর ফুলদানিটার খবর জানেন, যার গায়ে লাল চিহ্ন আছে।

কা অ্যামফোরা।

–হ্যাঁ, আমি ওটা আজ রাতে তুলে নেব।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

–আজ রাত্রে? জানি না টনি, ভিক্টরের কণ্ঠস্বর কাঁপছে, যদি কোনো কিছু অঘটন ঘটে যায়? কথা ভুলে জপনার কি,

সব কথা ভুলে যান। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আপনি বারবার আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আপনার কি মনে আছে, স্যাল ভিজিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি? ব্যাপারটা আপনি সামলাতে পারবেন তো?

না-না, টনি, আমি তা বলতে চাইছি না।

সব কিছু আপনাকে ঠিক মতো করতে হবে, ভিক্টর। আমি হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাব। সেখানে গেলে আমার কোনো সমস্যা থাকবে না। এই ঝামেলাতে আমি জড়াব না। শুধু আপনাকে ভালোবাসি বলেই বলছি।

-না-না, আপনি যা-যা করেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। টনি, আজ রাতেই আমি চেষ্টা করব।

–ঠিক আছে, মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবার পর আপনি একটা নকল মাল রেখে আসলটা সরিয়ে দেবেন।

কিন্তু গার্ডরা সব কিছু পাহারা দিচ্ছে।

–তাতে কী হয়েছে, গার্ডরা তো এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয়।

–না-না, তা নয়। তবে...

–ঠিক আছে, ভিক্টর, আমার কথা শুনুন। আপনি আসলটা সরিয়ে নকলটা রেখে দেবেন। আর একটা সেল, ডিড করে রাখবেন। আশা করি, সবকিছু বুঝতে পারছেন।

-ঠিক আছে। কোথায় দেখা হবে?

–আমরা কোথাও দেখা করব না। ঠিক ছটার সময় মিউজিয়াম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবেন। সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকবে। মালটা সঙ্গে রাখবেন। ড্রাইভার আপনাকে গ্রান্ড হোটেলে নিয়ে যাবে। সেখানে ড্রাইভার আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। আপনি প্যাকেটটা গাড়িতেই ফেলে রাখবেন। হোটেলবারে বসবেন। সামান্য মদ খাবেন। তারপর বাড়ি চলে যাবেন।

–কিন্তু প্যাকেটটা?

–ভয় নেই, তার দেখাশুনা করা হবে।

ভিক্টর ঘামতে থাকেন–আমি এর আগে কখনও এমন কাজ করিনি। আমি কোনো কিছু চুরি করিনি। সারাজীবন...।

–আমি জানি, রিজোলি বললেন, আমিও কোনদিন করিনি। ভিক্টর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে অনেক কুকাজ করতে হচ্ছে।

ভিক্টর বলে উঠলেন–আপনি আমার ভালো বন্ধু টনি। আপনার মতো বন্ধু আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আপনি কি জানেন, কীভাবে আমি টাকাটা পাব, আর কবে পাব?

রিজোলি বললেন–খুব তাড়াতাড়ি, ব্যাপারটা মিটে গেলেই আমরা আরও মালের অর্ডার পাব।

রিজোলি হাসতে থাকেন, আর কখনও? আর কখনও হয়তো আপনাকে আর সাহায্য করব না। কিন্তু সত্যি কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন না।

.

দুটো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে পাইরাস বন্দরে। মিউজিয়ামের সর্বত্র মানুষের ভিড়। ভিক্টর এইসব মানুষদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। তারা কোন্ জীবনের প্রতীক, তা চিন্তাভাবনা করেন। বেশির ভাগই আমেরিকান এবং ব্রিটিশ। অন্যান্য দেশ থেকেও অনেকে এসেছেন। কিন্তু এখন ভিক্টরের মনের ভেতর কে যেন মাদল বাজিয়ে দিয়েছে। কোনো কাজে তার মন বসছে না।

তিনি দুটো শোকেসের দিকে তাকালেন। এখানে এমন কিছু জিনিস আছে, যা বিক্রি করা হবে। উৎসাহী মানুষের ভিড়। দুজন মেয়ে সবকিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে।

এগুলোকে সত্যি সত্যি হয়তো বিক্রি করা হবে। কিন্তু আমি এর থেকে কী লাভ করব? আমি তো রিজোলির পরিকল্পনা মতো কাজ করব। আমি জানি, এই কাজে ধরা পড়ার সম্ভবনা আছে। তবে উল্টোদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই কাজে কোনো সমস্যা নেই। বেসমেন্টে এমন সুন্দর প্রতিকৃতি পাওয়া যাচ্ছে, ওপরে এনে রাখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

টনি যে ফুলদানিটার কথা বলেছে, সেটা হল এই মিউজিয়ামের অন্যতম সেরা সম্পত্তি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে এটি তৈরি হয়েছিল। এটি এক অসাধারণ ফুলদানি, লাল চিহ্ন

আছে, পুরাণের প্রতীক। কালো পটভূমিতে শেষ যখন ভিক্টর এই ফুলদানিটাতে হাত দিয়েছিল, তখন তাঁর সমস্ত শরীরে শিহরণ জেগে উঠেছিল। পনেরো বছর হয়ে গেল। তিনি নিজে এই ফুলদানিটিকে একটি সুন্দর সাজানো কেসের মধ্যে রেখেছিলেন। এখন এই ফুলদানিটিকে তিনিই চুরি করতে চলেছেন? ভিক্টরের মন হাহাকার করে ওঠে, হে ঈশ্বর, তুমি আমায় করুণা এনে দাও।

.

ভিক্টর সমস্ত সন্ধ্যেবেলা পায়চারি করলেন। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন হয়ে গেলেন। নিজেকে চোর বলে ভাবতে তার ভালো লাগছে না। তিনি অফিসে গেলেন তার দরজা বন্ধ করলেন। ডেস্কে বসে থাকলেন। তাঁর সমস্ত মুখে হতাশার ছাপ। আমি এটা করতে পারব না। অন্য কেউ হয়তো পারবে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের উপায় কী? কীভাবে টাকার জোগাড় হবে? প্রিজির কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আজ রাত্রেই টাকাটা চাই। কুত্তা, তা

না হলে কাল সকালে তোকে মেরে মাছেদের খাইয়ে দেব। তুই কি বুঝতে পারছিস আমার কথা? লোকটা ভয়ংকর খুনে। নাঃ, আর কোনো বিকল্প পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কয়েক মিনিট কেটে গেছে। ছটা বাজতে চলেছে। ভিক্টর অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। যে দুজন ভদ্রমহিলা নকল বস্তু বিক্রি করছিলেন, তারা এবার চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ভিক্টর বললেন–সিগনোমি, আমার এক বন্ধুর জন্মদিন, কী দেওয়া যায় বলুন তো?

তিনি কেসের কাছে চলে গেলেন। ভালোভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন। অনেকগুলো ফুলদানি আছে, ছোটো ছোটো মূর্তি। বই এবং মানচিত্র। যেন তিনি ভাবছেন, নির্বাচন কী হবে ঠিক করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই লাল ফুলদানির প্রতিকৃতির দিকে তাকালেন–আমার মনে হয়, এটাতেই চলে যাবে।

মেয়েটি বলল–হ্যাঁ, এটা একটা দারুণ জিনিস। মেয়েটি কেস থেকে ফুলদানি বের করল। সেটি ভিক্টরের হাতে তুলে দিল।

–আমাকে একটা রিসিপ্ট দেওয়া যাবে?

–হ্যাঁ, মিঃ ভিক্টর। আমরা কি এই জিনিসটাকে ভালোভাবে প্যাক করে দেব?

ভিক্টর বললেন–না-, তার কোনো দরকার নেই, আপনি এটাকে পেপার ব্যাগের মধ্যে পুরে দিন।

সবকিছু ঠিকঠাক এগিয়ে যাচ্ছে। ওই নকল বস্তুটা একটা কাগজের ব্যাগে পুরে দেওয়া হয়েছে। রিসিপ্ট দেওয়া হয়েছে।

ধন্যবাদ।

মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু এটা পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে যাবে।

–হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ভিক্টর ব্যাগ নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। তার হাত দুটো কাঁপছে। তিনি অফিসে ঢুকে পড়লেন।

দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ব্যাগ থেকে ওই নকল ফুলদানিটা বের করলেন। সেটিকে ডেস্কের ওপর রাখলেন। ভিক্টর ভাবলেন, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি। তার সমস্ত মন জুড়ে আশঙ্কার মেঘ। আতঙ্কঘন অনুভূতি। মাথা কাজ করছে না। আমি কি অন্য কোনো দেশে চলে যাব? স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সাথে কখনও দেখা করব না? আত্মহত্যা করব? পুলিশের কাছে গিয়ে সবকিছু বলব? বলব, কীভাবে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু যখন সবাই সত্যিটা জানতে পারবে, আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব। নাঃ, এই সমস্যা সমাধানের আর কোনো পন্থা নেই। যে টাকাটা আমি ধার করেছি, সেটা আমাকে শোধ

করতেই হবে। না হলে প্রিজি আমাকে মেরে ফেলবে। হা ঈশ্বর, আমার বন্ধু টনি আছে বলেই আমি হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে যাব। টনি না থাকলে আমি কবেই মরে যেতাম।

ভিক্টর ঘড়ির দিকে তাকালেন। সময় এগিয়ে চলেছে। ভিক্টর উঠে দাঁড়ালেন। তার পা-দুটো তখনও কাঁপছে। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। হাত ঘেমে গেছে ঘামে। হাতে হাত মুছে নিলেন। ওই নকল জিনিসটা পেপার ব্যাগের ভেতর পুরে নিলেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার সামনে একজন গার্ডের থাকার কথা। ছটা পর্যন্ত সে থাকে। মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর আর একজন গার্ড এসে যায়। তাকে অনেকগুলো ঘরের ওপর নজর রাখতে হয়। ঘুরতে ঘুরতে সে অনেক সময় দূরের বারান্দায় চলে যায়। সেখান থেকে সব ঘর দেখা যায় না।

ভিক্টর অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। গার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভিক্টরের আচরণের মধ্যে কেমন একটা অপরাধবোধ।

–আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার, আমি জানতাম না, আপনি এখনও অফিসে আছেন।

–হ্যাঁ, এবার আমাকে বেরোতে হবে।

আপনি কি জানেন, গার্ড বলল, আমি আপনাকে হিংসা করি?

কেন?

–আপনি এইসব সুন্দর সুন্দর জিনিস সম্পর্কে কত তথ্য জানেন। আমি এখানে ঘুরি, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি, ওরা হল ইতিহাসের এক-একটি টুকরো স্মৃতি। তাই নয় কি? আমি কিন্তু বেশি খবর জানি না। আপনি হয়তো একদিন আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন। মনে হচ্ছে...

লোকটা বকেই চলেছে- হ্যাঁ, একদিন, তোমাকে সব কথা বলতে পারলে আমারও ভালো–

ঘরের একেবারে কোণে ভিক্টর পৌঁছে গেছেন। দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্যাবিনেটটা, অসাধারণ ফুলদানিটা যার মধ্যে আছে। এখনই ওই গার্ডের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।

অ্যালার্ম সার্কিটে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেসমেন্টে। তুমি কি একটু চেক করবে?

–হ্যাঁ, জিনিসগুলো অনেকদিনের পুরোনো, তাই বোধহয় গোলমাল করছে।

–এখনই একবার যাও না ভাই। সবকিছু ঠিকঠাক না দেখে আমি কী করে যাই বল তো?

–ঠিকই বলেছেন মিস্টার, আমি এখুনি আসছি।

ভিক্টর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। গার্ড চলে গেল। হলের ওপাশে, বেসমেন্টের দিকে। যখনই সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, ভিক্টর তৎপর হয়ে উঠলেন। তার হাতে ওই প্যাকেট, তার ভেতর নকল ফুলদানি। তিনি চাবি নিলেন। ভাবলেন, শেষ অব্দি আমি কাজটা

করতে চলেছি। চুরির কাজ। চাবিটা হাত গলে পড়ে গেল মাটির ওপর। এটা কি কোনো চিহ্ন? ভগবান কি আমাকে একাজ করতে বারণ করছেন? ঘামের স্রোত, সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিক্টর নীচু হলেন। চাবিটা খুঁজলেন। তাকিয়ে থাকলেন ফুলদানিটার দিকে অসাধারণ দেখতে। এত সুন্দরভাবে এটাকে তৈরি করা হয়েছে! আহা, কত হাজার বছর আগে। সত্যি, গার্ড ঠিক কথা বলেছে, এটা হল ইতিহাসের এক স্মারক চিহ্ন। এমন জিনিস কি কখনও চুরি করতে হয়।

ভিক্টর চোখ বন্ধ করলেন। এক মুহূর্তের জন্য, চারপাশে তাকালেন। কেউ তার ওপর নজর রাখেনি। তিনি কেসটার চাবি খুলে দিলেন। আস্তে আস্তে আসল ফুলদানিটা তুলে নিলেন। নকল ফুলদানিটা পেপার ব্যাগ থেকে বার করলেন। আধারের ওপর বসিয়ে দিলেন। বাঃ, চমৎকার হয়েছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। একটা কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নকল? এটা একেবারেই নকল, কিন্তু কে জানবে? একমাত্র আমি জানি, ভিক্টর ভাবলেন, দু-একজন বিশেষ পণ্ডিত হয়তো জানতে পারেন। বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। কেউ কাছে এসে পরীক্ষা করবে না। ভিক্টর চাবি বন্ধ করে দিলেন। আসল ফুলদানিটা এখন পেপার ব্যাগের মধ্যে চলে গেছে। সঙ্গে আছে একটা রিসিপ্ট।

তিনি রুমাল নিলেন মুখ মুছলেন, হাত মুছলেন। সব কাজ হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছটা বেজে দশ মিনিট। এখন তাড়াতাড়ি করতে হবে। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, গার্ড সেদিকে এগিয়ে আসছে।

–অ্যালার্ম সিস্টেমে তো কিছু হয়নি।

–ঠিক আছে। আমাদের সব বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

গার্ড হাসল, আপনি এখন চললেন, তাই তো?

-হ্যাঁ, শুভরাত্রি।

সামনের দরজায় দ্বিতীয় গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। সেও এখন যাবার জন্য তৈরি। সে পেপার ব্যাগের দিকে তাকাল। বলল, সব কিছু পরীক্ষা করতে হবে। এটাই এখানকার নিয়ম।

–ঠিক আছে, ভিক্টর বললেন, তিনি ব্যাগটা গার্ডের হাতে দিলেন।

গার্ড ভেতর দিকে তাকাল, ফুলদানিটা বের করল। রিসিপ্টটা দেখল।

–বন্ধুর জন্য উপহার, ভিক্টর বললেন, সে একজন ইঞ্জিনিয়ার।

তার গলা কাঁপছিল। কিন্তু কেন? আমাকে এখন স্বাভাবিক অভিনয় করতে হবে।

সুন্দর! গার্ড ব্যাগটা ভিক্টরের হাতে তুলে দিল।

আর একটা ভয়ংকর মুহূর্ত কেটে গেল।

ভিক্টর ব্যাগটা বুকের কাছে ধরলেন- শুভরাত্রি।

গার্ড দরজা খুলে দিয়ে বলল–শুভরাত্রি।

ভিক্টর বাইরে এলেন। রাতের বাতাস শীতল হয়ে উঠেছে, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলেন তিনি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। লক্ষ লক্ষ ডলার এখন তার হাতের মধ্যে। কিন্তু এইভাবে? তিনি ভাবতে পারছেন না। মনে হচ্ছে, তিনি যেন দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। একটুকরো ইতিহাস বিদেশে পাচার করে দিচ্ছেন। কার কাছে? মুখহীন কজন বিদেশির কাছে?

তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। রিজোলির কথা মতো একটা ট্যাক্সি মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্টর সেখানে চলে গেলেন। হাত তুললেন। বললেন, হোটেল গ্রান্ডে ব্রেটাগনে।

ট্যাক্সি এগিয়ে গেল। ভিক্টর সিটে এলিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে, কেউ বোধহয় তার সমস্ত শক্তিকে শুষে নিয়েছে। মনে হচ্ছে, একটা ভয়ংকর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়লাভ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষ হাসি তিনি হাসবেন কী?

ট্যাক্সি হোটেল গ্রান্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভিক্টর বললেন–এখানে একটু অপেক্ষা করো কেমন?

শেষবারের মতো তিনি ওই অসাধারণ ঐতিহ্যমণ্ডিত বস্তুটির দিকে তাকালেন। আহা, ব্যাকসিটে সেটা পড়ে রইল। ভিক্টর অতি দ্রুত ট্যাক্সি থেকে নেমে গেলেন। হোটেল লবিতে পৌঁছে গেলেন। দরজার ওপারে চলে গেলেন। তাকিয়ে থাকলেন। একজন মানুষ ট্যাক্সিতে প্রবেশ করছে। একটুবাদে ট্যাক্সিটা অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

তাহলে সব কাজ ঠিক মতো হয়েছে। আহা, আমার জীবনটা আর কখনও আগের মতো হবে না। সারা জীবন আমাকে এই কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হবে। একটা দুঃস্বপ্নের যাত্রা শুরু হল।

.

রোববার দুপুরবেলা। তিনটে বেজেছে। টনি রিজোলি হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। প্লাটিয়া ওমোনিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি একটা সুন্দর জ্যাকেট পরেছেন। সঙ্গে সবুজ ট্রাউজার। দুজন ডিটেকটিভ তাকে অনুসরণ করছিলেন। একজন বললেন–মনে হচ্ছে, লোকটা বোধহয় সার্কাস দেখাবে, এমনই পোশাক পরেছে।

–মেটাক্সা স্ট্রিট, রিজোলি একটা ট্যাক্সি ভাড়া নিলেন। গোয়েন্দা তার ওয়াকিটকিতে বলল।

-লোকটা ট্যাক্সি নিয়ে পশ্চিমদিকে চলেছে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি। আমরা অনুসরণ করছি। আপনারা হোটেলে ফিরে যান।

–ঠিক আছে।

ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছে একটি সিডান গাড়ি, বেশ কিছুটা দূর থেকে। ট্যাক্সিটা দক্ষিণ দিকে গেল, মোনাসটিরাকি পার হয়ে, সিডানও এগিয়ে চলেছে। এই সিডানে একজন ডিটেকটিভ বসে আছেন, ড্রাইভারের পাশে, হাতে হ্যান্ড মাইক্রোফোন।

সেন্ট্রাল। ইউনিটফোর। লোকটা ট্যাক্সিতে চড়ে ফিলহেলিনন স্ট্রিটে পৌঁছে গেছে। মনে হচ্ছে একটু অপেক্ষা করতে হবে।... না না ওরা পেটা স্ট্রিটে চলে গেল। বোধহয় প্লাকার দিকে যাবে। আমরা এখনও অনুসরণ করব কী?

ইউনিট ফোর, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।

শব্দ ভাসছে।

–ইউনিট ফোর, আমরা সব কিছু জানতে পেরেছি। সে প্লাকাতে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছে। তার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

–লোকটা লাল চেক জ্যাকেট পরেছে। সবুজ ট্রাউজার। তাকে কোনোভারেই চোখের আড়াল করা চলবে না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। ট্যাক্সি থেমেছে। ও প্লাকাতে নেমে পড়েছে।

-ঠিক আছে, আমরা এই খবরটা পাঠাচ্ছি।

–ঠিক আছে।

.

প্লাকা। দুজন ডিটেকটিভকে দেখা গেল ট্যাক্সি থেকে নেমে আসা লোকটির ওপর কড়া নজর রাখছে।

–কোথা থেকে জোকারের মতো পোশাকটা কিনেছে বলো তো?

একজন হাসতে হাসতে মন্তব্য করল।

তারা পেছন দিকে চলে গেল। এটা হল শহরের এক প্রাচীন অংশ। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল লুকোচুরি খেলা। রিজোলি ইচ্ছে করেই বোধহয় তাদের চোখের ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন। একটির পর একটি বার তিনি পেরিয়ে গেলেন। স্যুভেনিরের দোকান, আর্ট গ্যালারি। অ্যানাফিয়োটিকা ধরে হাঁটলেন। একটা দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। এখানে প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে তৈলাধার, মোমবাতি- আরও কত কিছু।

এখানে লোকটা কী করছে?

মনে হচ্ছে আরাম করে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে। এখনও তার ওপর নজর রাখতে হবে।

তারপর? অ্যাগুও গেরেভা পার হয়ে রিজোলি এগিয়ে চললেন জাইনস রেস্টুরেন্টের দিকে। দুজন ডিটেকটিভ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকল। তার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখল।

দুজন ডিটেকটিভ এখন খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

আমার মনে হচ্ছে, লোকটা বুঝি এখনই এখান থেকে চলে যাবে। বাড়ি ফিরতে পারলে ভালো হত। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

না-না, এখন জেগে থাকতে হবে। চোখের পাতা জড়িয়ে এলে লোকটা পালিয়ে যাবে। নিকোলিনো তাহলে আমাদের গাধা বলবেন।

–আমরা কী করে লোকটাকে চোখের বাইরে যেতে দেব? ও তো এখানে গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য ডিটেকটিভ কথা বলার চেষ্টা করলেন ঠিক আছে, আর একটু কষ্ট স্বীকার করো না ভাই।

–আমি তো করছি।

–ঠিক আছে, ওর মুখের দিকে তাকিয়েছ কী?

–না।

–আমিও দেখিনি, এসো তো দেখা যাক।

দুজন গোয়েন্দা রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গেলেন। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারা এক সম্পূর্ণ অজানা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এ কী! একে অনুসরণ করার কথা তো বলা হয়নি!

.

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো এই কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেছেন।

–আমি তিনটে দল করলাম, রিজোলিকে চোখে চোখে রাখার জন্য। আপনারা সকলেই এই কাজে সুদক্ষ। আগে অনেক এ ধরনের কাজ করেছেন। তা সত্ত্বেও রিজোলি কীভাবে আপনাদের চোখের সামনে থেকে চলে গেল? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন।

একজন বিড়বিড় করে বলার চেষ্টা করেন ইন্সপেক্টর, সত্যি আমরা এই খেলাতে হেরে গেছি। প্রথম দল শয়তানটাকে একটা ট্যাক্সিতে দেখেছিল।

-তারপর? ট্যাক্সিটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়? সেই পুরোনো গল্প। তাই তো?

-না স্যার, আমরা ট্যাক্সির ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম ট্যাক্সির মধ্যে ওই শয়তানটাই বসে আছে। সে একটা বুনো পোশাক পরেছিল। রিজোলি বুদ্ধি

করে ট্যাক্সিতে আর একটা যাত্রীকে লুকিয়ে রেখেছিল। ট্যাক্সির মধ্যেই তারা পোশাক বদলা বদলি করে। আমরা ভুল লোককে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

–রিজোলি ঠিক ট্যাক্সিতে উঠল কী করে?

–কীভাবে তা বুঝতে পারছি না।

–আপনারা লাইসেন্স নাম্বার নোট করেছেন?

–না স্যার, ব্যাপারটা অত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি।

–যে লোকটাকে ধরা হল তার পরিচয় জানা গেছে?

-সে রিজোলির হোটেলের একজন বেলবয়। বেচারা কিছুই জানে না। রিজোলি তার হাতে একশো ডলারের নোট গুঁজে দিয়েছিল। রিজোলি বলেছিল, কারোর সাথে লুকোচুরি খেলা খেলতে হবে।

ইন্সপেক্টর নিকোলিনো গভীর নিশ্বাস ফেললেন। তিনি বললেন–এই মুহূর্তে রিজোলির সন্ধান পাব কী করে? কাউকে কি চেনেন, যে রিজোলির খবর দিতে পারে?

-না স্যার, তেমন কোনো লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই।

.

গ্রিসের সাতটা প্রধান বন্দর আছে- থেসালোনিকি, পাট্রাস, ভোলোস, ইগোমেনিটিসা, কাভালা, ইরাকলিয়ন এবং পাইরাইয়স।

এথেন্সের সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পাইরাইয়স বন্দরের অবস্থান। এটিকে আমরা গ্রিসের সবথেকে উল্লেখযোগ্য বন্দর বলতে পারি। শুধু তাই নয়, এই বন্দরটি হল ইউরোপের অন্যতম প্রধান বন্দর। পোর্ট কমপ্লেক্সের মধ্যে চারটি জেটি আছে। তিনটি রুটে প্রমোতরণী ছাড়ে। সমুদ্রগামী জাহাজও সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে। চতুর্থটির নাম হেরাকলেস, এখান থেকে শুধু মালবাহী জাহাজ দূর সমুদ্রে যাত্রা করে।

হেরাকলেসের কাছে নোঙর করা আছে থেলে নামক জাহাজটি। সেটা একটা বিরাট ট্যাংকার, মনে হচ্ছে বুঝি বিরাট আকৃতির একটি দৈত্য। যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

চারজনকে সঙ্গে নিয়ে টনি রিজোলি ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেছেন। রিজোলি ওই বিরাট জাহাজটার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবছেন- যাক, শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছোতে পেরেছি। বন্ধু ডেমিরিসের ভাগ্য পরীক্ষা হবে।

তিনি তার সঙ্গে আসা মানুষদের দিকে তাকিয়ে বললেন–তোমাদের দুজন এখানে অপেক্ষা করবে। বাকি দুজন আমার সঙ্গে এসো। দেখো, জাহাজ থেকে কেউ যেন যেতে না পারে।

–ঠিক আছে।

রিজোলি এবং দুজন মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। তারা খানিকটা পথ এগিয়ে গেল। একজন এসে জানতে চাইল আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

–মিঃ ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করতে পারব?

মিঃ ডেমিরিস মালিকের কেবিনে বসে আছেন। তিনিও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

যাক, দুয়ে দুয়ে চারই হয়েছে। রিজোলি হেসে উঠলেন–ঠিক আছে, উনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন? জাহাজ কখন ছাড়বে?

মাঝরাতে, আমি কি পথ দেখাব?

–ধন্যবাদ।

ওরা ডেকের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। শেষ অব্দি একটা মইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। সরু প্যাসেজ। ইতিমধ্যে তারা প্রায় ডজন খানেক কেবিন পার হয়ে গেছেন।

শেষ কেবিনের সামনে ওরা এসে দাঁড়াল। সেলার দরজাতে শব্দ করতে যাবে, রিজোলি তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন–আমরা নিজেরাই আমাদের উপস্থিতি ঘোষণা করব কেমন? তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না ভাই।

রিজোলি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

রিজোলি যা ভেবেছিলেন, কেবিনটি তার থেকে অনেক বড়। এখানে একটা সুন্দর সাজানো শয্যা আছে, কৌচ, ডেস্ক- কোনো কিছুর অভাব নেই। দুটো ইজিচেয়ার চোখে পড়ল। ডেস্কের পাশে বসে আছেন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস।

ডেমিরিস রিজোলিকে দেখলেন। কঁপতে শুরু করলেন। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে তিনি বলতে থাকেন এখানে...এখানে আপনারা কী করছেন?

তার কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির মতো শোনাচ্ছে।

–আমার বন্ধু আর আমি ঠিক করলাম, আপনাকে শুভ কামনা জানার কোস্টা।

আপনি কী করে জানলেন যে আমি এখানে আছি? আমি তো আপনাদের আশা করিনি।

–তা আমি জানি। রিজোলি বললেন। তারপর নাবিকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ পল।

নাবিক বেরিয়ে গেল। রিজোলি ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে আরও কিছু বলতে লাগলেন।

–আপনি আমার অংশীদার, একটা শুভ কাজ শুরু হতে চলেছে। আমার কর্তব্য আপনাকে গুডবাই জানানো। তাই নয় কী? কিন্তু আপনি আমাকে না বলে কোথায় চলে যাচ্ছিলেন?

ডেমিরিস সঙ্গে সঙ্গে বললেন–নাতো, আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না। আমি সব কিছু দেখার জন্য এখানে এসেছি। সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কাল সকালে এই জাহাজটা যাত্রা শুরু করবে।

রিজোলি আর একটু কাছে এলেন। যখন তিনি কথা বলছিলেন, তার গলার স্বর নরম হয়ে এসেছিল।

রিজোলি বলললেন–কোস্টা বেবি, আপনি আবার মস্ত বড়ো ভুল করছেন। এই পৃথিবীতে আপনার লুকোবার কোনো জায়গা নেই। আপনার আর আমার মধ্যে ভদ্রলোকের একটা চুক্তি হয়েছে। মনে আছে তো? আপনি জানেন, চুক্তি ভঙ্গ করলে কী হয়? তাদের কুকুরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মরতে হয় নৃশংসভাবে।

ডেমিরিস ঢোক গিলে বললেন–আমি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাইছি।

রিজোলি তার লোকেদের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন, বললেন–তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

তারা চলে গেল। রিজোলি আর্মচেয়ারে বসে পড়লেন।

-কোস্টা, আমি কি আপনাকে হতাশ করেছি?

-কেন এভাবে কথা বলছেন? ডেমিরিস জানতে চাইলেন। আমি আপনাকে টাকা দেব, আপনি যত টাকা চাইছেন, তার থেকে অনেক বেশি। শুধু আমাকে মুক্তি দিন।

–মুক্তি কীসের জন্য?

-আমি এই জাহাজে চড়ে চলে যাব। একা। আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন না। দোহাই ঈশ্বরের, অনুগ্রহ করে আমাকে শুধু এইটুকু সাহায্য করুন।

ডেমিরিসের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারা গেল, তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

–আপনি আমার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারেন না। যদি একবার আমার দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে সরকারের চোখে আমি একটা বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত হব। সরকার আমরা সমস্ত জাহাজ বাজেয়াপ্ত করবে। আমি আপনাকে সব দেব। আপনি যা চাইছেন, তার থেকে অনেক বেশি। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন।

টনি রিজোলি হেসে উঠলেন আমার আর কিছু চাইবার নেই এই পৃথিবীর কাছে। সব আমি পেয়ে গেছি। কতগুলো ট্যাংকার আপনার আছে? কুড়িটা? তিরিশটা? আমি আর আপনি মিলে সবকটা ট্যাংকারকে সব সময় ব্যস্ত রাখব। আপনাকে আরও বেশি তৎপর হতে হবে, দু-একটা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

–আপনি...আপনি কী বলছেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–সময় হলে সবই বুঝতে পারবেন, টনি রিজোলি উঠে দাঁড়ালেন। আপনি ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলুন। বলুন, কয়েকটা বেশি জায়গায় থামতে হবে। বিশেষ করে ফ্লোরিডার বন্দরে।

ডেমিরিস ইতস্তত করতে থাকেন–ঠিক আছে, কাল সকালে আপনি আসবেন কী?

রিজোলি হেসে ফেললেন–আমি কোথাও যাচ্ছি না। খেলাটা শেষ হয়ে গেছে। মাঝপথে আপনি পালাবেন, আমি সব খবর পেয়েছি। ঠিক আছে, আমিও আপনার সঙ্গে পালাব। আমাদের সঙ্গে হেরোইনের প্যাকেট আছে। কোস্টা, এটা খুব সুন্দর বোঝাপড়া। আমরা স্টেট মিউজিয়াম থেকে দামি জিনিসপত্র বাইরে পাচার করব। আপনি সেগুলো আমার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবেন। এটাই হল আপনার কাজের শাস্তি। আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার খেলা খেলতে চেয়েছেন, তার জন্য আপনাকে কিছুটা শাস্তি তো পেতেই হবে।

ডেমিরিসের চোখ ভয়ার্ত হয়ে উঠল–সে কী? আমাকে এভাবে ফাসাবেন না। দোহাই

ডেমিরিস কথা শেষ করতে পারলেন না। রিজোলি তার ঘাড় চাপড়ে বললেন–ভয় কী? আমি কথা দিচ্ছি, আমার অংশীদার হিসেবে আপনি জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দে কাটাতে পারবেন।

রিজোলি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। দরজা খুললেন।

-ঠিক আছে, এবার আসল কাজটা শুরু হোক।

কোথায় জিনিসটা থাকবে?

-যে-কোনো জাহাজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অনেক জায়গা থাকে। রিজোলি আসল উদ্দেশ্যটা বললেন না। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের জাহাজে কোনোদিন পুলিশি তল্লাশি হয় না। তিনি এক গণ্যমান্য মানুষ। সব সন্দেহের উর্ধ্বে তার অবস্থান।

এক বস্তা আলুর মধ্যে এটাকে ঢুকিয়ে রাখলে কেমন হয়? বস্তাটাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে। গ্যালির নীচে ফেলে রাখতে হবে। আর ওই ফুলদানি? ফুলদানিটার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে নিতে হবে। রিজোলি ডেমিরিসের দিকে তাকালেন। তার চোখে লোভের আগুন জ্বলে উঠেছে আশা করি এই কাজটা আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন। আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?

ডেমিরিস কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, গলা বসে গেছে, স্বর ফুটে বেরোচ্ছে না। ..

রিজোলি বললেন–ঠিক আছে, এবার তাহলে যাত্রা শুরু হোক।

রিজোলি আর্মচেয়ারে বসলেন শক্ত হয়ে, বললেন–আহা, ভারি সুন্দর তো! কোস্টা এখানে আপনি, আমি এবং আমার ছেলেরা অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নেব।

ডেমিরিস শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বলতে থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে, অশেষ ধন্যবাদ।

.

– মধ্যরাত, বিরাট ট্যাংকার এবার যাত্রা শুরু করেছে। দুটি টাগবোট সামনে আছে। তারাই পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। হেরোইনের প্যাকেট লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফুলদানিটা। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কেবিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টনি রিজোলি তার সাঙ্গপাঙ্গদের ডেকে নিয়ে বললেন–তোমরা সবাই রেডিয়ো রুমে চলে যাবে। ওয়ারলেসের সংযোগ ছিন্ন করে দাও। আমি চাই না, ডেমিরিস কোথাও সংবাদ পাঠাক।

–ঠিক আছে, ডেমিরিস এক ভেঙে পড়া মানুষ। তাহলেও রিজোলি কোনো রিস্ক নিতে চাইছেন না।

.

যাত্রা শুরুর আগে পর্যন্ত রিজোলির মন নানা চিন্তায় আচ্ছাদিত। অনেকসময় শেষ মুহূর্তে অযাচিত বিপদ দেখা দেয়। দীর্ঘ জীবনের উত্থান-পতনে এমন অনেক মুহূর্তের সামনে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি স্বপ্নেও আমরা যে ঘটনা কল্পনা করতে পারি না, অনেক সময় তাও ঘটে যায়। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস, বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। আকাশ অব্দি যার হাত প্রসারিত, এখন আমার পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন? ভাবতে ভালো লাগে। রিজোলি চিন্তা করলেন, ওই বেজন্মাটাকে আরও বোকা বানাতে হবে। তার সমস্ত জাহাজ একদিন আমার বশীভূত হবে। আমি যেখানে খুশি যেতে পারব। মাল পাচার করতে পারব। তখন আমিই হব পৃথিবীর সুখীতম সম্রাট। আহা, এমন সৌভাগ্য যে আমার কখনও হবে, আমি ভাবতেও পারিনি! বুদ্ধির সাহায্যে আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। মিউজিয়ামের সব কিছু ফাঁক করে দেব। ওই মিউজিয়াম সত্যি সত্যি সোনার খনি। আহা, ওর সবকিছু আমি অধিকার করব। আমার ছেলেদের ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। ওরা বুঝতেও পারবে না, কোন্ কাজ করছে।

টনি রিজোলি ঘুমের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে শুরু করলেন। স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন দেখলেন সোনাতে বোঝাই একটি জাহাজ স্থির উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে। সেখানে সুন্দরী মেয়েরা মদ পরিবেশন করছে।

.

সকাল হয়েছে। রিজোলির ঘুম ভেঙে গেল। ব্রেকফাস্টের জন্য তারা ডাইনিংরুমের দিকে এগিয়ে চললেন। ছজন ক্রু সদস্য ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। একজন স্টুয়ার্ট

বললেন–শুভ সকাল।

–মিঃ ডেমিরিস কোথায়? রিজোলি জানতে চাইলেন? উনি কি প্রাতরাশ করবেন না?

না, উনি ওঁনার কেবিনে বসে আছেন। উনি বলছেন, আপনি এবং আপনার বন্ধুদের সবকিছু সরবরাহ করতে। বলুন স্যার, কীভাবে আপনার কাজে লাগতে পারি।

আহা, ওঁনার মতো মানুষ আর হয় না। রিজোলি হেসে ফেললেন–আমাকে অরেঞ্জ জুস দেবেন? শুয়োরের মাংস আর ডিম? তোমরা কী নেবে ছেলের দল?

–যেটা আপনার অভিরুচি। অর্ডার দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। রিজোলি বললেন মাথাটা ঠান্ডা রেখো। চোখের দৃষ্টিকে অনেক দূর প্রসারিত করো। আচরণের মধ্যে ভদ্রতার ছাপ আনবে কেমন? মনে রেখো, আমরা সবাই পৃথিবীর অন্যতম ধনী মানুষের সম্মানীয় অতিথি।

.

ডেমিরিস সেদিন লাঞ্চের আসরেও আসেননি। এমনকি ডিনারের সময়ও তাকে দেখা গেল না।

রিজোলি তার সাথে কথা বলার জন্য কেবিনে ঢুকেছিলেন।

ডেমিরিস কেবিনে বসেছিলেন। তাঁর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি বুঝি অর্ধমৃত। ভয়ংকর বিপদের সন্ধানে বসে আছেন একা।

রিজোলি বললেন–আরে, এতে ভেঙে পড়ার কী আছে? জীবনে উত্থান-পতন তো থাকবেই, আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে বিপদে ফেলব না। আপনি আমার কাজের অংশীদার, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন তো। আপনি এমন আচরণ করছেন, যেন আপনার ভীষণ অসুখ করেছে। উঠুন, অনেক কাজ করতে হবে। স্টুয়ার্টকে বলেছি, এখানে খাবার পাঠিয়ে দিতে।

ডেমিরিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঠিক আছে, আপনি কি আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন?

রিজোলি ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন–ঠিক আছে, ডিনারের পর ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আপনাকে দেখে একটা বিধ্বস্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

.

সকাল হয়েছে, রিজোলি ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

তিনি বললেন আমি টনি রিজোলি, আমি মিঃ ডেমিরিসের একজন অতিথি।

–ডেমিরিস আমাকে সব কিছু বলেছেন। মনে হচ্ছে পথ পাল্টাতে হবে। আপনি কি অন্য কিছু নির্দেশ দেবেন?

–হ্যাঁ, আমি জানি। আমরা কখন ফ্লোরিডার উপকূলে পৌঁছোব?

–তিন সপ্তাহের মধ্যে, মিঃ রিজোলি।

–ঠিক আছে। আমি আপনার সাথে পরে কথা বলব।

রিজোলি চলে গেলেন। বিশাল এই জাহাজটির সর্বত্র তখন তার দৃপ্ত পদচিহ্ন আঁকা হচ্ছে। মনে মনে স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন তিনি। ভাবতেও পারেন নি, কোনো একদিন এত বড়ো জাহাজের অধীশ্বর হবেন তিনি। কীভাবে তার জীবন কেটেছে, অতীতের দিনগুলো তার মনে পড়ে গেল। আহা, আজ পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। মনের ভেতর এমন উন্মাদন আগে কখনও জাগেনি তো!

.

সময় এগিয়ে চলেছে। রিজোলি মাঝে মধ্যেই কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কেবিনে ঢুকে পড়েন।

সূচিপত্র

–আঃ, আজকে আপনাকে আর একটু ভালো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখানে কোথাও থামলেও চলে।

ডেমিরিস আর কথা বলার মতো অবস্থাতে নেই। তাকে দেখে একটা ডুবন্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অসহায় এবং একা। পৃথিবীর সব খেলাতে যিনি হেরে গেছেন।

.

সময় আর একটু এগিয়ে গেল। রিজোলি স্বপ্নের কাছাকাছি চলে এসেছেন। এখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অথচ এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। জীবনে অনেক কঠিন কাজে অংশ নিয়েছেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। একটা সপ্তাহ কেটে গেছে, আর একটা সপ্তাহও কেটে গেল। জাহাজ এখন উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

শনিবার সন্ধ্যেবেলা, রিজোলি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চারপাশে সমুদ্রের বিপুল জলরাশি, মাঝে মধ্যে বজ্রপাত।

প্রথম মেট বলল–আবহাওয়া খারাপ হবে মিঃ রিজোলি। ব্যাপার খুব একটা সুবিধার লাগছে না।

রিজোলি কাধ কঁকিয়ে বললেন–কোনো কিছুই আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না মশাই।

সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তরঙ্গে বোধহয় সে ডুবে যাবে।

রিজোলির মনের ভেতরও অশান্তির আবহাওয়া। আমি কি একজন ভালো নাবিক নই? কিন্তু খারাপটাই বা কিসে? রিজোলি তাঁর নিজস্ব কেবিনে চলে এলেন। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন। এই সময় স্বপ্নের ভেতর কোনো সোনালি জাহাজ কিংবা উলঙ্গ মেয়েরা আসেনি। কালো স্বপ্ন, যুদ্ধ শুরু হয়েছে, অস্ত্রের ঝনঝনানি তিনি শুনতে পাচ্ছেন, বিস্ফোরণের শব্দ।

রিজোলির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে চারপাশে তাকালেন। কেবিনটা দুলছে কেন? সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়েছে জাহাজটি! করিডরে পায়ের শব্দ। কী হচ্ছে সেখানে?

টনি রিজোলি তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। করিডরে পৌঁছে গেলেন। দেখা গেল, তিনিও ঠিক মতো তাল রাখতে পারছেন না।

লোকগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। কী, হয়েছে কী?

–বিস্ফোরণ! জাহাজে আগুন লেগেছে। আমরা ডুবছি, এখন তাড়াতাড়ি ডেকে চলে আসুন।

বিস্ফোরণ? আগুন? রিজোলি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই শব্দ দুটোর বুনো শুয়োরের মতো তাকে আক্রমণ করেছে। জাহাজটা ডুবে গেলে কী হবে? আমার সব স্বপ্নের সমাধি? কিন্তু অনেক কাজ যে করতে হবে। আগে ডেমিরিসের জীবন

বাঁচাতে হবে। ডেমিরিসই আমার চাবিকাঠি। সফল জীবনের ছাড়পত্র। কীভাবে তার কাছে খবর পৌঁছোনো যাবে? হঠাৎ টনির মনে হল, তিনি তো ইচ্ছে করেই বেতার ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিলেন।

রিজোলি কোনোমতো ভারসাম্য রক্ষা করে চললেন। সরু পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। ডেকের ওপর লাফিয়ে পড়লেন। আহা, ঝড় থেমে গেছে। সাগর আগের মতোই শান্ত। আকাশে চাঁদের জোছনা। পৃথিবীর কোথাও কোনো অশান্তি নেই।

আর একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। আর একটা আগুন লেগে গেছে, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। জলের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড ভাসছে, জাহাজটা অত্যন্ত দ্রুত ডুবছে। একটির পর একটি লাইফবোট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে গোটা জাহাজে বুঝি আগুন ধরে গেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস কোথায়?

রিজোলি অনেক ধরনের শব্দ শুনতে পেলেন। আর্তনাদের শব্দ। বিস্ফোরণের শব্দ। তিনি তাকিয়ে থাকলেন শূন্য চোখে। একটা হেলিকপ্টার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

আমরা কি বেঁচে গেলাম? রিজোলি মনে মনে ভাবলেন। তিনি হেলিকপ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন।

জানালা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল। এই মুখটা কার?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রিজোলি অবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস। তিনি হাসলেন, তিনি হাত নাড়ছেন। তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট।

রিজোলির পা থেকে মাথা অব্দি জমে বরফ হয়ে গেছে। মাথাটা কাজ করছে না। প্রথম থেকে কী ঘটেছে, এখন তা অনুমান করতে পারছেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস একটা হেলিকপ্টার পেলেন কী করে? মধ্যরাতে? তার মানে? কত বুদ্ধিমান মানুষ তিনি।

রিজোলি বুঝতে পারলেন, এবার তাকে জলে ডুবে মরতে হবে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার সাথে ব্যবসা করতে চাননি। কুকুরির বাচ্চাটা এইভাবে তাকে বোকা বানিয়েছেন! প্রথম থেকে সব কথা মনে পড়ে গেল তার। ডেমিরিস পালিয়ে যাচ্ছেন, তার মানে? ওই ফোনটা কে করেছিলেন? স্পাইরাস লামব্রোর নাম করে? ওটা এসেছিল ডেমিরিসের কাছ থেকে। এইভাবে ডেমিরিস আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এই কাজে তিনি সফল হয়েছেন। তিনি আমাকে জাহাজে ডেকে এনেছেন। ভালো মানুষের মতো ভয় পাওয়ার অভিনয় করেছেন। রিজোলি সব কিছু বুঝতে পারছেন, কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

ট্যাংকারগুলো ডুবতে শুরু করেছে। রিজোলি ভাবলেন, ঠান্ডা সমুদ্রের জলে এখন আলিঙ্গন করতে হবে আমাকে। পা অব্দি জল উঠে এসেছে। এবার? এবার আমি ডুবে মরব, চারপাশে অথৈ জলরাশি! আমাকে বাঁচাবার মতো কিছু নেই!

রিজোলি শেষবারের মতো হেলিকপ্টারের দিকে তাকালেন। চিৎকার করে বললেন ফিরে আসুন, আমি আপনাকে সব দেব।

উন্মত্ত বাতাস তার কণ্ঠস্বর কোথায় ভাসিয়ে দিল।

টনি রিজোলি শেষবারের মতো দেখলেন, জাহাজটা ডুবতে বসেছে। দেখতে পেলেন, আকাশে জ্যোৎস্নার অপূর্ব দৃশ্য। তার মধ্যে সুন্দর পাখির মতো উড়ে চলেছে ওই হেলিকপ্টার!

.

১৭.

সেন্ট মরিতজ। ক্যাথেরিন ভাবতে পারেনি, আঘাতটা তাকে এভাবে আক্রমণ করবে। অনেকক্ষণ সে তার হোটেল-ঘরে কৌচের ওপর একা একা বসেছিল। লেফটেনান্ট হান্স বার্গম্যানের শব্দগুলো তার কানে ঢুকছে না। উনি হলেন স্কি পেট্রলের প্রধান। কির্ক রেনল্ডস মারা গেছে, বার্গম্যানের কণ্ঠস্বর, ক্যাথেরিনের মনের সমুদ্রে তোলপাড়। ক্যাথেরিন কোনো শব্দ শুনতে চাইছে না। আবার সেই আতঙ্কঘন পরিবেশ। যেসব মানুষেরা আমাকে ভালোবাসে, কাছে আসে, তারা মৃত্যুর দেশে পৌঁছে যায় কেন? ক্যাথেরিনের মন এখন শূন্য। ল্যারি মারা গেছে। এবার কির্কের পালা। অন্যান্যরা নোয়েলে, নেপোলিয়ান ছোটাস, ফ্রেডারিক স্টাভরস, একটি পর একটি দুঃস্বপ্ন।

ক্যাথেরিনের চোখের তারায় এখন কোনো ভাষা নেই। কুয়াশার অন্ধকারে সব কিছু হারিয়ে গেছে। হান্স বার্গম্যানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল- শ্রীমতী রেনল্ডস, শ্রীমতী রেনল্ডস!

ক্যাথেরিন তাকাবার চেষ্টা করল। সে বলল–আমি শ্রীমতী রেনল্ডস নই, আপনার কোথাও একটা ছোট্ট ভুল হচ্ছে। আমার নাম ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। কির্ক আর আমি ছিলাম পরস্পরের বন্ধু।

–ঠিক আছে।

ক্যাথেরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল–কীভাবে? কীভাবে ঘটনাটা ঘটল? স্কি খেলাতে কির্কের দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়।

আমি জানি। এর আগে এখানে উনি অনেকবার স্কি করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আপনাকে সত্যি কথা বলব? মিস অলেকজান্ডার, এই ঘটনাটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমরা লাগাল-এ ওঁনার মৃতদেহ পেয়েছি। একটা স্লোপের ধারে। গত সপ্তাহে এই জায়গাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন তিনি নিষেধাজ্ঞা শোনেন নি? আমরা একটা সূচক চিহ্ন টাঙিয়ে রেখেছিলাম। মনে হয় উন্মত্ত বাতাস ওই চিহ্নটাকে সরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাটার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কীভাবে জবাবদিহি করব বুঝে উঠতে পারছি না।

সরি। এই একটিমাত্র শব্দ, এই শব্দ দিয়ে কি সবকিছু মুছে ফেলা যায়?

মিস আলেকজান্ডার, শেষকৃত্যের কাজ কীভাবে হবে? কিছু ভেবেছেন কী? তার মানে? মৃত্যুতেই সব কিছুর অবসান হয় না। আরও অনেক কিছু ভাবতে হবে। কফিনের ব্যবস্থা, কোথায় এক টুকরো জমি পাওয়া যাবে। ফুল কিনতে হবে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হবে। ক্যাথেরিন আবার সেই আর্তনাদের জগতে ফিরে গেল।

মিস আলেকজান্ডার।

–আমি কির্কের পরিবারের সকলের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছি।

–আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

.

লন্ডনে ফিরে আসা, শোকসন্তপ্ত একটা অভিযান। যে পাহাড়ের বুকে কিককে নিয়ে ক্যাথেরিন ঘুরে বেড়িয়েছিল, সেই পাহাড়টা এখন ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথেরিনকে আবার নতুন করে বাঁচার রসদ জোগাড় করতে হবে। নিজের ওপর সব আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে। মনে হচ্ছে, এখন থেকে আর কখনও সে সুখী জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে পারবে না।

আহা, কির্ক এত শান্ত ভদ্র স্বভাবের মানুষ, ওকে আরও বেশি ভালোবাসা উচিত ছিল। ক্যাথেরিন ভাবল, কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেল। কে দায়ী? কোনো কালো হাত? না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, কারোর অভিশাপ। আমার সমস্ত জীবনে সেই অভিশাপটা ছায়ার মতো আমাকে ঘিরে থাকবে। আমাকে যারা ভালোবাসবে, আমার সাহচর্যে আসবে, তারা সবাই ধ্বংস হবে। তার মানে এই পৃথিবীতে আমাকে একা একা থাকতে হবে।

.

ক্যাথেরিন লন্ডনে ফিরে এসেছে। কাজের মধ্যে মন দেবার চেষ্টা করছে। সে নিজের ফ্ল্যাটে একা একাই থাকে। কারোর সাথে দেখা করে না। কারোর সাথে কথা বলে না। হাউসকিপার অ্যানা তার জন্য খাবার তৈরি করে দেয়। ক্যাথেরিনের ঘরে পৌঁছে দেয়। ক্যাথেরিন খাবারে মুখ দেয় না। বেচারি অ্যানা, সে আর কী করতে পারে।

একদিন সে বলল–মিস অলেকজান্ডার, এভাবে তো আপনি মারা যাবেন। কিছু খাবার চেষ্টা করুন।

কিন্তু খাবারের কথা চিন্তা করলেই গা গুলিয়ে ওঠে। কির্কের সুন্দর মুখটা মনে পড়ে যায়।

.

পরের দিন ক্যাথেরিন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মনে হল যেন বুক জুড়ে সে ভালোভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে না। অসম্ভব একটা ভার সে বয়ে নিয়ে চলেছে। অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে।

এভাবে কতদিন থাকব, ক্যাথেরিন ভাবল, কিছু একটা করতে হবে।

ইভলিন কেই-এর সাথে এব্যাপারে সে আলোচনা করল।

যা ঘটেছে, তার জন্য আমি নিজেকে দোষারোপ করছি।

-এভাবে কথা বলে কী লাভ ক্যাথেরিন? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাকি জীবনের দিকে তাকাও।

–হ্যাঁ, জানি আমি, অতীত কখনোই আর ফিরে আসবে না। কিন্তু নিজেকে বড্ড বেশি দোষী বলে মনে হচ্ছে আমার। কারও কাছে মনের সব কথা খুলে বলতে পারলে ভালো হত। আমি কি কোনো মনোরাগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হব?

–আমি একজনকে জানি, অত্যন্ত ভালো মানুষ, ইভলিন বলল, সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মধ্যে উনি উইমসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ওঁনার নাম অ্যালান হ্যামিল্টন। আমার এক বন্ধু আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল, ডাঃ হ্যামিল্টনের সাথে তার দেখা হয়। হ্যামিল্টন তাকে প্রায় সারিয়ে তুলেছেন। এখন তার মন আনন্দে উৎফুল্ল। তুমি কি একবার! ডাঃ হ্যামিল্টনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি কী বলব? আমি কী বলতে পারি?

–ক্যাথেরিন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। কবে যেতে হবে বলো?

আমি একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে রাখার চেষ্টা করছি। উনি খুব ব্যস্ত থাকেন। চট করে অ্যাপয়ন্টমেন্ট পাওয়া যায় না।

-ঠিক আছে ইভলিন, তোমার এই উদ্যমকে আমি প্রশংসা করছি।

ক্যাথেরিন উইমসের অফিসে চলে গেল। কির্ক সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে ওই ভদ্রলোকের। ক্যাথেরিন ভাবল।

–উইম, কির্ক রেনল্ডসকে মনে আছে? কদিন আগে স্কি অ্যাকসিডেন্টে যার মৃত্যু হয়েছে।

–হ্যাঁ, ওয়েস্ট মিনিস্টার ৪৭১, তাই তো?

ক্যাথেরিনের চোখে দ্যুতি কী? সে বুঝতে পারল, উইম কির্কের টেলিফোন নাম্বার বলে যাচ্ছে। কিন্তু এটাই কি সব? কতগুলো সংখ্যা? মানুষ কোথায় উইম? মানুষ? আবেগ বাসনা-কামনা-অভিমান? উইম কি এভাবেই এক সাংকেতিক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাবে?

না, এখানে আর বেশিক্ষণ থেকে লাভ নেই। ক্যাথেরিন ভাবল। যে মানুষ হারিয়ে গেছে, তার স্মৃতি রোমন্থন করে কী লাভ? মনটা অকারণে আরও দুঃখকাতর হয়ে উঠবে।

.

ইভলিন কথা রেখেছিলেন। অ্যাপয়ন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী শুক্রবার। ইভলিন ভেবেছিলেন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে ফোন করে সবকিছু জানাবেন। পরে ভাবলেন, কিন্তু এই ব্যাপারটা এতই সাধারণ, এটা জানিয়ে ওঁনাকে বিরক্ত করে কী লাভ!

আলান হ্যামিল্টনের অফিস হল উইমপোল স্ট্রিটে। ক্যাথেরিন সেখানে গেল। অ্যালানের সাথে দেখা করার জন্য সে উদগ্রীব। মনটা একেবারেই ভালো নেই। কী বলবে তা

বুঝতে পারছে না। একজন অপরিচিত মানুষের কাছে কতটা সাহায্য চাওয়া যেতে পারে? ক্যাথেরিন ভাবল, কিন্তু উনি তো পেশাদার ডাক্তার। উনি নিশ্চয়ই আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

কাচের দরজার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রিসেপশনিস্ট বলল–ডাঃ হ্যামিল্টন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন মিস আলেকজান্ডার।

আমি কি তৈরি? ক্যাথেরিন ভাবল, তার মনে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিল। আমি এখানে কেন এসেছি? আমি কয়েকজন অশিক্ষিত মানুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করব? ওরা আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি?

ক্যাথেরিন হঠাৎ বলে বসল না, মিস, আমি আমার মন পরিবর্তন করেছি। কোনো ডাক্তারের সাহায্য আমার প্রয়োজন নেই। যদি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করেন তাহলে ভালো হয়।

–ঠিক আছে। একটুখানি সময় দিন।

কিন্তু... রিসেপশনিস্ট ডাক্তারের অফিসের ভেতর চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। দরজা খুলে গেল। অ্যালান হ্যামিল্টন নিজেই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বছর চল্লিশেক বয়স, লম্বা, এবং সোনালি চুল। চোখের তারা নীল। আন্তরিকতার চিহ্ন আছে আচরণে। তিনি ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

কী ব্যাপার? আমাকে কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?

ক্যাথেরিন আমতা আমতা করতে থাকে কেন?

আমি কিন্তু সত্যিই ভালো ডাক্তার। আপনি আমার রিসেপশন অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সুস্থ বলে মনে করছেন। এটাকে নোট করে রাখতে হবে।

ক্যাথেরিন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলে ওঠে–আমি দুঃখিত, আমার কোথাও ভুল হয়েছে। কারোর সাহায্য আমার দরকার নেই।

আপনার কথা শুনে খুবই ভালো লাগছে, অ্যালান হ্যামিল্টন বললেন, আহা, আমার সব পেশেন্টরা যদি আপনারা মতো চিন্তা করতে পারতেন! এত কষ্ট করে আপনি এলেন, আর একটু সময় থাকতে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। ততক্ষণ ভেতরে আসবেন কি? আসুন, আমরা পাশাপাশি বসে এক কাপ কফি খাই।

-না, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি ভেতরে যেতে পারব না।

–ঠিক আছে, আমি আপনার বেশি সময় নেব না।

ক্যাথেরিন ইতস্তত করল- ঠিক আছে, এক মিনিটের জন্য আমি যেতে পারি।

ক্যাথেরিন ডাক্তারকে অনুসরণ করল। শান্ত শুভ্র পরিবেশ, সুন্দরভাবে সাজানো, মনে হচ্ছে এটা বোধহয় একটা লিভিংরুম। দেওয়ালে প্রিন্ট ঝুলছে, কফি টেবিল, এক সুন্দরী মহিলার ছবি, পাশে এক তরুণ। ঠিক আছে এত সুন্দর অফিসে এলে মনটা তো ভালো হবেই। কিন্তু এতে কী প্রমাণিত হচ্ছে?

ডাক্তার হ্যামিল্টন বললেন–একটুখানি বসুন। এক মিনিটের মধ্যে কফি তৈরি হবে।

–ডাক্তার, আপনার সময় নষ্ট করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

–এজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

ডাক্তার ইজিচেয়ারে বসলেন। ক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকালেন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তিনি ক্যাথেরিনকে পরীক্ষা করছেন।

–আপনার তো অনেক সমস্যা? সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন।

–আপনি কী করে জানলেন? ক্যাথেরিন অবাক হয়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে রাগী ভাব ফুটে উঠেছে।

–আমি ইভলিনের সঙ্গে কথা বলেছি। সেন্ট মরিতজ-এ যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত।

-সত্যি? আপনি তো এত ভালো ডাক্তার, আপনি কি কির্ককে আবার জীবন দিতে পারেন?

বলতে বলতেই চারপাশটা রহস্যাবৃত হয়ে গেল। ঝড় উঠেছে। ক্যাথেরিন ভাবতেই পারছে না, নিজেকে সে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। শেষপর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে সে শুধু

বলল আমাকে একা থাকতে দিন ডাক্তার। আপনার দুটি পায়ে পড়ি। এখানে আমাকে আর আটকে রাখবেন না।

অ্যালান হামিল্টন অবাক চোখে তার এই নতুন পেশেন্টকে দেখলেন। কোনো কথা বললেন না।

ক্যাথেরিনের ফুঁপিয়ে কান্না শেষ হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত সে বলতে থাকে ডাক্তার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন কি আমি যেতে পারি?

ক্যাথেরিন উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

মিস আলেকজান্ডার, আমি জানি না, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব। আমি চেষ্টা করতে পারি। আমার আচরণের দ্বারা আপনি কোনোভাবেই আহত হবেন না, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

ক্যাথেরিন দরজার দিকে যেতে যেতে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করল। তার চোখ জলে ভরে গেছে।

–কেন যে কান্না আসছে, মনে হচ্ছে আমি হারিয়ে গেছি, আর কখনও জীবনে ফিরে আসতে পারব না।

অতি কষ্টে ক্যাথেরিন কয়েকটি শব্দ উচ্চরণ করে। অ্যালান হ্যামিল্টন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ক্যাথেরিনের দিকে হেঁটে গেলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

-তাহলে? আপনি কেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবছেন না? একটুখানি বসবেন কি? আসুন না, আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে কোনো কথা নিয়ে আলোচনা করি। দেখা যাক কফির কত দূর?

পাঁচ মিনিটের জন্য ডাক্তার বাইরে চলে গেলেন। ক্যাথেরিন একা বসেছিল। সে জানে না, কোথা থেকে গল্পটা শুরু হবে। আহা, ওই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে দারুণ আকর্ষণ আছে। মনে হচ্ছে ওঁর ওপর নির্ভর করা যায়।

হয়তো উনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন, ক্যাথেরিন শেষ পর্যন্ত ভাবল।

অ্যালান হ্যামিল্টন দুকাপ কফি নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়েছেন। একটু নীচু হয়ে তিনি বললেন মিস, ক্রিম আর সুগারের ব্যবস্থা আছে। আপনার লাগবে কী?

-না-না, অশেষ ধন্যবাদ। আপনি নিজে এত কষ্ট করছেন কেন?

–এভাবে বলবেন না, আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন, এটা তো আমার কর্তব্য।

ডাক্তার পাশের কৌচে বসে পড়লেন।

–আমি জানি, স্কি খেলতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে তাতেই আপনার বন্ধু মারা গেছে, তাই তো?

ব্যাপারটা এত দুঃখজনক এ নিয়ে ক্যাথেরিন কোনো কথা বলতে চাইছে না। শেষপর্যন্ত সে বলল–আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমার বন্ধু একটা স্লোপের ওপর উঠেছিল, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। জায়গাটা বিপদজ্জনক। বিপদচিহ্ন ছিল, মনে হচ্ছে উন্মত্ত বাতাস সেই চিহ্নটাকে সরিয়ে দিয়েছে।

–এই প্রথম আপনার কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হল। তাই কি?

এই প্রশ্নের উত্তর কি আমার জানা আছে, কী উত্তর আমি দেব? আমি কি চিৎকার করে বলব, ডাক্তার, আমার স্বামী এবং তার রক্ষিতা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। রাষ্ট্র তাদের অপরাধের শাস্তি দিয়েছে। সেটাও তো মৃত্যুর একটা ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনা কি আমার মনে শোকবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে?

আমি কিছুই জানি না। আমি কিছু জানি না। ক্যাথেরিন ভাবল। কিন্তু তাকে তো মুখ খুলতেই হবে। আমার চারপাশে যারা থাকে, তারা সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ডাক্তারকে সব কথা খুলে বলা দরকার। বলেই বা কী হবে? একই গল্প, একই সমবেদনা, আমি জানি, আমার এই অসুখের উপশম কোথাও হবে না।

অ্যালান হ্যামিল্টন বুঝতে পারলেন, যে-কোনো কারণেই হোক রোগিনীর মুখের ভাব থমথম করছে। তিনি বিষয়টা পরিবর্তন করলেন।

উইম কেমন আছে? তিনি জানতে চাইলেন।

এই প্রশ্ন ক্যাথেরিনকে একেবারে অবাক করে দিল।

–উইম? হ্যাঁ, উনি ভালোই আছেন। ইভলিন বলেছে, আপনি নাকি ওঁনার চিকিৎসা করেন।

–হ্যাঁ।

–কেন? উনি কি কোনো খারাপ আচরণ করেন?

উইম আমার কাছে এসেছে। কারণ সে একটির পর একটি চাকরি থেকে বরখাস্ত হচ্ছিল। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবী সম্পর্কে সে অত্যন্ত নিরা। আমি জানি না, এর অন্তরালে কী কারণ লুকিয়ে আছে। উনি সমস্ত মানুষকে ঘেন্না করেন, অন্য লোকের সাথে কথা বলতে ভয় পান।

ইভলিনের কথা মনে পড়ে গেল ক্যাথেরিনের–উইমের কোনো আবেগ নেই। কোনো কিছুর দ্বারা সে কখনও তাড়িত হয় না। এটাই তার সবথেকে বড়ো অসুখ।

–কিন্তু অঙ্কে উইমের মাথাটা খুবই পরিষ্কার। অ্যালান হ্যামিল্টন বলতে থাকেন, এখন উনি যেখান চাকরি করছেন, সেখানে প্রতি মুহূর্তে এই প্রতিভাটাকে কাজে লাগাতে পারেন।

ক্যাথেরিন মাথা নাড়লা, এত বড়ো প্রতিভাশালী মানুষ আমি কোথাও দেখিনি।

অ্যালান হ্যামিল্টন সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন মিস আলেকজান্ডার, আপনাকে অনেক ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। আমি জানি না, কীভাবে আপনি এই ব্যথার উপশম ঘটাবেন। আমি চেষ্টা করতে পারি।

ক্যাথেরিন উদাসভাবে বলল–সবকিছুই বিবর্ণ বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। কির্ক বেঁচে নেই, অথচ আমি বেঁচে আছি! এই ব্যাপারটা আমাকে আঘাত করছে।

শান্ত থাকবার চেষ্টা করুন। অ্যালান হ্যামিল্টন বলতে থাকেন, পৃথিবীতে অনেক কিছু ভাবরার আছে। হাসির টুকরো তার মুখে, আপনি আরও বেশি কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করুন। আবার এখানে আসবেন তো? যদি মনে হয়, আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন, তাহলেও আসবেন কিন্তু।

–আমি আপনাকে ঘৃণা করছি না, ক্যাথেরিন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, হতে পারে, নিজের মনের ওপর এখন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

অ্যালান হ্যামিল্টন ডেস্কের কাছাকাছি চলে গেলেন। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। দেখলেন, প্রত্যেকটা তারিখের ওপর লাল চিহ্ন, অর্থাৎ রোজই তাঁকে অনেক রোগীর সামনে দাঁড়াতে হবে।

আসছে সোমবার? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। একটার সময়?

একটার সময় তিনি লাঞ্চ খেতে যান। কিন্তু সেদিন লাঞ্চ খাওয়াটা ত্যাগ করবেন। ক্যাথরিন আলেকজান্ডার হলেন এমন এক ভদ্রমহিলা, ডাক্তার ভাবলেন, যাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে।

ক্যাথেরিন অনেকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের মুখের দিকে। এই মানুষটিকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারছে না কেন? তারপর বলল–ঠিক আছে।

-তাহলে? তখন আবার দেখা হবে।

ডাক্তার ক্যাথেরিনের হাতে একটি কার্ড তুলে দিলেন। এর মধ্যে যদি আমার সাহচর্যের প্রয়োজন হয়, অফিসের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, বাড়ির নম্বরও আছে, আমি খুব একটা ঘুমোতে পছন্দ করি না। যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে ফোন করতে ভুলবেন না কিন্তু।

ধন্যবাদ। এখানে সোমবার আসছি, তাই তো?

ডক্টর হ্যামিল্টন তাকিয়ে থাকলেন, ক্যাথেরিন হেঁটে চলে যাচ্ছে। মেয়েটির মধ্যে একটা আশ্চর্য আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। আছে শান্ত স্নিগ্ধ লাবণ্যের ছটা। আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে। কফি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ফটোগ্রাফটির ওপর তাকালেন তিনি। ভাবলেন তিনি, অ্যাঞ্জেলা এখন কোথায় আছে?

.

মাঝরাতে টেলিফোনটা ঝন্ ঝনাৎ শব্দে আর্তনাদ করতে থাকে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস শুনতে থাকেন, অবশেষে যখন তিনি কথা বললেন, অবাক হয়ে গেছেন তিনি খেলে ডুবে গেছে? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

সংবাদটা শোকাবহ, কিন্তু সত্যি মিঃ ডেমিরিস। কোস্টগার্ডরা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে।

–কেউ কি বেঁচে আছে?

–না, স্যার। সকলেই মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে।

–সত্যি, ঘটনাটা আমাকে আঘাত করেছে। কেউ কি এই দুর্ঘটনার বিষয়ে কিছু জানে? |||||

||||| –না, কেউ হয়তো জানাতেও পারবে না। সব চিহ্ন তো সমুদ্রের তলায় চলে গেছে।

হায়, সমুদ্র, সমুদ্র আবার ভয়ানক আচরণ করল! ডেমিরিস ফিসফিস করে বলতে থাকেন।

–আমরা কি বীমা কোম্পানির কাছে আবেদন করব?

যখন মানুষগুলোই চলে গেছে, সামান্য কটা টাকা নিয়ে আর কী হবে? হ্যাঁ, একটা আবেদন তো করতেই হবে।

ডেমিরিস হাসলেন। দুর্মূল্য ওই ফুলদানিটা তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রেখে দেবেন।

এবার সময় এসেছে, শালাবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়াটা খেলতে হবে।

পরিতৃপ্ত ডেমিরিস মনে মনে পশথ নিলেন। কঠিন উচ্চারণে ভরা সেই শপথ।

.

১৮.

স্পাইরস লামব্রো অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছেন। যে-কোনো মুহূর্তে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা ভেসে আসবে। রেডিয়ো বাজছে। কাগজের সর্বশেষ সংস্করণগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছেন। এখন আমাকে কিছু একটা করতে হবে। ইতিমধ্যে তো ঘটনাটা ঘটা উচিত ছিল। কোথাও কোনো সমস্যা হল নাকি? টনি রিজোলির কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে। থেলে থেকে টনি জানিয়েছিলেন, জাহাজ এবার সমুদ্র অভিমুখে। যাত্রা শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে লামব্রো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমকে ফোন করেছিলেন। কোনো নাম বলেননি। বলেছিলেন, থেলে জাহাজের মধ্যে নিষিদ্ধ হেরোইন চলেছে।

তাহলে? এতদিনে তো ধরা পড়ার কথা। খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা কি বোকা, নির্বোধ নাকি? মুখরোচক খবরটা সংগ্রহ করতে পারেনি?

ইন্টারকম বেজে উঠল- মিঃ ডেমিরিস আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।

–কেউ বোধহয় ডেমিরিসের হয়ে কথা বলছেন, তাই বলো।

না, স্যার। মিঃ ডেমিরিস নিজেই কথা বলতে চাইছেন।

কথাগুলো শুনে লামব্রো অবাক হয়ে গেলেন। মনে হল, শীতালী বাতাস তাকে আক্রমণ করেছে। এটা হতেই পারে না! অত্যন্ত শঙ্কিত হাতে তিনি রিসিভার তুলে বললেন কোস্টা?

–স্পাইরস? ডেমিরিসের কণ্ঠস্বর আনন্দ উপছে উঠছে। কেমন আছো তুমি? ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?

–ভালোই-ভালোই। তুমি কেমন আছো? আছো কোথায়?

–আমি এথেন্সে আছি।

–ও! লামব্রো ঢোক গিললেন। একটু বাদে আমরা কথা বলব, কেমন?

–আজ আমি খুব ব্যস্ত থাকব। আজকে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে কী? তুমি কি ফ্রি আছো? লামব্রোর একটা গুরুত্বপূর্ণ দরকার ছিল। তবুও তিনি বললেন–ঠিক আছে, লাঞ্চে দেখা হচ্ছে।

-ঠিক আছে। দুপুর দুটোর সময় ক্লাবে দেখা করো, কেমন?

লামব্রো রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। কী হল? নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। কী হয়েছে, উনি সেটা লাঞ্চেই বুঝতে পারবেন।

.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস স্পাইরসের জন্য তিরিশ মিনিট অপেক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত স্পাইরস এসে বললেন–দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।

-না-না, তুমি কত ব্যস্ত মানুষ! তোমার তো দেরি হতেই পারে।

স্পাইরস ডেমিরিসকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা কি তার মুখে ছাপ ফেলেছে? না, ভালোভাবে দেখে তার মনে হল, গত কয়েকদিন ডেমিরিসের জীবনে এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, যার জন্য সে চিন্তিত। তাহলে? সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তাই নয় কি?

–আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে, ডেমিরিস আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে। তুমি কী খাবে? দেখা যাক, আজকের মেনুটা কী?

মেনুকার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন ডেমিরিস।

–আহা, আজ স্ট্রিডিয়া পাওয়া যাচ্ছে! তুমি ওয়েস্টার খাবে কি স্পাইরস?

না, আমার এখন খুব একটা খিদে নেই।

স্পাইরস বোধহয় তার খাবার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছেন।

ডেমিরিসকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা অজানা কারণে তিনি খুবই উৎফুল্ল। কিন্তু কেন? লামব্রোর অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। কী করবেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

অর্ডার দেওয়া হল। ডেমিরিস বললেন–স্পাইরস, তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্পাইরস জানতে চাইলেন–কী জন্য?

–তুমি একটা ভালো খদ্দের পাঠিয়েছিলে–রিজোলি।

লামব্রোর ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে রিজোলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

-হ্যাঁ, চমৎকার মানুষ! উনি একটা বড়ো ব্যবসার কথা বলেছেন। আমাদের ভাগ্য একেবারে ফেঁপে ফুলে যাবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, রিজোলি বোধহয় আর বেঁচে নেই।

স্পাইরস চমকে উঠলেন কেন? কী হয়েছে তার?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও বোধহয় মরে গেছে।

–কেন? কী করে দুর্ঘটনা ঘটল?

-হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই বলতে পারো, স্পাইরস। ডেমিরিস তাকিয়ে থাকলেন তাঁর শালাবাবুর চোখের দিকে। আসলে বিশ্বাসঘাতককে এভাবেই শাস্তি দেওয়া উচিত।

–আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!

সত্যি বুঝতে পারছ না? তুমি আমাকে শেষ করতে চেয়েছিলে। তোমার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আমি তোমাকে খোলাখুলি বলে রাখছি, আবার চেষ্টা করে দেখো। দেখো নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করতে পারো কিনা। তবে তোমার এই কাজে তুমি কখনোই সফল হবে না।

-সত্যি, তুমি কী বলছ, আমি বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝতে পারছি না।

–স্পাইরস, নিজেকে খুব চালাক বলে মনে করো, তাই তো? তোমার অবস্থা খুবই খারাপ। তবে আগে তোমার বোনের ব্যাপারটা আমি দেখব। তারপর তোমার পালা।

খাবার এসে গেছে। ডেমিরিস বললেন–এসো, ভবিষ্যতে কী হবে, তা ভেবে আজকের সুন্দর লাঞ্চটা মাটি করো না যেন।

কিছুক্ষণ বাদে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এই লাঞ্চের সাফল্যের বিষয়ে ভাবতে থাকলেন। আহা, একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। স্পাইরস লামব্রোকে দেখে মনে হল, তিনি বুঝি এক ফেলে দেওয়া মানুষ। ডেমিরিস জানেন, স্পাইরস তার বোনকে কতখানি ভালোবাসেন। ডেমিরিস দুজনকেই শাস্তি দেবেন। কঠিন শাস্তি, হয়তো বা মৃত্যুদণ্ড!

–কিন্তু কিছু কাজ বাকি থেকে গেছে। একটা মস্ত বড়ো কাজ। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। কির্ক রেনল্ডসের মৃত্যুর পর মেয়েটির অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। এক হিস্টিরিয়া রোগিনীতে পরিণত হয়েছে সে।

ক্যাথেরিনের সাথে দেখা হলে কী কী বলা যায়, ডেমিরিস তার মহড়া দিতে থাকলেন।

–ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি ভাবতে পারছি না।

–এই ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখিত, ক্যাথেরিন। আমি জানি, তুমি কির্ককে কতখানি ভালোবাসতে। কিকের মৃত্যু আমাদের দুজনের কাছেই একটা খারাপ খবর।

না, পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে, ডেমিরিস ভাবলেন। রাফিনাতে যাবার মতো সময় এখন হাতে নেই। ক্যাথেরিনের সাথে শেষ বোঝাপড়াটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ ক্যাথেরিনের হাতে সেই গুপ্ত খবরটা আছে–নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাস সংক্রান্ত ব্যাপারে। তাকে আর বেশি দিন এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন ডেমিরিস নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচতে পারবেন না। কীভাবে এই মৃত্যুটা হবে? কোনো একটা পন্থা তো বের করতেই হবে। ক্যাথেরিনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই ডেমিরিসের পথ একেবারে পরিষ্কার। অপরাধের কোনো চিহ্ন থাকবে না।

ডেমিরিস ডেস্ক থেকে টেলিফোনটা তুলে নিলেন। একটি নাম্বার ডায়াল করলেন। একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডেমিরিস বললেন–সসামবার আমি কাউলুনে পৌঁছোব, সেখানে থেকো কিন্তু।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। উত্তরে কী শোনা গেল, তা জানতে তিনি মোটেই আগ্রহী নন।

.

প্রাচীর ঘেরা এই শহরে ডেমিরিসের একটা ফাঁকা বাড়ি আছে। দুজনের মধ্যে সেখানেই দেখা হল।

–এটা কিন্তু একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। সেইভাবে সব ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস জিজ্ঞাসা করলেন।

এটা পরিষ্কার একটা অপমান। সমস্ত শরীর রাগে কেঁপে উঠেছে। কথাটা হল, তুমি কি রাস্তা থেকে কাউকে তুলে এনেছ? সে ভেবেছিল, চিৎকার করে অনেক কিছু বলবে, কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট আপনি পছন্দ করবেন? ঘরের মধ্যে? আমি অনেক কিছু করতে পারি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে হঠাৎ পড়ে যেতে পারে। ঘুষি মেরে তার নাকটা আমি ফাটিয়ে দিতে পারি। ঘটনাটা মারসেইলসে ঘটবে কী? হয়তো এমন হল, মদ খেতে খেতে সে বেসামাল হয়ে গেল। বাথটবের মধ্যে ডুবে মরুল। হেরোইন বেশি মাত্রায় খেল। তিনটে পন্থা আছে- ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেল চিরনিদ্রার জগতে, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। সুইডিস ডিটেকটিভরা ভাববে, সবটাই বুঝি একটা অ্যাকসিডেন্ট। অথবা, যদি আপনি মনে করেন, বাইরে কাজটা করতে হবে, আমি একটা ট্রাফিক

অ্যাকসিডেন্টের ব্যবস্থা করতে পারি, প্লেন ক্রাশ। কিংবা সমুদ্রে জাহাজের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

কথাগুলো শেষ পর্যন্ত সে আর উচ্চারণ করেনি। সে জানে, উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটি কত শক্তিশালী। এই মানুষটি সম্পর্কে সে হাড় হিমকরা অনেক গল্প শুনেছে। গল্পগুলো বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে গদগদ হয়ে বলল–ইয়েস স্যার। আমি একটা সুন্দর দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করতে পারি। কেউ তা বুঝতেই পারবে না। কথাগুলো তার পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই লোকটাকে বোকা বানানো কী সহজ। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। জানালার ধারে চলে গেল। রাস্তা থেকে শব্দ ভেসে আসছে। নানা ভাষার কচকচানি। তারা এই প্রাচীর ঢাকা শহরের বাসিন্দা।

ডেমিরিস তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শান্ত অভিব্যক্তিহীন শীতল সেই চাউনি।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন–পন্থাটা তুমিই নির্ধারণ করো। তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা।

–ইয়েস স্যার। কাউলুনে তাকে পাব কী?

–না, লন্ডনে। তার নাম ক্যাথেরিন, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার। সে আমার লন্ডন অফিসে কাজ করে।

তার সঙ্গে দেখা হবে কী করে?

ডেমিরিস এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন- আগামী সপ্তাহে লন্ডনে একদল প্রতিনিধি যাবে। আমি তোমাকে সেই দলে ঢুকিয়ে দেব। একটা কথা

ইয়েস স্যার।

–আমি চাই না, কেউ তার দেহটাকে সনাক্ত করুক।

.

১৯.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের ডাক শুভ সকাল ক্যাথেরিন, আজ কেমন আছো?

অনেক ধন্যবাদ কোস্টা, আজ কেন জানি না মনটা আমার ভালোই লাগছে।

–ভালো আছো তো?

–হ্যাঁ।

–ঠিক আছে। তোমার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে আমি যে কী আনন্দ পাচ্ছি, কাকে বোঝাব.আমাদের কোম্পানির একদল প্রতিনিধি লন্ডনে আসছে। আমাদের কী ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তা খুঁটিয়ে দেখবে। তুমি ওদের দায়িত্ব নিও কিন্তু। দেখো, যেন কোথাও অসুবিধা না হয়।

–আপনার এই কাজ করতে পেরে আমি তো খুশিই হব। কখন ওরা এখানে আসবে?

কাল সকালে।

–আমি সব কিছু নিজের হাতে করব। আপনি কিছু ভাববেন না।

–তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা ক্যাথেরিন। তুমি আছো বলেই তো আমি শান্তভাবে আমার কাজকর্ম সামলাচ্ছি।

–অত বলতে হবে না।

গুডবাই ক্যাথেরিন।

এইভাবে কথাটা থেমে গেল।

.

কাজ শুরু হয়ে গেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস চেয়ারে বসলেন। গভীরভাবে চিন্তা করলেন, ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পর আর কে কে বাকি থাকবে? না, এবার তিনি তার দুর্বিনীতা স্ত্রী ও তার উদ্ধত ভাইয়ের দিকে পুরো দৃষ্টি দিতে পারবেন।

অফিস থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি আসছে। তোমাকে সেখানে থাকতে হবে। ওদের সাহচর্য দিতে হবে। আশা করি বুঝতে পারছ।

মেলিনা অবাক হয়ে গেছেন। কী আশ্চর্য এমন একটা প্রস্তাব? সম্পর্কটা অন্য দিকে যাচ্ছে নাকি?

.

রাতের ডিনার শুরু হয়ে গেছে। তিনজন এসেছেন, তারা খেয়েছেন, চলে গেছেন। মেলিনা ভাবতে থাকেন, এত নিস্পৃহ ডিনার এর আগে কোথাও হয়েছে কী?

মেলিনাকে ওঁদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে কিছু প্রশংসার বাক্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। মেলিনা ভুলেই গিয়েছিলেন শেষ কবে কোস্টা তার ব্যাপারে এত কথা বলেছেন। কোস্টা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছিলেন। প্রশংসার বাণী। ওঁরা অবাক হয়ে শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল, ওঁরা বোধয় এক মহান মানুষের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। মেলিনা কথা বলার বিশেষ সুযোগ পাননি। যখনই তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কোস্টা বাধা দিচ্ছিলেন। শেষ অব্দি মেলিনা চুপটি করে বসে থাকতে বাধ্য হন।

তাহলে আমাকে এখানে আনা হল কেন? মেলিনা অবাক হয়েছেন।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে আসছে। এবার ওঁরা তিনজন চলে যাবেন।

ডেমিরিস বললেন–কাল সকালে আপনারা লন্ডনের দিকে উড়ে যাবেন। আমার মনে হয় সেখানে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

তারা তিনজন চলে গেলেন।

.

পরের দিন সকালবেলা প্রতিনিধি দল লন্ডনে নামলেন, সংখ্যায় তারা ছিলেন তিনজন। তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এসেছেন।

একজন মার্কিন বাসিন্দা জেরি হ্যালি। লম্বা মোটাসোটা ভদ্রলোক। মুখের ওপর বন্ধুত্বের ছাপ। মুখখানা গোলগাল চোখের তারার রং ধূসর। এত লম্বা হাত ক্যাথেরিন কখনও দেখেনি। ক্যাথেরিন এঁদের দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এঁরা সকলেই নিজের মতো করে জীবন কাটাতে ভালোবাসেন। সবসময় কাজ করেন। জীবনটা ঘাত-প্রতিঘাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। নতুন কিছু করার নেশা এঁদের পেয়ে বসেছে।

দ্বিতীয়জন ফরাসি দেশের বাসিন্দা, ইভেস রেনার্ড। বেঁটেখাটো এবং সবল দেহের অধিকারী। চেহারার মধ্যে একটা আলাদা অভিব্যক্তি আছে। ঠান্ডা চোখের তারা। মনে হয়, উনি যেন অন্তর্ভেদী চাউনিতে সবকিছু দেখতে পান। তাকে দেখে ক্যাথেরিনের মনটা কেমন বিষিয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক আত্মকেন্দ্রিক, নিজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসেন। এঁকে কেন পাঠানো হয়েছে। ক্যাথেরিনের মনে ঘৃণার উদ্রেক হল। যাক, আমার ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি তা পালন করবই।

এই দলের তৃতীয় সদস্য হলেন ডিনো মাত্তুসি। ইতালি থেকে এসেছেন। বন্ধুত্বের আচরণ আছে তার শরীরের সবখানে। মনে হয়, সব ব্যাপারেই তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহী।

মাত্তুসি বললেন–মিঃ ডেমিরিস আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। আপনাকে উনি খুবই ভালোবাসেন।

-না-না, এসব বানানো কথা।

–আপনি লন্ডন শহরে আমাদের সাহায্য করবেন, তাই তো? আপনার জন্য আমি একটা ছোট্ট উপহার এনেছি।

উনি ক্যাথেরিনের হাতে একটা ছোট্ট বাক্স তুলে দিলেন। আহা, এর ভেতর সিল্কের স্কার্ফ রয়েছে।

ক্যাথেরিন এতটা আশা করেনি। অবাক হয়ে সে বলল–ধন্যবাদ, ভারি সুন্দর এই স্মারকটি! এবার অফিসের দিকে যাত্রা শুরু করা যাক।

কী একটা শব্দ শোনা গেল। তারা সকলে পেছন ফিরে তাকালেন। অল্প বয়সী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ধরা সুটকেস তিনটে চতুর্দিকে ছিটকে পড়েছে। সে সেগুলো তোলার চেষ্টা করছে। ছেলেটিকে দেখে বছর পনেরোর বলে মনে হচ্ছে। বয়সের তুলনায় খর্বাকৃতি, বাদামি চুল, সবুজ চোখ। দেখলে মনে হয় সে অপুষ্টির শিকার।

–ঈশ্বরের দোহাই, রেনার্ড বললেন, এইসব জিনিসগুলোর ব্যাপারে আমাদের আরও তৎপর হওয়া উচিত।

ছেলেটি বলল–আমি দুঃখিত। আমায় ক্ষমা করবেন। সুটকেসগুলো কোথায় রাখব?

রেনার্ড অধৈর্যভাবে বলে উঠলেন–যেখানে খুশি রাখতে পারো। পরে সেগুলো আমরা নিয়ে নেব।

ক্যাথেরিন ওই ছেলেটির দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে ছিল।

ইভলিন বলেছিলেন- এথেন্সে ছেলেটি অফিস বয়ের চাকরি করত। না, ওকে আর রাখা যাবে না। আমরা আর একটা ভালো অফিস বয়ের সন্ধান করব।

ক্যাথেরিন জানতে চাইল–তোমার নাম কী?

–আটানস, ম্যাডাম। তার চোখে জল এসে গেছে।

-ঠিক আছে আটানস, তুমি সুটকেসগুলো একটা ফাঁকা ঘরে রেখে যাও। দেখো, যেন সেগুলো ঠিক মতো থাকে।

ছেলেটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল–ম্যাডাম, অনেক ধন্যবাদ।

ক্যাথেরিন পেছন ফিরে তাকালেন। বললেন, আপনারা আমাদের কাজকর্ম দেখবেন, তাই তো? মিঃ ডেমিরিস তাই বলেছেন। আমি সব ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করব। যদি কোনো তথ্যের দরকার হয়, একটু আগে বলবেন। সব তথ্য আপনাদের হাতে তুলে দেব। এখন আসুন, আমি উইম এবং আমাদের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আপনাদের পরিচয় করাচ্ছি।

তারা করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন। ক্যাথেরিন উইমের অফিসে গিয়ে পৌঁছোলেন।

উইম তাদের দিকে তাকালেন গ্রিসের জনসংখ্যা কত জানেন? ৭০ লক্ষ ৬ হাজার।

লোকগুলো অবাক হয়ে গেছেন। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন তাঁরা।

ক্যাথেরিন হেসে উঠলেন। সত্যি তো, উইমের কথা বলার ধরনটাই এই রকমের।

ক্যাথেরিন বলল–আপনাদের অফিস তৈরি হয়েছে, আপনারা কি এখনই অফিসে যাবেন?

আবার তারা করিডরে এলেন। জেরি হ্যালিজিজ্ঞাসা করলেন–ওর মাথায় কি ছিট আছে? আমি বুঝতে পারছি না।

ক্যাথেরিন বলল–উইম সব ব্যাপারে খবর রাখতে ভালোবাসেন। কিন্তু অঙ্কে তার মাথাটা খুবই পরিষ্কার। তাই চাকরিটা এখনও বেঁচে আছে।

কী আশ্চর্য, কথা বলার ধরন দেখে আমার হাসি পাচ্ছে!

হ্যালিমন্তব্য করলেন।

–পরে দেখা হলে উচিত শিক্ষা দেব।

ফরাসি ভদ্রলোক বললেন–আর দেখা হবে কী?

–আপনাদের জন্য একটা ভালো হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা কি একই হোটেলে থাকবেন, নাকি বিভিন্ন হোটেলে?

মাত্তুসি বললেন–আমরা বিভিন্ন হোটেলে থাকতে চাইব।

ক্যাথেরিন কিছু একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু এখন কিছু বলা উচিত নয়। যদি আগন্তুকরা বিভিন্ন জায়গায় থাকতে ভালোবাসেন, সে বাধা দেবে কেন?

.

উনি যতটা ভাবতে পারেননি, ক্যাথেরিন সত্যি তার চেয়েও বেশি সুন্দরী। ক্যাথেরিনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথেরিন সম্পর্কে একটা ছবি এঁকেছিলেন মনের ক্যানভাসে। দেখার পর ব্যাপারটা আরও উৎসাহব্যঞ্জক বলেই মনে হচ্ছে। যন্ত্রণার ছাপ আছে মুখের সর্বত্র। আমি ক্যাথেরিনের চোখের ভাষা পড়তে শিখেছি। আমি বোঝাব, যন্ত্রণা কত ভয়ংকর হতে। পারে। আনন্দের যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের বেদনা।

তারপর? নাটকের শেষ অঙ্কে পৌঁছে আমি কী করব? আমি ওকে এমন একটা জগতের বাসিন্দা করে দেব, যেখানে কোনো দুঃখ নেই। তার আগে? তার আগে ওর সঙ্গে কিছু সুখী সম্পৃক্ত প্রহর কাটাতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তকে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে।

হ্যাঁ, আমি মনে মনে এই শপথ নিলাম।..

.

ক্যাথেরিন প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের অফিসগুলো দেখিয়ে দিল। যেখানে তারা থাকবে সেই হোটেলগুলো। এবার ক্যাথেরিন ডেস্কে ফিরে এসেছে। করিডর থেকে ক্যাথেরিন শুনতে পেল ওই ফরাসি ভদ্রলোক ছোটো কিশোর ছেলেটিকে কী যেন বলছে।

–এটা, আমার ব্রিফকেস নয়। বোকা হাঁদা, আমারটা হল বাদামি রঙের। তুমি কি ইংরেজি বুঝতে পারো?

না স্যার, আমি বুঝতে পারি না। ছেলেটির কণ্ঠস্বরে ভয় ফুটে উঠেছে।

ক্যাথেরিন ভাবল, এখনই কিছু করা দরকার।

.

ইভলিন কেই বলে উঠলেন–আমার কোনো সাহায্য লাগবে কি?

ইভলিন, যদি দরকার হয়, আপনাকে আমি ডেকে নেব।

তারপর কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। আটানস ক্যাথেরিনের অফিসের বাইরে এসে দাঁড়াল। ক্যাথেরিন ডাকল তুমি কি ভেতরে আসবে? ছেলেটির চোখে মুখে ভয়ার্ত প্রতিচ্ছবি।

–আমি কি আসতে পারি? দরজাটা বন্ধ করে দাও।

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–চেয়ারে বসো আটানস। নামটা আমি ঠিক বলছি তো।

–ঠিক বলছেন ম্যাডাম।

ক্যাথেরিন সহজ হবার চেষ্টা করল।

-বলো কেন ভয় পেয়েছ?

–না-না, ম্যাডাম, আমি, বসতে পারব না।

ক্যাথেরিন তার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পারল, কোনো একটা ঘটনা কিশোরটিকে অবাক করে দিয়েছে। সমস্যাটা কী? জানাবার চেষ্টা করতে হবে।

–আটানস, সত্যি করে বলো তো, কেউ তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে কিনা? তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?

–ম্যাডাম, আমি কিছু বলতে চাইছি।...

কিন্তু ছেলেটি কোনো কথা বলছে না কেন? কেউ বোধহয় ওঁর মনটাকে ভেঙে দিয়েছে।

–ঠিক আছে, ভবিষ্যতে দেখা হলে কথা হবে কেমন? ক্যাথেরিন হাসতে হাসতে বলল।

.

প্রতিনিধিদল তাদের কাজ করতে শুরু করছেন। কনস্টনটিন ডেমিরিসের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি তারা ঘুরে ঘুরে দেখবেন। বিশাল এই সাম্রাজ্যের কাজ কেমন হচ্ছে, সবকিছু বুঝতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো? ডিনো মাত্তুসি সম্পর্কে ক্যাথেরিন বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করছে। লোকটার গতিবিধি সন্দেহজনক। ক্যাথেরিনকে তিনি এমন কিছু প্রশ্ন করছেন, যার উত্তর হয় না। দেখা যাচ্ছে, তিনি লন্ডনের ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎসাহী। কোম্পানির ব্যাপারটা নিয়ে তার খুব একটা মাথাব্যথা নেই। তিনি শুধু ক্যাথেরিনের ফেলে আসা জীবনকাহিনী শুনতে চাইছেন।

ডিনো প্রশ্ন করলেন- আপনি কি বিবাহিতা?

–না।

-কিন্তু আপনার তত বিয়ে করা উচিত ছিল।

–হ্যাঁ।

–আপনাদের কি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে?

ক্যাথেরিন এই কথোপকথন বন্ধ করার জন্য বলে ফেলে–আমি একজন বিধবা।

ডিনো অবাক হয়ে তাকালেন- আপনার একজন বন্ধু আছে কী? আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, আপনার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে।

–আপনার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না।

ক্যাথেরিন ভেবেছিল শক্তভাবে জবাব দেবে–এটা আপনার কোনো ব্যাপার নয়। na, সেটা সে মুখে বলেনি।

আপনার কি বিয়ে হয়েছে?

–হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আছে। চারটে ছোটো বাচ্চা আছে। আমি তাদের সঙ্গে থাকতে পারছি না। মনটা খুবই খারাপ।

মাঝে মধ্যেই আপনাকে বাইরে যেতে হয়, তাই না?

–ডিনো তাকালেন- হ্যাঁ, আপনি আমাকে আমার ডাক নামে ডাকতে পারেন। ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। তাঁর গলার স্বর পাল্টে গেছে কোনো কোনো সময় বাইরে গেলে অজানা অচেনা আনন্দের সামনে দাঁড়াই। আশা করি, আপনি আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারছেন।

ক্যাথিরিন হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলল না।

.

বারোটা বেজে পনেরো। মধ্য দুপুর। ডঃ হ্যামিল্টনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। অবাক হয়ে গেল ক্যাথেরিন, এখনও নামটা মনে আছে! কীভাবে ক্যাথেরিন তার কাছে গিয়েছিল, সবকিছু মনে পড়ে গেল তার। তবে এখন সে অন্য মন নিয়ে চেম্বারের দিকে

এগিয়ে চলেছে। রিসেপশনিস্টকে দেখা গেল না। লাঞ্চে গেছে বোধহয়। ডাক্তারের অফিসের দরজা খোলা। অ্যালান হ্যামিল্টন বোধহয় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

অ্যালান বললেন–ভেতরে আসুন।

ক্যাথেরিন অফিসের মধ্যে ঢুকে গেল। চেয়ারে বসে পড়ল।

–গত সপ্তাহ কেমন কেটেছে? ভালো তো?

ক্যাথোরিন মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে। ভালোেমন্দের বিচার সে করতে পারবে কি? এখনও কির্কের ঘটনাটা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হ্যাঁ, ঠিকই কেটেছে। নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি।

–এটাই তো করা উচিত।

–আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব। উত্তর দেবেন? আপনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের অফিসে কতদিন চাকরি করছেন?

-চার মাস।

কাজ ভালো লাগছে?

–মনটাকে তো শান্ত করতে পারছি। ডেমিরিসের কাছে আমার ঋণের কোনো শেষ নেই। উনি যে আমার জন্য কী করেছেন, আমি তা গুণে শেষ করতে পারব না।

ক্যাথেরিন মিষ্টি করে হাসল।

অ্যালান হ্যামিল্টন মাথা নেড়ে বললেন–আপনি যা বলতে এসেছেন, সবকিছু খুলে বলতে পারেন।

এক মুহূর্তের নীরবতা। শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন ভেঙে পড়ল আমার স্বামী ডেমিরিসের অফিসে কাজ করত। সে ছিল একজন পাইলট। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল, আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন আমি আবার স্মৃতি ফিরে পেলাম, ডেমিরিস আমাকে চাকরিটা দিয়েছিলেন।

অনেক কথাই বলা হল না, দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, আতঙ্কের কথা। এসব কথা আমি কী করে বলব? আমি কী করে বলব, আমার স্বামী আমাকে মারতে চেয়েছিল। কারণ আমি তাকে ডিভোর্স দিতে রাজি ছিলাম না।

অতীতের কথা ভেবে কী লাভ? আমাদের কারো পক্ষেই বোধহয় সেটা সুখদায়ক হয় না।

ক্যাথেরিন কথাগুলো বলবে না ভাবল। বলেও ফেলল।

আপনার নাকি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গিয়েছে?

–হ্যাঁ।

–একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল? নৌকো ডুবে গিয়েছিল?

-হ্যাঁ, ক্যাথেরিনের ঠোঁট শুকনো হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব বলার চেষ্টা করেছে সে। এখনও তার মনের ভেতর সংশয় আর দ্বিধা। সে কি সব কথা বলবে? সাহায্য চাইবে? নাকি কিছুই বলবে না। ডাক্তারকে এই অবস্থায় বসিয়ে রেখে চেম্বার থেকে একলা চলে যাবে।

অ্যালান হ্যামিল্টন ভালোভাবে ক্যাথেরিনের দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন–আপনার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে?

ক্যাথেরিনকে বোধহয় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়েছে না, আমার স্বামী বেঁচে নেই।

মিস আলেকজান্ডার, যদি আপনাকে ক্যাথেরিন বলে ডাকি, আপনি কি রাগ করবেন?

–না।

–আমি অ্যালান। ক্যাথেরিন, কীসে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

–কেন, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি সব সময় ভয় পাচ্ছি?

–আপনি কি ভীত নন?

না।

দীর্ঘকালের নীরবতা।

ক্যাথেরিন কথা বলতে সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছে। তার ভয় হচ্ছে বোধহয় অতীতের জঘন্য ছবিগুলো আবার সামনে এসে দাঁড়াবে।

শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল- আমার চারপাশের লোকেরা কেন মারা যাচ্ছে বলুন তো?

আঘাতটা সরাসরি। ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন আর আপনি নিজেকে সেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, তাই তো?

না-না, আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

–এটা মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে, যেসব ঘটনাগুলো ঘটছে, আমরা নিজেদের সেই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ করি। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভাবে, তারাই এর জন্য দায়ী। মনে করুন, কেউ একজন অভিশাপ দিল, একজন মারা গেল, ওই লোকটির অবস্থা কী হয় বলুন তো? এসব চিন্তা ভাবনা মন থেকে দূর করুন। যা ঘটবার তা ঘটবেই। আপনি কেন নিমিত্তের দায়ভার নেবেন?

-না-না, ডাক্তার, আমি কিছুতেই আমার অস্থির মনকে শান্ত করতে পারছি না। আপনি যা ভাবছেন ঘটনাগুলো তার থেকেও বেশি ভয়াবহ।

ডাক্তার ক্যাথেরিনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। কয়েকটা শব্দ ভেসে এল তার মুখ থেকে ঘটনাগুলো এখন উচ্চারণ করা যাবে কি?

ক্যাথেরিন বলতে থাকে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। জানি না, হত্যা নাকি দুর্ঘটনা তার রক্ষিতাকেও মেরে ফেলা হয়েছে। যে দুজন আইনবিদ তাদের হয়ে লড়াই করেছিলেন তারাও কেউ বেঁচে নেই। এবার বোধহয় কির্কের পালা ছিল। তাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথা বলতে বলতে ক্যাথেরিনের গলা বসে গেছে।

–আপনি নিজেকে এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ করছেন, তাই তো? তাই আপনার কাঁধের ওপর অনেক বোঝ। আমি কি ঠিক বলছি?

না, এভাবে বলতে পারব না। তবে সবসময় মনটা আমার শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অন্য কারোর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে আমি ভয় পাই। আমার মনে হয়, আমার বন্ধুত্ব সেই লোকটির জীবন নাশের কারণ হবে।

ক্যাথেরিন, আপনি কি কারও জীবনের দায়িত্ব নিতে পারেন? এই পৃথিবীতে কেউ পারে না। জন্ম আর মৃত্যুর ওপর আমাদের কারও হাত নেই। আপনি খুব সরল। অনভিজ্ঞা। ভেবে দেখুন তো ঠান্ডা মাথায়, যেসব মৃত্যুর ঘটনা আপনি বললেন, তার সঙ্গে আপনার যোগসূত্রতা কতখানি? এ ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে।

আপনি অত্যন্ত সাধারণ। এইসব মৃত্যুর সাথে আপনার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই।

ক্যাথেরিন ভাবতে থাকে। কথাটা সে বিশ্বাস করবে কী? এই লোকগুলো কেন মারা গেছে? তাদের কাজের জন্য। আমার জন্য নয়! কিন্তু কির্ক? এটা তো একটা দুর্ভাগ্যজনক অ্যাকসিডেন্ট। তাই নয় কি?

.

অ্যালান হ্যামিল্টন তখনও শান্তভাবে তার রোগিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ক্যাথেরিনের মুখ থমথম করছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ক্যাথেরিন চিন্তার জগতে হারিয়ে গেছে। ক্যাথেরিন ভাবছে, ডাক্তার মানুষটি ভারি চমৎকার। আর একটা বোধ তার মনের ভেতর জন্ম নিচ্ছে। আহা, এর সাথে আগে দেখা হল না কেন? অ্যালানের বউয়ের ছবি, ছেলেমেয়েরা–কফি টেবিলের ওপর বসানো আছে।

ধন্যবাদ, ক্যাথেরিন বলল, ব্যাপারটা আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আজ অথবা আগামীকাল, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

অ্যালান হ্যামিল্টন হেসে উঠলেন–আপনি আবার কবে আসবেন?

-কেন?

মাঝে মধ্যে আপনাকে আসতেই হবে। আমার চিকিৎসার এটা হল একটা পদ্ধতি।

ক্যাথেরিন ইতস্তত করে বলে উঠল–সময় হলেই আবার আসব অ্যালান।

ক্যাথেরিন চলে গেছে। অ্যালান হ্যামিল্টন কিছু একটা ভাববার চেষ্টা করলেন।

এর আগে তিনি অনেক সুন্দরী মহিলার সেবা করেছেন। অবশ্য সেবা নয়, পরিষেবা। অনেক দিন ধরেই তিনি ডাক্তারি বিদ্যার সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ তার প্রতি যৌন ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারি ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল। তিনি একজন মনোবিশারদ। তার আবেগকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখেন। পেশেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখলে চিকিৎসার ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। তবে ভালো সম্পর্ক তো রাখতেই হবে। তা না হলে এই কাজে তিনি সফলতা পাবেন না।

অ্যালান হ্যামিল্টন এক সুন্দর পটভূমিকার মানুষ। তার বাবা ছিলেন সার্জেন। একজন নার্সকে বিয়ে করেছিলেন। অ্যালানের ঠাকুরদা ছিলেন এক বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট। ছোটোবেলা থেকেই অ্যালান চোখের সামনে চিকিৎসা বিদ্যার নানা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। তখন থেকেই অ্যালানের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, বড়ো হয়ে তিনি একজন ডাক্তার হবেন। বাবার মতো একজন সার্জেন। কিংস কলেজের মেডিকেল স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছেন। স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর সার্জারি নিয়ে বিশেষ পাঠ নিয়েছেন।

এই ব্যাপারটির প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর তৃতীয় রাইচ পোল্যান্ডের সীমান্ত ঘেঁষে প্রবেশ করে। দুদিন বাদে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয়েছিল।

–তখনই অ্যালান হ্যামিল্টন সার্জেন হিসেবে তার নাম লিখিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ২২শে জুন, অক্ষশক্তি পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে দখল করে নিয়েছে। ফ্রান্সেরও পতন ঘটেছে। যুদ্ধের আগুন পৌঁছে গেছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে।

প্রথমদিকে কয়েকশো বিমান ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন শহরের ওপর ধারাবাহিক বোমাবর্ষণ করেছে। পরে বিমানের সংখ্যা বাড়িয়ে দুশো করা হয়েছে। তারপর এক হাজার। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করা যায় না। চারপাশে রক্তাক্ত মানুষের কাতরানি। মানুষ মরছে, দেখার কেউ নেই। একটির পর একটি শহরে আগুন ধরে যাচ্ছে। হিটলার ব্রিটিশ শক্তিকে বুঝতে পারেনি। এই আক্রমণ ব্রিটেনের দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা শান্তি এবং স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছে।

শুরু হয়েছে প্রতি-আক্রমণ, দিনেরাতে যুদ্ধ। অ্যালান হ্যামিল্টন সারারাত জেগে আছেন। ষাট ঘণ্টা তাকে কাজ করতে হয়েছে। এমারজেন্সি হাসপাতালে তাকে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। তিনি তার পেশেন্টদের নিয়ে ওয়ারহাউসে চলে গেছেন। অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন। খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন।

অক্টোবর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ চলেছে। ঘনঘন সাইরেন বেজে উঠছে। লোকেরা শেলটারের তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। অ্যালান তখনও ব্যস্ত আছেন তাঁর কাজে। তিনি বুঝি কখনও রোগীদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একজন ডাক্তার বললেন–অ্যালান এখানে থেকো না, তোমাকে মরতে হবে। এখুনি চলে এসো।

–এক মিনিট...

অ্যালান তখনও মন দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করছেন, আহা, এরা কত অসহায়।

–অ্যালান?

অ্যালান বেরিয়ে যেতে পারেননি। তিনি জানতেন না, তার পরেই কী হবে। পাশেই একটা বোমা পড়ল। সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল। ঘরে ঘরে আগুন ধরে গেছে।

কোমাতে ছিলেন ছ দিন, কেউ ভাবেননি অ্যালান বেঁচে উঠবেন।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠলেন। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। ডান হাতের হাড়গুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সেগুলোকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল। দেখা গেল, অ্যালান আর কোনোদিন অপারেশন করতে পারবেন না।

এক বছর সময় লেগেছিল অন্ধকার থেকে আলোর জগতে ফিরে আসতে। ততদিনে ভবিষ্যৎটা একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। একজন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে তাকে থাকতে হয়েছিল। প্রথম দিকে অ্যালান কিছুই বলতে পারতেন না।

অ্যালানকে বলা হয়েছিল বন্ধু, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। অতীতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কী লাভ? ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকুন।

এখন আমি কী করব? অ্যালান জানতে চেয়েছিলেন।

–আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিমান পেশাদার মানুষ, অন্য ভাবে জীবনটা শুরু করতে হবে।

–আপনার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না।

–আপনি তো মানুষের যন্ত্রণার উপশম ঘটাতেন, কী আমি ঠিক বলেছি? এবার আপনাকে কাজের ধারাটা একটু পালটাতে হবে। এখন আর শরীরের পরিচর্য্যা নয়, মন নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, একজন ভালো মনোবিশারদ হবার সবরকম গুণ আপনার মধ্যে মজুত আছে। আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। লোকের প্রতি সহানুভূতিও পোষণ করেন। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।

এমন ভাবে জীবনের গতিবিধি বদলানো যায় কী? শেষ পর্যন্ত অ্যালান তাই করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং দেখলেন, এইসব মানুষদের সেবা করার মধ্যে একটা আলাদা তৃপ্তি আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ নানা কারণে হঠাৎ মানসিক রোগী হয়ে ওঠে। অ্যালান তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সমবেদনার বাণী। এভাবেই এতদিন কেটে গেল। আজ ক্যাথেরিনকে দেখার পর অ্যালানের মনে অন্য ভাবনার অনুরণন। তিনি বুঝতে পারছেন, বেচারি ক্যাথেরিনের দুঃখযন্ত্রণার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। অ্যালানের কেবলই মনে হচ্ছে, যাই ঘটুক না কেন, এই মেয়েটিকে আমি সারিয়ে তুলবই। তাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

অ্যালান হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথা বলে ক্যাথেরিন তার অফিসে ফিরে এসেছে। উইমের সঙ্গে দেখা করতে গেল সে।

–আজ আমি ডাঃ হ্যামিল্টনের কাছে গিয়েছিলাম। ক্যাথেরিন বলল।

–সত্যি? ভদ্রলোক দারুণ মিশুকে। ওঁনার কাছে গেলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। উনি বলেছেন, দম্পতিদের মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ১ শতাংশ। ডিভোর্সের ঘটনা ৭৩ শতাংশ। পারস্পরিক বিচ্ছেদের ঘটনা ৬৫ শতাংশ। গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা ৬৩ শতাংশ। কাছাকাছি পারিবারিক বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনাও ৬৩ শতাংশ। ব্যক্তিগত আঘাতের ঘটনা ৫৩ শতাংশ।

গড় গড় করে উইম বলে চলেছেন। ক্যাথেরিন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আহা, \ এই মানুষটির মন বোধহয় পালটানো যাবে না।

শেষ পর্যন্ত ক্যাথেরিন ভাবল, অবাক লাগছে। এখনও কেন অ্যালানের কথাই মনে পড়ছে আমার!

.

২০.

–এথেন্স তুমি আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছ। তুমি একবারও সফল হওনি। আমি বলছি, আরও একটা ভালো প্ল্যানের কথা চিন্তা করো। তাহলেও তুমি সফল হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে এবং তোমার বোনকে আমি শেষ করব।–

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মুখ থেকে ছিটকে আসা এই শব্দগুলো এখনও লামব্রোর কানের কাছে বেজে চলেছে। লামব্রোর মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, ডেমিরিস তার কথা

রাখবে। ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করেছে সে। কিন্তু রিজোলির ব্যাপারটা কী হল? সমস্ত কিছু এত সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিনি নিজেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন। বুঝতে পারছেন না, কী হয়েছে? কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? সবার আগে প্রধান কাজ এখন বোনকে সাবধান করতে হবে।

লামব্রোর সেক্রেটারি অফিসে এসে গেছে–সে বলল স্যার, দশটা বেজেছে, যার সঙ্গে আপনার কথা বলার ব্যাপার ছিল তিনি এসে গেছেন। আমি কি তাকে পাঠাব?

না, আজ আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দাও। আজ আমি একান্ত নিজের মতো দিনটা কাটাতে চাই।

উনি টেলিফোন তুলে নিলেন। পাঁচ মিনিট বাদে মেলিনার সাথে দেখা করতে চলে গেলেন।

***

ভিলার গার্ডেনে মেলিনা দাদার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

স্পাইরস, তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? কী ঘটেছে ঠিক করে বল।

–শোন্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আঙুরলতায় আচ্ছাদিত একটা ছোট্ট কুটির, সেখানে সুন্দর বেঞ্চ। স্পাইরস বসলেন। বোনের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আহা, আমার বোনটি কত লাবণ্যবতী! সে কেন জীবনে শান্তি পেল না? সে তো একটু সুখ পেতে পারত।

-দাদা, ঠিক করে বলোতো, কী হয়েছে?

লামব্রো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যাপারটা শুনতে তোর মোটেই ভালো লাগবে না।

-কেন? কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে?

–আমি বলতে চাইছি....তুই আর মোটেই নিরাপদ নয়। তোর জীবন এখন সংশয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

-কী বলছ? ধ্যুৎ, আমি বিশ্বাস করি না। আমার জীবন সংশয়? কে কীভাবে কেন আমাকে আক্রমণ করবে?

লামব্রো শান্তভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন আমার মনে হচ্ছে কোস্টা তোকে বাঁচিয়ে রাখবে না। সে তোকে মেরে ফেলবে।

মেলিনা ফ্যালফ্যাল করে দাদার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন–তুমি কি আমার সঙ্গে মজা করছ?

না, মেলিনা, মজা করার জন্য আমি তোর এখানে ছুটে আসিনি। আমার সমস্ত কাজ আজ বাতিল করেছি।

-সত্যি? কোস্টা এত নির্মম! না, তার গুণের শেষ নেই আমি জানি। কিন্তু সে হত্যাকারী! না, ব্যাপারটা ভাবতে হবে।

–তুই জানিস না, এর আগে কোস্টা অনেককে মেরে ফেলেছে।

মেলিনার মুখ সাদা হয়ে গেছে। উত্তেজনা এবং ভয়ে।

–তুমি কী বলছ?

–হ্যাঁ, নিজের হাতে সে এই কাজটা করে না। ভাড়া করা গুণ্ডা লাগিয়ে দেয়। অপরাধের কোনো চিহ্ন থাকে না।

না-না, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না।

ক্যাথেরিন ডগলাসকে মনে আছে?

–হ্যাঁ, যে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছিল?

–না, সে মারা যায়নি। সে এখনও বেঁচে আছে।

মেলিনা মাথা ঝাঁকালেন–সে কী? এটা হতেই পারে না। যে দুজন ওকে মেরেছিলেন, তাদের তো ফাঁসি হয়ে গেছে।

ল্যামব্রো বোনের হাতে হাত রাখলেন মেলিনা, ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েলে পেজ কিন্তু ক্যাথেরিনকে মেরে ফেলেনি। এই ব্যাপারটা সাজানো। এমনকি বিচারের ব্যাপারটাও। ডেমিরিস ওই মেয়েটিকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল।

এসব কথা শুনে মেলিনা যেন এক পাষাণ প্রতিমা। অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। মেয়েটির কথা মনে পড়ল। একবার তার সাথে দেখা হয়েছিল।

আর হলেতে যে মেয়েটি? সে নিশ্চয়ই ক্যাথেরিন। সব কিছু মনে পড়ে গেল। শীতল একটা স্রোত। ডেমিরিস বলেছিল, সে আমার এক সহকর্মীর পরিচিতা। মিথ্যে কথা। লন্ডনে আমার অফিসে কাজ করে। এটাও সাজানো মিথ্যে।

আমি একঝলক তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। অতীত স্মৃতির বিচ্ছুরণ। বুঝতে পেরেছিলাম, এই মেয়েটি ছিল ওই পাইলটের স্ত্রী। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হবে। তাকে তো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তারা এই কাজটা ভালাোভাবেই করেছে। এই কাজটির জন্য তাদের ফাঁসি হয়েছে।

মেলিনা হারানো স্মৃতি ফিরে পেলেন।

–আমি এই বাড়িতে মেয়েটিকে দেখেছি। হ্যাঁ, কোস্টা ওর সম্পর্কে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল।

–এখনও সময় আছে বোন, তোর স্বামী একটা বদ্ধ পাগল। তুই এখান থেকে পালিয়ে যা।

মেলিনা দাদার দিকে তাকাল না, এটা আমার বাড়ি।

-মেলিনা, তোর কিছু হয়ে গেলে আমার কী হবে বল তো? সমস্ত পৃথিবীটা আমার কাছে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে।

কণ্ঠস্বরের মধ্যে ইস্পাত কাঠিন্য এনে মেলিনা, বললেন–ভয় পেও না, কিছুই হবে না। কোস্টা অত বোকা নয়। সে জানে, যদি আমার কোনো ক্ষতি করে, তাহলে তুমি তাকে ছেড়ে দেবে না। এই পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকেই সে বোধহয় একটু ভয় করে।

ও তোর স্বামী, তুই ওর আসল স্বভাবটা জানিস না। তোর জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে রে।

–স্পাইরস, এত ভেবো না, আমার ব্যাপারটা আমি সামলাতে পারব।

স্পাইরস চিন্তিত মনে বোনের মুখের দিকে তাকালেন। না, কিছুতেই বোনের মন পরিবর্তন করা সম্ভব হল না।

–যখন একান্তই বাড়ি ছেড়ে যাবি না, একটা কথা দে, তুই কখনও ওর সঙ্গে একা কোথাও যাবি না। সেটা ব?

ভাইয়ের হাতে হাত রেখে মেলিনা বললেন ঠিক আছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

মেলিনা কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাটা রাখার জন্য মোটেই তৎপর ছিলেন না। আসলে স্বামীর ওপর তখনও তার অগাধ ভালবাসা এবং স্থির বিশ্বাস।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বাড়িতে এলেন। সন্ধ্যা হয়েছে। মেলিনা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা বেডরুমের দিকে হেঁটে গেলেন।

–তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, আমি মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

ডেমিরিস তার ঘড়ির দিকে তাকালেন মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে। দরকারি এনগেজমেন্ট আছে। এখুনি বেরোতে হবে।

-সত্যি! আজ রাতে তুমি কি কাউকে হত্যা করতে চলেছ?

এই কথা শুনে ডেমিরিস স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন।

–তুমি কী বলতে চাইছ, পরিষ্কার করে বলো তো?

–স্পাইরস আজ সকালে এসেছিল। আমাকে সব কিছু জানিয়েছে।

–ভবিষ্যতে ওই কুকুরটা যেন এই বাড়িতে কখনও না আসে। এটাই আমার শেষ কথা।

–এটা আমারও বাড়ি, মেলিনা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলে উঠলেন, আমরা অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম।

–কী বিষয়ে?

–তোমার বিষয়ে, ক্যাথেরিন ডগলাস এবং নোয়েলে পেজের ব্যাপারে।

এবার ডেমিরিসের পুরো মনোযোগ পড়ল স্ত্রীর ওপরে-সেটা তো একটা পুরোনো

তাই কী? স্পাইরস জানে, তুমি দুজন নিরাপরাধ মানুষকে ফাঁসির মঞ্চে চড়িয়ে দিয়েছ। কোস্টা, ব্যাপারটা কি সত্যি?

স্পাইরস একটা বোকা হাঁদারাম।

–আমি মেয়েটিকে এই বাড়িতে দেখেছি। হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না।

-তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি ভবিষ্যতে মেয়েটিকে আর কখনও দেখতে পাবে না। আমি কাউকে পাঠিয়েছি, মেয়েটিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

মেলিনার মনে পড়ে গেল, সেই তিনজন মানুষের কথা, যাঁরা ডিনার খাবার জন্য এই বাড়িতে এসেছিলেন। বলা হয়েছিল, তারা পরদিন সকালে লন্ডনের দিকে উড়ে যাবেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওদের মধ্যে একজন হত্যাকারী লুকিয়ে আছেন।

ডেমিরিস মেলিনার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। শান্তভাবে বললেন–তুমি তো জানো, একদিন তোমাকে এবং তোমার ভাইকেও ছাড়ব না।

তিনি মেলিনার হাতে মোচড় দিলেন।

-স্পাইরস, আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। তখনই তাকে মেরে ফেলতাম। কিন্তু কেন বলো তো? আরও কিছু দিন তাকে আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করাব। তারপর...।

–আঃ, ছাড়ো! কী, হচ্ছে কী?

–আমার প্রিয় স্ত্রী, তুমি এখনও সেই যন্ত্রণাটা পাওনি। একদিন নিশ্চয়ই পাবে।

ডেমিরিস হাত ছেড়ে দিলেন।

–আমি ডিভোর্স চাইছি। আমি একজন সত্যিকারের ভালোবাসার নারীকে গ্রহণ করব। তার আগে তোমার জীবনটা আমি নরক করে ছেড়ে দেব। তোমার জন্য বহু সুন্দর প্রকল্পনা আছে আমার হাতে। তোমার ভাইয়ের জন্যও। তার আগে এসো, শান্তভাবে কিছু কথা বলা যাক। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে? না, তা হলে হয়তো আমি ভেবে দেখতে পারি। তোমাকে আর কতদিন অপেক্ষাতে রাখব? তোমাকে নয়, আমি সেই অন্য মেয়েটির কথা বলছি।

ডেসিংরুমের দিকে তিনি হেঁটে গেলেন। মেলিনা সেখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। স্পাইরস ঠিক কথাই বলেছে। এই মানুষটিকে একটা উন্মাদ বলা যেতে পারে।

নিজেকে একেবারে অসহায় বলে মনে হল। কিন্তু, নিজের জীবন সম্পর্কে এত চিন্তা করে কী লাভ? বেঁচে থেকেই বা কী হবে? মেলিনা চিন্তা করলেন। তাঁর স্বামী তার সমস্ত

সম্মান কেড়ে নিয়েছেন। তাকে রাস্তার মেয়েতে পরিণত করেছেন। অনেক কথা মনে পড়ে গেল। জীবনের আর কী রইল? বন্ধু বান্ধবরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বেশ বুঝতে পারছি, ও আর আমার প্রতি এতটুকু চিন্তিত নয়। আমি তো মরতেই চাইছি, কিন্তু কীভাবে? না, আমি মরে গেলে স্পাইরসের কী হবে? স্পাইরসের জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে। স্পাইরস আমাকে খুবই ভালোবাসে।

মেলিনা জানেন, দাদা তার খুবই শক্তিশালী। কিন্তু স্বামীর শক্তি আরও বেশি। যে করেই হোক, স্বামীর সামনে বাধার প্রাচীর তুলতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর মেলিনার জানা নেই।

প্রতিনিধি দল

২১.

এথেন্স থেকে যে প্রতিনিধি দল এসেছেন, তাঁদের নিয়ে ক্যাথেরিনের দিন কাটছে। একটির পর একটি মিটিং-এর বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে। অন্যান্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা আসছেন। পারস্পরিক মত বিনিময় হচ্ছে। ক্যাথেরিনের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি দেখে ওঁরা খুবই খুশি হয়েছেন। কাজের প্রতিটি ধারা সম্পর্কে ক্যাথেরিন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এই ব্যাপারটা ওঁদের আনন্দ দিয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি দিন কেটে যাচ্ছে কর্মব্যস্ততার মধ্যে। নিজের জন্য এতটুকু সময় রাখতে পারছে না ক্যাথেরিন। রেখেই বা কী হবে?

***

জেরি হ্যালিসম্পর্কে অনেক কথা জেনে ফেলেছে ক্যাথেরিন। তার বাবা ছিলেন অত্যন্ত বড়োলোক। তেলের ব্যবসা করতেন। ঠাকুরদা ছিলেন সম্মানীয় বিচারক। জেরি হ্যালির বয়স যখন একুশ, তাঁকে অটো চুরি করার জন্য তিন বছরের জেল খাটতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আরও কতগুলো অভিযোগ আনা হয়। তিনি নাকি একটা ধর্ষণ কাজে লিপ্ত ছিলেন। শেষ অব্দি পরিবারের সকলে মিলে যুক্তি পরামর্শ করে তাকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

জেরি ক্যাথেরিনকে বলেছিলেন আমি নিজেই নিজেকে নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি কিনা জানি না, তবে ইউরোপে গিয়ে জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিলাম।

***

রেনার্ডকে এক তেতো স্বভাবের মানুষ বলে মনে হল। ক্যাথেরিন তার বাবা-মা সম্পর্কেও অনেক কথা জানতে পেরেছে। জানতে পেরেছে, ভিচির কাছাকাছি একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন।

এই জীবনটা রেনার্ডের ভালো লাগেনি। পনেরো বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। প্যারিসের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে থাকেন।

***

এবার ডিনো মাভুসির কথা বলা যাক। ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয় সবসময় আনন্দে ভরপুর। জন্ম হয়েছিল তাঁর সিসিলিতে। মধ্যবিত্ত পরিবারে।

–যখন আমার ষোলো বছর বয়স, তখন আমার থেকে দশ বছরের বড়ো এক বিবাহিতা মহিলার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। আহা, সেই মহিলার কথা মনে হলে এখনও আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

কী হয়েছিল? ক্যাথেরিন চোখ বড়ো বড়ো করে জানতে চেয়েছিল।

ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস–ওরা জোর করে আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। রোমে পাঠিয়ে দেয়। আসলে ওই মহিলার স্বামী ছিলেন খুবই ক্ষমতাবান মানুষ। অঢেল টাকার অধিকারী। পরিবারের লোকজনেরা চায়নি, আমি তার রোষানলে জ্বলেপুড়ে মরে যাই।

ক্যাথেরিন হেসে ওঠে দেখছি, তারপরেই আপনি ডেমিরিসের সংস্পর্শে এলেন, তাই তো?

-হ্যাঁ, পরবর্তীকালে। আপনি তো জানেন না আমার অতীতের কথা। এখানে সেখানে কত কী করেছি, জীবিকার জন্য!

-তারপর? আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল?

ক্যাথেরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ডিনো বললেন না, আমার স্ত্রী কিন্তু এখানে নেই।

ডিনো ভালোভাবে ক্যাথেরিনকে অবলোকন করলেন। তার সঙ্গে কথা বললেন। আহা, মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি সুরেলা। ক্যাথেরিনের গা থেকে উঠে আসা প্রসাধনের গন্ধ, তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ক্যাথেরিন সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে। ক্যাথেরিনের প্রতিটি পদক্ষেপ ভালো লাগছে। চোখ বন্ধ করলেন ডিনো, নগ্ন ক্যাথেরিনকে দেখতে কেমন লাগবে, মনে মনে ভেবে নিলেন। খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি এই স্বপ্নটা সফল করতে হবে। ডিনো আবার কোনো ব্যাপারে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন না।

জেরি হ্যালিক্যাথেরিনের অফিসে পৌঁছে গেছেন ক্যাথেরিন? আপনি কি থিয়েটারে যাবেন?

-কেন?

–একটা নতুন থিয়েটার প্রদর্শিত হচ্ছে ফিনিয়ানস রেইনবো। আমি আজ রাতে এটা দেখতে চাইছি।

–আপনার জন্য একটি টিকিটের ব্যবস্থা করব কী?

–একা গেলে ভালো লাগবে না, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কী? আপনি কি ফাঁকা আছেন?

এক মুহূর্তের চিন্তা হা। হাতে হাত। ছোট্ট একটি হাতের সাথে বিরাট করতলের ঘর্ষণ।

–ঠিক আছে, সাতটার সময় হোটেল থেকে আমাকে তুলে নেবেন কিন্তু।

নির্দেশ ঝরছে। উনি বেরিয়ে গেলেন। পেছন ফিরে তাকালেন না।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। ক্যাথেরিন ভাবল। ভদ্রলোক কি বন্ধু হতে চাইছেন? কিন্তু কেন? আমি কেন রাজি হলাম, ক্যাথেরিন ভাবতে থাকে। ওই মস্ত বড়ো হাতটার ছবি তখনও তার মনে ভেসে চলেছে।

জেরি হ্যালি হোটেল স্যাভয়ের লবিতে অপেক্ষা করছেন, ক্যাথেরিনের জন্য। একটু বাদে তারা কোম্পানির লিমুজিনে চড়ে বসলেন।

লন্ডন শহরটা ভারি সুন্দর! জেরি হ্যালিবললেন, আমি বারবার এই শহরে আসতে চাই। আপনি কি এখানে অনেক দিন আছেন?

–মাত্র কয়েক মাস।

–আপনি কোন্ রাষ্ট্র থেকে এসেছেন?

–চিকাগো থেকে।

–সেটাও তো ভারি সুন্দর শহর! আমি কয়েকবার সেখানে গেছি। কিন্তু কেন? কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করতে? ক্যাথেরিনের হঠাৎ মনে হল। কেন? তা সে জানে না।

***

তারা থিয়েটারে এসে পৌঁছোল। জনারণ্যে মিশে গেল। আহা, অসাধারণ উপস্থাপনা। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই নামকরা কিন্তু ক্যাথেরিনের মনে হল, সে যেন কোনো অজ্ঞাত কারণে নাটকটা দেখতে পাচ্ছে না। জেরি হ্যালিতার হাতে হাত রেখেছেন। মাঝে মধ্যে কোলে হাঁটুতে হাত রাখার চেষ্টা করছেন। বরফের মতো ঠান্ডা বিশাল হাত, তার হাতের ওপর পাথরের মতো ভারি হয়ে চেপে বসেছে।

***

নাটক শেষ হয়ে গেছে। হ্যালিক্যাথেরিনের দিকে তাকালেন। বললেন–এই,শুভ। সন্ধ্যাটা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। চলুন আমরা হাঁটতে হাঁটতে হাইড পার্কে চলে যাই।

কাল ভোরবেলা অফিসে যেতে হবে, আরও অনেক কাজ আছে।

ক্যাথেরিন বাধা দেবার চেষ্টা করল।

হ্যালিক্যাথেরিনের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন তাতে কী হয়েছে? অনেক সময় আছে। এত চিন্তা করে কী হবে?

***

রেনার্ড ভালোবাসেন জাদুঘরে ঘুরে বেড়াতে।

একদিন ওই ফরাসি ভদ্রলোক ক্যাথেরিনকে বলেছিলেন–প্যারিসে এমন একটা মিউজিয়াম আছে, দেখলে তাক লেগে যাবে। লভরের নাম শুনেছেন আপনি? গেছেন কখনও?

ক্যাথেরিন মাথা নেড়েছে না, আমি এখনও পর্যন্ত প্যারিসে যাইনি।

–হায়, আপনার জন্য আমার খারাপ লাগছে। একদিন প্যারিসে অবশ্যই আসবেন। ভদ্রলোক মনে মনে ভাবলেন, আমি জানি, এই মহিলাটি আর কখনও প্যারিসে আসতে পারবেন না।

তারপর তিনি বললেন লন্ডন শহরের মিউজিয়ামগুলোতে একবার ঢু মারতে হবে। শনিবার দিনটা আমার জন্য রাখবেন কী? আমি সেখানে যেতে চাই।

ক্যাথেরিন অন্য কিছু করার কথা ভেবেছিল। শনিবার তার অনেক কাজ থাকে। কিন্তু কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের আদেশ তো মানতেই হবে। ডেমিরিস বারবার বলে দিয়েছেন, অতিথিদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

–ঠিক আছে, ক্যাথেরিন বলল, শনিবার দিনটাই ঠিক হল তাহলে।

ক্যাথেরিন একটা দিন ওই ফরাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে কাটাবে। লোকটার স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো নয়। তিনি এমন আচরণ করতে চান, মনে হয় তিনি যেন স্বয়ং হিটলার! কী আর করা যাবে, ওপরওয়ালার নির্দেশ, সব কিছু তো মুখ বুজে পালন করতেই হবে।

***

দিনটা শুরু হয়েছে সুন্দরভাবে। তারা প্রথমে গেল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। কত সুন্দর জিনিস সাজানো আছে গ্যালারিতে। কাচের আধারে বন্দি। আহা, অতীতের ইতিহাস বুঝি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ম্যাগনা কার্টার-এর একটা কপি দেখা গেল, ১২১৫ সালে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল।

রেনার্ড সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক কথা ক্যাথেরিন জেনে ফেলেছে। লোকটার সাহচর্য মোটেই ভালো লাগছে না তার। মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াবার পর ক্যাথেরিন এই সরল সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল।

অ্যাডমিরাল নেলসনের হাতে লেখা একটি নথি–ঐতিহাসিক বললেও কম বলা হবে।

আমার মনে হয় এটাই মিউজিয়ামের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য। ক্যাথেরিন বলল। অ্যাডমিরাল নেলসন যুদ্ধে যাবার আগে এই নথিতে সই করেছিলেন। তিনি কি তার ভাগ্যের কথা জানতেন?

রেনার্ড এই সব আলোচনায় মোটেই আগ্রহী নন। তার উদাসীনতা ধরা পড়েছে তার মুখমণ্ডলে। আর একটা ব্যাপার ক্যাথেরিনের মনে হল, মিউজিয়ামে যেসব জিনিস সাজানো আছে, সেদিকে রেনার্ডের দৃষ্টি নেই। তিনি বোধহয় অন্য কিছু ভাবছেন। তাহলে কেন? কেন উনি জাদুঘর পরিদর্শনে এলেন? এর অন্তরালে অন্য কোনো মতলব আছে কী?

***

সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম। একই রকম অভিজ্ঞতা। ক্যাথেরিন ভালো ভাবে এই অতিথিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। রেনার্ড একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছেন। কোনো কিছুই দেখছেন না। মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। কিন্তু কোথায়? ক্যাথেরিন । কি তার খবর রাখে?

মিউজিয়াম ঘোরা শেষ হয়ে গেল। ক্যাথেরিন জানতে চাইল–আপনি কি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে যাবেন

... রেনার্ড মাথা নাড়লেন–হ্যাঁ, অবশ্যই যাব।

বিশাল অ্যাবের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিখ্যাত মানুষদের স্মৃতিচিহ্ন। স্মারক সৌধ। মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছেন তারা। আহা, কত কবি আর রাজনীতিবিদ। রাজা-মহারাজা।

ক্যাথেরিন বলল দেখুন। এটা হল রবার্ট ব্রাউনিং-এর সমাধি।

রেনার্ড তাকালেন- ওঃ, ব্রাউনিং। তিনি এগিয়ে চললেন।

ক্যাথেরিন ভাবতে থাকে–ভদ্রলোক কিছু খুঁজছেন। কিন্তু কী? গোটা দিনটা এভাবে নষ্ট করার কোনো মানে হয়।

***

তারা হোটেলে ফিরে এসেছে।

রেনার্ড বললেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস আলেকজান্ডার। আপনার সাহচর্য আমার ভালো লেগেছে।

ক্যাথেরিন ভাবল, ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু, কেন?

–আমি একটা জায়গার নাম শুনেছি, স্টোনহেঞ্জ। এটা স্যালিসবারি প্লেইন-এ, তাই তো?

–হ্যাঁ। ক্যাথেরিন বলল।

–আমরা সেখানে কেন গেলাম না? আসছে সপ্তাহে কি যাওয়া যাবে? ধরুন আগামী শনিবার।

ক্যাথেরিন ভাবতে পারছে না, স্টোনহেঞ্জে গিয়ে কী হবে? এখানে দেখার মতো আরও সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে।

তবু মনের বিস্ময় মনে চেপে রেখে সে বলতে বাধ্য হল- ঠিক আছে, তাই হবে।

***

ডিনো মাত্তুসিকে কি এই দলভুক্ত করা যায়? মাঝে মধ্যে তিনি হাতে একটা গাইডবুক নিয়ে ক্যাথেরিনের অফিসে প্রবেশ করেন।

তিনি বলেছেন ক্যাথেরিন, এই হল লন্ডন শহরের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট। আমি ইতিমধ্যে একটা তালিকা বানিয়ে ফেলেছি। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন তো? :

–কেন? আমাকে কেন?

–আজ রাতে আমি আর আপনি কনটে খেতে যাব।

ক্যাথেরিন বলল–আজকে? আমার কিছু...।

-কোনো ওজর আমি শুনব না, ঠিক আটটার সময় আপনাকে তুলে নেব, কেমন?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ক্যাথেরিন আমতা আমতা করে বলল ঠিক আছে।

ডিনো বললেন আপনার সঙ্গে না খেলে মজাটা উপভোগ করব কী করে?

তাঁর কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট আভাস। উনি কী চাইছেন? ক্যাথেরিন ভাবল। তবে, মনে হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে ডিনোর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। লোকটি চমৎকার, অন্তত বন্ধু হিসেবে।

***

কনটের খাবারগুলো সত্যি অসাধারণ! তারা প্রথমে স্কটিশ স্যালমন খেল। তারপর রোস্ট, বীফ, ইয়র্কশায়ারের পুডিং।

স্যালাড খাবার সময় ডিনো মন্তব্য করলেন–অপূর্ব! ক্যাথেরিন, আপনাকে আমার মনে ধরেছে। আসলে মার্কিন দেশের মহিলাদের মধ্যে একটা আলাদা চটক আছে।

–মশাই, আপনার স্ত্রী কি মার্কিনদেশীয়?

ক্যাথেরিন টিপ্পনি কাটল।

ডিনো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন না, ও ইতালি দেশের মেয়ে। আমার সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া আছে ওর।

–তাহলে জীবনটা তো ভালোই কাটছে। ক্যাথেরিনের পরবর্তী মন্তব্য।

ডিনোর মুখে হাসি বিষণ্ণতা–হ্যাঁ, কেটে যাচ্ছে কোনোরকমে।

ডিনো ডিজার্ট নিয়েছেন। বললেন আপনি এই দেশটাকে ভালোবাসেন? আমার এক বন্ধুর গাড়ি আছে। চলুন না, শনিবার কোথাও বেড়িয়ে আসি।

ক্যাথেরিন না বলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু উইমের কথা মনে পড়ে গেল। আহা, ভদ্রলোক বড়ো একা। একবার ওঁকে নিয়ে বেরোলে কেমন হয়?

–ভালোই লাগবে। ঠিক আছে।

–আমি আপনাকে কিছু স্মরণযোগ্য মুহূর্ত উপহার দেব।

উইমকে সঙ্গে নেব?

–না-না, এটা একটা ছোট্ট গাড়ি। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।

***

এথেন্সের প্রতিনিধিরা আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছেন। বেচারি ক্যাথেরিন, নিজের মতো সময় একটুও হাতে নেই তার। হ্যালি, রেনার্ড আর মাসি তার অবসরের মুহূর্তগুলো কেড়ে নিচ্ছেন। উইম ভ্যানডেনের সঙ্গেও একটির পর একটি মিটিং-এ যোগ দিতে হচ্ছে। ক্যাথেরিনের দিনগুলো তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছে।

ক্যালকুলেটর ছাড়া ওই ভদ্রলোক এত বড়ো বড়ো যোগবিয়োগ করেন? হ্যালিঅবাক হয়ে গেছেন।

–আপনি ঠিকই বলেছেন।

–আমি ওঁনার মতো আর কাউকে কখনও দেখিনি!

আটানস সম্পর্কে ক্যাথেরিনের মনোভাব অনেক পালটে গেছে। ছেলেটা সত্যি খাটতে পারে। ক্যাথেরিন যখন সকালে অফিসে আসে, তখন তাকে দেখতে পায়। তার সব কাজ ছেলেটি হাতে হাতে করে দেয়। সবসময় মুখে হাসি লেগে আছে। কাজ করার জন্য উদগ্রীব। এই ছেলেটাকে দেখলে ক্যাথেরিন একটা ছোট্ট কুকুরছানার কথা ভাবে। ক্যাথেরিন অ্যালান হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথা বলেছে, আটানস সম্পর্কে। ছেলেটার মনের ভেতর আত্মবিশ্বাস আনতে হবে। অ্যালান এব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

একদিন ইভলিন জানতে চাইলেন–তুমি কি বুঝতে পারো, ওই ছেলেটি তোমাকে কত ভালোবাসে?

–আপনি কী বলছেন!

–আটানস। ওর চোখের ভাব দেখে কিছু বুঝতে পারো না? ও তোমাকে কীভাবে অনুসরণ করে?

ক্যাথেরিন হেসেছে–আপনি বড় কল্পনা করছেন।

একদিন ক্যাথেরিন আটানসকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানালো।

রেস্টুরেন্টে?

ক্যাথেরিন হেসে বলেছিল কেন তোমার আপত্তি আছে?

ওর মুখে লজ্জার লাল আলো–আমি জানি না কোথায় যাব। এমন পোশাক পরে যাব কি? আপনার পাশে আমাকে এই অবস্থায় দেখে লোকেরা হাসাহাসি করবে।

আমি কোনো মানুষকে তার পোশাক দিয়ে বিচার করি না। ক্যাথেরিন বলেছিল। আমি আগে থেকে বলে রাখব। জায়গা রিজার্ভ করা থাকবে কিন্তু।

সে আটানসকে নিয়ে লায়ন্স কর্নার হাউসে গেল। আটানস জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। বোঝা যাচ্ছিল, চারপাশের লোকজন দেখে ভয় পেয়ে গেছে সে।

সে বলেছিল জীবনে আমি কখনও এমন জায়গায় আসতে পারব ভাবতে পারিনি। জায়গাটা সত্যি সুন্দর।

ক্যাথেরিন হেসেছে। বলেছে–তুমি কী খাবে মুখ ফুটে বলো। তুমি যা খেতে চাইবে, তোমাকে আমি তাই খাওয়াব।

ছেলেটি মেনুকার্ডের দিকে চোখ বুলিয়েছে। মাথা নেড়েছে। বলেছে–সব কিছু খুব দামি।

ক্যাথেরিনের মুখে আবার অমায়িক হাসি।

–আজ দাম নিয়ে চিন্তা করবে না। আমরা এমন একটা জায়গাতে কাজ করি, যার মালিক পৃথিবীর অন্যতম বড়োলোক। মনে হয় এভাবে লাঞ্চ খেলে উনি কিছু মনে করবেন না।

ক্যাথেরিন কিন্তু বলেনি, লাঞ্চের সব খরচ সে তার নিজের পকেট থেকে দেবে।

আটানস শ্রিম্প ককটেল বলেছিল, সঙ্গে স্যালাড, রোস্ট চিকেন, আর আলু ভাজা। চকোলেট কেক দিয়ে খাওয়া শেষ করল, আইসক্রিমের টুকরো মাখানো।

ক্যাথেরিন সব কিছু দেখেছে। কৌতূহলের সঙ্গে। আহা, ছেলেটা বেশি খায় না তো?

–তুমি এত রোগা কেন?

ছেলেটি চটপট, জবাব দিয়েছে আমি কোনদিন মোটা হব না।

-এই শহরটা তোমার কেমন লাগে, আটানস?

ঘাড় নেড়েছে আটানস–আমি তো এই শহরের কিছুই দেখিনি।

–তুমি এথেন্সে অফিস বয় হিসেবে কাজ করতে?

ছেলেটি মাথা নেড়েছে–ডেমিরিসের অফিসে।

ওর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

কাজটা তোমার ভালো লাগেনি?

-ওটা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। ওই কাজটা আমার মনের মতো ছিল না। ডেমিরিসকে আমি কিন্তু কখনোই ভালো লোক বলব না। ওঁনাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না।

ছেলেটি চকিতে ক্যাথেরিনের চোখের দিকে তাকিয়েছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। আমি একথা বললাম বলে কিছু মনে করবেন না যেন।

ক্যাথেরিন বুঝতে পেরেছে, এই নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে বলেছে তোমাকে এখানে কে পাঠালো?

আটানস কিছু বলতে চাইছিল। ফিসফিসিয়ে ক্যাথেরিন বুঝতে পারেনি।

–তুমি কী বলছ?

–আমি একজন ডাক্তার হতে চাই।

ক্যাথেরিন অবাক চোখে প্রশ্ন করেছে কেন?

কথাটা আমার মুখে বোকার মতো শোনাচ্ছে। আমার পরিবার ম্যাসেডোনিয়া থেকে এসেছে। আমি সারাজীবন ধরে তুরস্কের মানুষদের কথা শুনেছি। তারা আমাদের গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। আমার গ্রামে কোনো

ডাক্তার ছিল না। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠত। এখন এই গ্রামটা নষ্ট হয়ে গেছে। পরিবারের সকলকে নানা জায়গাতে চলে যেতে হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক দুঃখিত মানুষ আছে, আমি তাদের সাহায্য করতে চাই।

ছেলেটা চোখ নামিয়ে নিল। বলল, আপনি আমার কথা শুনে আমাকে পাগল বলে ভাবছেন?

না, ক্যাথেরিন শান্ত ভাবে বলল, তোমার ভাবনাটা খুবই ভালো। তাই তুমি লন্ডনে এসেছ ডাক্তারি পড়বে বলে?

–আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি সারাদিন কাজ করি। রাতে শুতে যাই। একদিন না একদিন আমি ডাক্তার হবই।

ছেলেটির কণ্ঠস্বরে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। ক্যাথেরিন অবাক হয়ে গেছে। ক্যাথেরিন শান্তভাবে বলল আমি বিশ্বাস করি তোমার এই স্বপ্ন একদিন সফল হবে। এসো তুমি আর আমি পরে এই নিয়ে আলোচনা করব। এ ব্যাপারে আমি তোমার একজন বন্ধু হতে পারি। আমি জানি, সামনের সপ্তাহে কোন্ রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা আবার লাঞ্চ খাব। তুমি আমার সঙ্গে আসবে তো?

***

মধ্যরাত। স্পাইরস লামব্রোর ভিলাতে একটি বোমার বিস্ফোরণ শোনা গেল। আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে। দুজন পরিচারকের মৃত্যু হয়েছে। স্পাইরস লামব্রোর শোবার ঘরটা

একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন। কেন? শেষ মুহূর্তে তিনি এবং তার স্ত্রী মত পরিবর্তন করেছিলেন। এথেন্সের মেয়র একটা বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। নৈশ ভোজের আসর। তারা ওই সংবর্ধনা সভায় গিয়েছিলেন।

পরের দিন সকালবেলা একটা চিঠি এসেছে, নাম-ঠিকানা লেখা নেই। লেখা আছে–পুঁজিবাদীদের মৃত্যু হোক।– তলায় লেখা আছে–হেলেনিক রেভেলিউশনারি পার্টি।

চিন্তিত মুখে মেলিনা জানতে চেয়েছেন–ওরা তোমাকে হত্যা করতে চাইছে কেন?

স্পাইরস জবাব দিয়েছেন ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এ হল কোস্টার কাজ।

–কোনো প্রমাণ আছে তোমার হাতে?

–আমার কোনো প্রমাণের দরকার নেই। তুমি কি জানো, কোস্টা কতখানি প্রতিহিংসা পরায়ণ?

–না-না, আমি তা বিশ্বাস করছি না।

মেলিনা, যতদিন ওই লোকটা বেঁচে থাকবে, তোমার আর আমার জীবন নিরাপদে থাকবে না। ও আমাদের ভালো ভাবে বাঁচতে দেবে না।

আমরা পুলিশের শরণাপন্ন হতে পারি না?

–আমাদের হাতে কোন প্রমাণ আছে কি? পুলিশ আমার কথা শুনে হেসে উঠবে।

শেষ অব্দি মেলিনার হাতে হাত রেখে স্পাইরস বললেন–তুমি এই গোলমাল থেকে দূরে চলে যাও। যত দূরে যাওয়া সম্ভব। তা না হলে তুমি কিন্তু বাঁচবে না।

তারপরও অনেকক্ষণ মেলিনা দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বললেন। মনে। হল, এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

–ঠিক আছে স্পাইরস, আমি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেব।

স্পাইরস বললেন–ঠিক আছে, চিন্তা করো না। যে করেই হোক লোকটাকে পথ থেকে সরাতেই হবে।

***

মেলিনা তার বেডরুমে বসে আছেন, একা। দীর্ঘ বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যের দিকে। তার মনে নানা প্রশ্নের ভিড়। সত্যিই তো, ঘটনাটার অন্তরালে কে আছে? স্বামীর কথামতো সব ঘটনা ঘটছে কী? হয়তো তাই। কিন্তু কেন? সত্যি সত্যি ওই শয়তান ভদ্রলোক কি তাকে এবং তার ভাইকে হত্যা করতে চাইছে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে তার জীবন যে অনিশ্চিত, এটা মেলিনা বুঝতে পেরেছেন। যেমন ভাবে, বিপদের কালো মেঘ ক্যাথেরিন ডগলাসকে ঘিরে রেখেছে, ঠিক তেমনই। ক্যাথেরিন কোস্টার হয়ে কাজ করছে, লন্ডনে, আমি কি তাকে সাবধান করব? মেলিনা ভাবলেন। কিন্তু কোস্টাকে কী করে ধ্বংস করা যায়? সে যাতে আর কাউকে কোনো ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু কীভাবে?

শেষ অব্দি একটা উত্তর ভেসে এল। মেলিনা ভাবলেন, আমি কেন এই পন্থাটা আগে ভাবিনি? কী বোকা আমি!

.

২২.

কনফিডেনশিয়াল ফাইল—

ক্যাথেরিন ডগলাসের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তগুলি।

ক্যাথেরিন আমি দুঃখিত, আমার আসতে দেরি হয়েছে অ্যালান। শেষ মুহূর্তে একটা মিটিং-এ যেতে হয়েছিল।

অ্যালান কোনো সমস্যা নেই। এথেন্স থেকে যে প্রতিনিধি দল লন্ডনে এসেছেন, তারা এখনও আছেন তো?

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, ওঁরা আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে চলে যাবেন।

অ্যালান আপনার গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এখন খুবই শ্রান্ত। কোনো অসুবিধা হয়েছে কী?

ক্যাথেরিন না, কোনো অসুবিধা হয়নি। ওই মানুষগুলো সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছে।

অ্যালান–অদ্ভুত?

ক্যাথেরিন–আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। হয়তো শুনলে আপনি হেসে উঠবেন। আমার কেবলই মনে হয়েছে, ওঁদের অতীত জীবনটা খুব একটা ভালো নয়।

অ্যালান কীভাবে আপনি এই সিদ্ধান্তে এলেন?

ক্যাথেরিন–ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। গতরাতে আমি আবার দুঃস্বপ্নটা দেখেছি।

অ্যালান সেই দুঃস্বপ্ন, যার মধ্যে আপনি মৃত্যুর ছবি দেখেন? কেউ আপনাকে জলে ডুবিয়ে মারছে তো?

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, অনেক দিন বাদে ওই স্বপ্নটা আবার দেখলাম। এবার একটু অন্যভাবে।

অ্যালান– কী ভাবে?

ক্যাথেরিন– আরও বাস্তব। কীভাবে শুরু করব,...বুঝতে পারছি না।

অ্যালান– বলুন, আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

ক্যাথেরিন– ওরা আমাকে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ আমি একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলাম?

অ্যালান– ওই কনভেন্টে?

ক্যাথেরিন–আমি সুনিশ্চিত নই, হতে পারে, একটা সাজানো বাগান। একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ওঁনার মুখটা আমি স্বপ্নে কোথাও দেখেছি। কিন্তু চিনতে পারছি না।

অ্যালান– ভদ্রলোক কে বুঝতে পারেননি?

ক্যাথেরিন– হ্যাঁ, উনি হলেন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস।

অ্যালান– তাহলে এই আপনার স্বপ্ন।

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, স্বপ্নের মধ্যে ওঁনার সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু বিশ্বাস করুন,এটা স্বপ্ন নয়, মনে হল, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস আমার হাতে সোনার পিন তুলে দিচ্ছেন। সত্যি সত্যি ওই পিন কিন্তু তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

অ্যালান– আপনার অবচেতন মনের মধ্যে এই চিন্তাগুলো থেকে গেছে। অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছিল, আর কোনোদিন ঘটবে না। এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

ক্যাথেরিন– আমি জানি, কিন্তু কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস সত্যি সত্যি আমাকে ওই স্মারক চিহ্নটা দিয়েছিলেন।

অ্যালান–আপনি বলেছেন কয়েকজন সন্ন্যাসিনী আপনাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যান, তাঁরাই আপনাকে কনভেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ক্যাথেরিন– ব্যাপারটা সত্যি।

অ্যালান– তাহলে? কনভেন্টের কাউকে আপনি চেনেন কি?

ক্যাথেরিন –না, আমি কাউকে চিনি না।

অ্যালান– তাহলে? কীভাবে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস আপনাকে চিনতে পারলেন? আপনার হদিশ উনি পেলেন কী করে?

ক্যাথেরিন– আমি জানি না। সত্যিই তো, এই ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখিনি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নটা ভেঙে গেল, কানের কাছে সাবধান বাণী, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে চলেছে, আমার মন বলছে।

অ্যালান– দুঃস্বপ্ন এভাবেই আমাদের মনের ভেতর খারাপ প্রভাব ফেলে। দুঃস্বপ্ন হল একজন মানুষের সবথেকে পুরোনো শত্রু। আপনি কি জানেন, মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে nitz শব্দটা বলা হত night শব্দের পরিবর্তে। আর mare শব্দটির মানে কী বলুন তো? এর মানে হল ভয়ংকর কিছু। একটা পুরোনো প্রবাদ বাক্য আপনাকে শুনিয়ে রাখি। অনেকে বলে থাকেন, রাত চারটের পরে ঘুমোতে যাওয়া উচিত। তা হলে আমাদের আর দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে না।

ক্যাথেরিন– না-না এভাবে ভাববেন না।

অ্যালান– কোলরিজ লিখেছিলেন,–স্বপ্ন কিন্তু কোনো ছায়া নয়, তারা হল জীবন্ত সত্তা, তারা হল আমার অতীত জীবনের বিপর্যয়।

ক্যাথেরিন– ভারি সুন্দর বলেছেন তো! এবার থেকে আরও ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে। দুঃস্বপ্ন ছাড়া আমি কিন্তু ভালো আছি। মাঝে মধ্যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। আর এক জনের কথা আপনাকে তো বলাই হয়নি।

অ্যালান– সে কে?

ক্যাথেরিন–সে হল আটানস স্টাভিচ। এক কিশোর বালক। লন্ডনে এসেছে ডাক্তারি পড়বে বলে। অসম্ভব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবন এগিয়ে চলেছে। মনে হয় একদিন তার সাথে আপনার দেখা হবে। আপনি তাকে একটু উপদেশ দেবেন কি?

অ্যালান– নিশ্চয়ই। এ কাজ করতে পারলে আমি খুশি হব। সত্যি বলুন তো, আপনার মনের অবস্থা এখন কেমন?

ক্যাথেরিন– কিছু কিছু মনে করতে পারছি। অ্যা

লান–বলবেন আমাকে?

ক্যাথেলিন–শুনে আপনি হাসবেন।

অ্যালান–না, হাসব না। আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে এখন অনেক ঘটনা লুকিয়ে থাকে, যারা বাইরে আসতে চায়।

ক্যাথেরিন– স্বপ্নে দেখলাম, মিঃ ডেমিরিস আমার হাতে সোনার স্মারক চিহ্নটি তুলে দিচ্ছেন।

অ্যালান–তখন কিছু শুনেছিলেন কি?

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, আমি শুনতে পেলাম, সাবধান–সাবধান, ডেমিরিস কিন্তু একদিন আপনাকে হত্যা করবেন। মনে হবে এটা একটা দুর্ঘটনা, জানি না কীভাবে ঘটনাটা ঘটবে। কেউ আমার মৃত দেহ সনাক্ত পর্যন্ত করতে পারবে না। নানাভাবে আমার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু কীভাবে?

বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কীভাবে? আততায়ীরা ভাবছে মৃত্যুই হল শেষতম আনন্দ। শেষ অব্দি কীভাবে এটা ঘটবে? এমন ঘটনা, যার কোনো চিহ্ন থাকবে না এবং এমন ঘটনা ঘটাতে হবে, যাতে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস খুবই খুশি হবেন।

.

২৩.

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিচ হাউস। পিরাউস থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে তার এক একর মতো জলাশয় আছে। ডেমিরিস সন্ধ্যা সাতটায় সেখানে অবতরণ

করলেন। ড্রাইভওয়ে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ছুটে এসেছেন। গাড়ির দরজাটা খুললেন। বিচ হাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিনি যখন গিয়ে পৌঁছোলেন, অচেনা একটা লোককে দেখা গেল।

–শুভ সন্ধ্যা মিঃ ডেমিরিস।

ডেমিরিস কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেলেন।

তিনি জানতে চাইলেন–এখানে কী হচ্ছে?

–আমি পুলিশ লেফটেন্যান্ট থিওফিলস।

ডেমিরিস তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। লিভিং রুমে গিয়ে পৌঁছোলেন। কী ঘটছে? বুঝতে পারা যাচ্ছে, একটু আগে এখানে ধ্বস্তাধ্বস্তির ঘটনা ঘটেছে। চেয়ার টেবিলগুলো ওল্টানো পড়ে আছে। মেলিনার পোশাক দেখা গেল। মেঝের ওপর পড়ে আছে। ছেঁড়া। ডেমিরিস পোশাক তুলে নিলেন। তাকিয়ে থাকলেন।

আমার স্ত্রী কোথায়? আমি তো আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে এসেছি।

পুলিশ লেফটেন্যান্ট বললেন–উনি এখানে নেই। আমরা বাড়ির প্রত্যেকটা কোণায় ঘুরেছি। সব জায়গায় দেখেছি। বিচ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। মনে হচ্ছে, এই বাড়িতে মস্ত বড়ো চুরির ঘটনা ঘটে গেছে।

–মেলিনা কোথায়? মেলিনা কি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছে? সে কোথায়?

–মনে হচ্ছে, উনি এখানে নেই স্যার।

একটা ঘড়ি দেখা গেল, ক্রিস্টালটা ভেঙে গেছে। তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা।

–এটি কি আপনার স্ত্রীর ঘড়ি?

–হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

উলটোদিকে খোদাই করা আছে–মেলিনাকে ভালোবাসার সঙ্গে কোস্টা।

–তাহলে এটা কোনো জন্মদিনের উপহার হবে।

গোয়েন্দা থিওফিলস কতগুলি জায়গা চিহ্নিত করলেন। বললেন–রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

মেঝের ওপর একটা ছুরি পড়েছিল। তিনি হ্যাঁন্ডেলে হাত দিলেন না। তাতে রক্তের । ছিটে।

–এই ছুরিটা কখনও দেখেছেন কি?

ডেমিরিস তাকালেন–কী মনে হচ্ছে? আমার স্ত্রী কি মরে গেছে?

–মনে হচ্ছে তাই। আমরা রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছি। বালির ওপর বিন্দু বিন্দু রক্ত। সমুদ্র অব্দি চলে গেছে।

–হায় ঈশ্বর, ডেমিরিস চিৎকার করলেন।

–একটা কথা জানিয়ে রাখি, ছুরির ওপর কিন্তু হাতের দাগ আছে।

ডেমিরিস হেসে বললেন তাহলে? খুনিকে ধরা কি সম্ভব হবে?

–দেখব, যদি ফাইলের সঙ্গে তার হাতের ছাপ মিলে যায়। আসলে এই বাড়িটার সর্বত্রই ওই আততায়ীর হাতের ছাপ পড়ে গেছে। আমরা সবরকম তদন্ত শুরু করেছি। যদি কিছু মনে না করেন,... আপনার হাতের ছাপ দেবেন কি? তাহলে আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারব।

ডেমিরিস ইতস্তত করতে থাকেন যদি প্রয়োজনে লাগে নিশ্চয়ই দেব।

–ওই সার্জেন্টের কাছে চলে যান, তিনি এটার ব্যবস্থা করবেন।

ডেমিরিস ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশের কাছে চলে গেলেন। তার কাছে ফিঙ্গার প্রিন্টের প্যাড ছিল।

–আপনি দয়া করে আপনার আঙুলগুলো এখানে রাখবেন।

এক মুহূর্ত কেটে গেল। কাজটা হয়ে গেছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–আপনি কিছু মনে করবেন না। এটা আমাদের করতেই হবে।

–আমি বুঝতে পারছি।

লেফটেন্যান্ট থিওফিলস ডেমিরিসের হাতে একটা বিজনেস কার্ড তুলে দিলেন–আচ্ছা ভেবে দেখুন তো এই নামের কাউকে আপনি চেনেন কিনা? এই কার্ডটা কি আগে কোথাও দেখেছেন?

ডেমিরিস কার্ডের দিকে তাকালেন লেখা আছে, ক্যাটেলানোস ডিটেকটিভ এজেন্সি, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনস। কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, না এই নামটা আমি চিনতে পারছি না।

–দেখতে হবে, আমরা এখনও তদন্তটা সেইভাবে শুরু করতে পারিনি।

–ঠিকই আছে, সব দিকে নজর দেবেন কিন্তু। ভেবে দেখবেন, এই ব্যাপারটার সাথে আমার স্ত্রীর জীবন জড়িয়ে আছে।

লেফটেন্যান্ট থিওফিলস তার দিকে তাকালেন আমরা চেষ্টা করব, সর্বতোভাবে চেষ্টা করব।

***

মেলিনা, সোনার মেয়েটি, সুন্দরী এবং উজ্জ্বল, বিচিত্র স্বভাবের অধিকারিণী। কীভাবে শুরু করব। কেউ তাকে হত্যা করেছে? কিন্তু সে তো নিজের সন্তানকেই মেরে ফেলেছে। তাকে ক্ষমা করা যায় কী? মৃত্যুই হতে পারে তার ওই জঘন্য অপরাধের একমাত্র শাস্তি।

***

পরের দিন দুপুরবেলা ফোন এল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তখন এক কনফারেন্সে ব্যস্ত ছিলেন। সেক্রেটারির গলা শোনা গেল আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ ডেমিরিস।

–আমি বলেছি না, এ সময় আমাকে বিরক্ত না করতে।

–স্যার, ইনসপেক্টর লাভানস ফোনে আছেন। তিনি বলেছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি। তিনি এখুনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

-না, ঠিক আছে। আমি কথা বলব, আমাকে ফোনটা দাও।

ডেমিরিস মিটিং-এ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের দিকে তাকিয়ে বললেন আমাকে এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা করবেন।

উনি রিসিভার তুলে নিলেন ডেমিরিস বলছি।

একটা গলা ভেসে এল–চিফ ইনসপেক্টর লাভানস, সেন্ট্রাল স্টেশন। আমরা কয়েকটা তথ্য পেয়েছি। তথ্যগুলো শুনলে আপনি হয় তো খুশি হবেন। ঠিক বুঝতে পারছি না, কখন আপনি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আসতে পারবেন?

আমার স্ত্রী সম্পর্কে কোনো খবর পাওয়া গেছে কি?

–হ্যাঁ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ খবর। কিন্তু টেলিফোনে সেগুলো বলা উচিত হবে না। আপনি কি একবার আসতে পারবেন?

ডেমিরিস্ এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে থাকেন।

–ঠিক আছে, আমি আসছি।

তিনি রিসিভারটা রেখে দিলেন। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে গেছে। আপনারা ডাইনিং রুমে চলে যান। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব। আমি যাচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন।

গুঞ্জন শোনা গেল। পাঁচ মিনিট পর ডেমিরিসকে দেখা গেল পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যেতে।

***

জনা ছয়েক মানুষ বসে আছেন অফিসে, পুলিশ কমিশনারকে দেখা গেল। ডেমিরিস সেই পুলিশকে চিনতে পারলেন, যার সাথে বীচ হাউসে দেখা হয়েছিল।

ইনি হলেন স্পেশ্যাল প্রসিকিউটর ডেলমা।

ডেলমা খর্বাকৃতি একজন মানুষ। মোটা ভুরু, গোলাকার মুখ, চোখ দুটো কোণাকৃতি।

ডেমিরিস জানতে চাইলেন কী হয়েছে? আমার স্ত্রী সম্পর্কে কোনো খবর জানা গেছে কী?

চিফ ইন্সপেক্টর বললেন সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ ডেমিরিস, আমরা এমন কতগুলো তথ্যের সন্ধান পেয়েছি যা আমাদের ধাঁধার মধ্যে ফেলেছে। তাই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। আপনি হয়তো একটা স্থির সিদ্ধান্তে পা রাখতে পারবেন।

–জানি না, এ ব্যাপারে আমি কতখানি সাহায্য করতে পারব। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে এত মর্মান্তিক, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনার স্ত্রী বীচ হাউসে গিয়েছিলেন। তাই তো? কালকে বিকেলবেলা, এই ধরুন তিনটের সময়?

কী বলছেন? না, আমার স্ত্রী ফোন করেছিল, বলেছিল সেখানে সন্ধ্যে সাতটার সময় যেতে।

প্রসিকিউটর ডেলমা বলে উঠলেন–তাহলে? একটা ব্যাপার আমাদের অবাক করে দিয়েছে। আপনার বাড়ির এক কাজের মেয়ে বলেছে, আপনি টেলিফোন করে স্ত্রীকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। দুটোর সময় এই ফোনটা এসেছিল। আপনি বলেছিলেন তিনি যেন সাগর সৈকতে একা চলে যান। আপনার জন্য অপেক্ষা করেন।

ডেমিরিস গর্জন করেন উঠলেন মেয়েটি বোধ হয় ভুল করছে। আমার স্ত্রী আমাকে ফোন করেছিল। বলেছিল, সাতটার সময় তার সঙ্গে দেখা করতে।

-ঠিক আছে তার মানে মেয়েটি ভুল করেছে।

–নিশ্চয়ই।

–আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে ডেকেছিলেন? বীচ হাউসে একা দেখা করার জন্য?

আমার মনে হয় সে বোধহয় ডিভোর্সের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছিল।

–আপনি তো আগে বলেছেন যে, আপনি তাকে ডির্ভোর্স দেবেন। বলেছিলেন তো?

–হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম।

–ওই কাজের মেয়েটি কিন্তু আপনাদের টেলিফোনের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, মিসেস ডেমিরিস আপনার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি ছিলেন।

ওই কাজের মেয়েটি কী বলেছে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনি আমার কথাকেই সত্যি বলে ভাবতে পারেন।

–মিঃ ডেমিরিস, আপনি কি বীচ হাউসে সুইমিং ট্রাঙ্ক রাখেন? চিফ ইনসপেক্টর জিজ্ঞাসা । করলেন।

বীচ হাউসে? না, আমি অনেক দিন সাঁতার ছেড়ে দিয়েছি। এখন দরকার হলে টাউনহাউসের পুল ব্যবহার করি।

চিফ ইন্সপেক্টর ডেস্কের ড্রয়ারটি খুললেন। সেখানে একটি প্লাস্টিক ব্যাগ ছিল। ব্যাগ থেকে সাঁতারের পোশাক পাওয়া গেল। তিনি সেগুলো ডেমিরিসের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন–এগুলো কি আপনার পোশাক?

মনে হয়, আমার।

–পোশাকের ওপর আপনার সই রয়েছে।

–হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এগুলো আমারই পোশাক।

–আমরা বীচ হাউসের ক্লোসেটের নীচে এগুলি পেয়েছি।

–হতে পারে, হয়তো অনেকদিন আগে সেখানে রেখেছিলাম। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

না, পোশাকগুলো ভেজা। বুঝতে পারা যাচ্ছে, সমুদ্রের জল লেগেছে তাতে। বিশ্লেষণ। করা হয়ে গেছে। দেখা গেছে আপনার বীচ হাউসের সামনে সমুদ্রের সে জল, সেই জলই এখানে আছে। শুধু জল নয়, তার মধ্যে রক্তের ছিটেও।

ঘরের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

ডেমিরিস বললেন তার মানে কেউ এগুলো পরেছিল। তাতে আমি কী করতে পারি?

স্পেশ্যাল ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন কে হতে পারে? এই প্রশ্নটাই আমাদের ভাবনার জগতে রাখছে মিঃ ডেমিরিস।

চিফ ইন্সপেক্টর একটা ছোটো এনভেলপ খুললেন। সোনার বোম নিলেন আমার এক বন্ধু এটা বীচ হাউসে পেয়েছে, এটা কম্বলের তলায় ছিল। এটা কি আপনি চিনতে–পারছেন?

না।

–এটা আপনার জ্যাকেট থেকে ছিটকে এসেছে। আজ সকালে আমরা আপনার ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনার ওয়ারড্রোব তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। দেখেছি, আপনার জ্যাকেটের একটা বোম খুলে গেছে। সুতোটাও ম্যাচ করে যাচ্ছে, তার মানে? ওই। জ্যাকেটটা লন্ড্রি থেকে এসেছে একসপ্তাহ আগে।

–এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

মিঃ ডেমিরিস, আপনি আপনার স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, আপনি তাকে ডিভোর্স দিতে চাইছেন। আর তিনিও আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে কি?

না, ঠিকই বলেছেন আপনি।

চিফ ইন্সপেক্টর এবার বিজনেস কার্ডটা হাতে নিলেন, যে কার্ডটা বীচ হাউসে দেখানো হয়েছিল।

–আমাদের একজন প্রতিনিধি ক্যাটেলানোস ডিটেকটিভ এজেন্সি ঘুরে এসেছে। আজ সকালে।

-আমি ওদের নাম শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম।

–আপনার স্ত্রী ওদের ভাড়া করেছিলেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য।

এই খবরটা একটা আকস্মিক আঘাতের মতো এল ডেমিরিসের কাছে।

–মেলিনা? কীসের থেকে বাঁচতে চেয়েছিল?

আপনার কাছ থেকে। ওই এজেন্সির মালিক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্ত্রী আপনাকে ডিভোর্স করতে চেয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন, ডিভোর্সের কথা উঠলে আপনি ওঁনাকে খুন করে ফেলবেন। এমনকি উনি যাতে পুলিশের কাছে যেতে না পারেন, তার বন্দোবস্তও করেছিলেন। ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা হয়তো সকলের সামনে ব্যাপারটা আনতে চাননি।

ডেমিরিস দাঁড়িয়ে উঠলেন।

–আমি এখানে আর থাকতে চাইছি না। এসব কথার মাথামুণ্ডু নেই। কেন আমাকে ডেকে পাঠালেন?

চিফ ইন্সপেক্টর ড্রয়ারের কাছে পৌঁছে গেলেন। রক্তের ছিটে লাগা ছুরিটা বের করলেন। –এই ছুরিটা বীচ হাউসে পাওয়া গেছে। আপনি আমার অফিসারকে বলেছেন, এই অস্ত্রটা আপনি কখনও দেখেননি।

–হ্যাঁ, এটাই সত্যি।

কিন্তু এই ছুরিতে আপনার হাতের ছাপ এল কী করে?

ছুরিটার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ডেমিরিস মন্তব্য করলেন আমার হাতের ছাপ? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। এটা হতেই পারে না।

তার মন তখন ঘোড়ার বেগে ছুটে চলেছে। তিনি সব কিছু চিন্তা করছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ সব তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। প্রথমত যদি আমরা কাজের মেয়েটির কথা ধরি। তিনি ফোন করেছিলেন ঠিকই, বলেছিলেন দুটোর সময় দেখা হবে। স্ত্রী যেন একা একা বীচ হাউসে থাকেন। তারপর পাওয়া গেছে সাঁতারের পোশাক। রক্তের চিহ্ন আছে। জ্যাকেট থেকে একটা বোম ছিঁড়ে গেছে। এমন একটা ছুরি পাওয়া গেছে, যেখানে তার হাতের চিহ্ন মাখা। ফাঁসির দড়িটা কি কাছে এগিয়ে এল?

–আপনারা বুঝতে পারছেন না, সবটাই সাজানো। তিনি চিৎকার করলেন, কেউ হয়তো ওই বাক্সগুলো বীচ হাউসে নিয়ে গিয়েছিল। তার ওপর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে। ওই ছুরিটার ওপরেও। আমার জ্যাকেট থেকে একটা বোম ছিঁড়ে দিয়েছে।

স্পেশ্যাল প্রসিকিউটর বাধা দিয়ে বললেন মিঃ ডেমিরিস, আপনার এসব কথার অর্থ আছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলুন তো, ছুরির ওপর আপনার হাতের দাগ এল কী করে? আপনি এটার কী ব্যাখ্যা দেবেন?

এই প্রথম আমতা আমতা করতে থাকেন ডেমিরিস।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এখন মনে পড়েছে; মেলিনা আমাকে বলেছিল একটা প্যাকেট কেটে দিতে হবে, ওই ছুরিটাই দিয়েছিল হয়তো আমার হাতে। তাই আমার হাতের দাগ আছে ওই ছুরির ওপরে।

–প্যাকেটটা কী, আপনি তা বলতে পারবেন?

–না, আমি ঠিক জানি না।

–আপনি জানেন না প্যাকেটটা কী?

–না, আমি খালি দড়িটা খুলে দিয়েছিলাম। মেলিনা প্যাকেটটা কখনও খোলেনি।

কার্পেটের ওপর রক্তের চিহ্ন, বালির নানা দিকে রক্তের চিহ্ন, এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?

–এটা তো হবেই। ডেমিরিস মাথা নাড়লেন। মেলিনা কী করেছে? সে নিজের শরীরের কোথাও আঘাত করেছে। জলের দিকে এগিয়ে গেছে। আপনাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছে। সবাই ভাববে আমি তাকে হত্যা করেছি। সে আমাকে এই ব্যাপারে জড়ানোর

চেষ্টা করেছে। কারণ আমি তাকে ডিভোর্স দেব। এখন সে কোথাও লুকিয়ে আছে। বসে বসে হাসছে। আর আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করতে চলেছেন। মেলিনা, এখনও বেঁচে আছে, যেমন আমি বেঁচে আছি।

স্পেশ্যাল প্রসিকিউটর বললেন ব্যাপারটা সত্যি হলে ভালো হত। কিন্তু আসল ঘটনাটা তা নয়। তার মৃতদেহটা সমুদ্র থেকে পাওয়া গেছে। শরীরের নানা জায়গাতে আঘাতের চিহ্ন। জলে ডুবিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মিঃ ডেমিরিস নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলাম।

.

২৪.

এইভাবেই শুরু হয়েছে। মেলিনা জানতেন না, ব্যাপারটা কীভাবে শেষ করতে হবে। তার মনের ভেতর শুধু একটি চিন্তার অনুরণন, যে করেই হোক, স্বামীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই হবে। কোস্টাকে কীভাবে থামানো সম্ভব? নিজের জীবন নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তা করেননি। এমনিতেই তাঁর দিন এবং রাত পরিপূর্ণ হয়ে আছে বেদনা ও অপমানের জ্বালায়। তার মনে পড়ে গিয়েছিল, কীভাবে স্পাইরস এই বিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। স্পাইরস বারবার বলেছিলেন, তুমি ডেমিরিসকে বিয়ে কোরো না। ও একটা জীবন্ত শয়তান। ও তোমার জীবনটাকে নরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। আঃ, তখন কেন যে ভাইয়ের কথা শুনিনি আমি। এত বেশি ভালোবাসা উথলে উঠল কী করে? এখন আমার স্বামী আমাকে হত্যা করতে উদ্যত। কোস্টা, এই কাজ তোমাকে

আমি করতে দেব না। সকালবেলা, মেলিনা সবকিছু ভেবে নিলেন, তারপর কাজগুলো ধীর লয়ে এগিয়ে চলল।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তখন তার স্টাডিতে ছিলেন। মেলিনা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটা প্যাকেট ছিল। মোটা দড়ি দিয়ে বাধা। তিনি একটা বুচার নাইফ হাতে রেখেছিলেন।

-কোস্টা, তুমি কি এই দড়িগুলো কেটে দেবে? আমি কাটতে পারছি না।

ডেমিরিস বউয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, অধৈর্যভাবে-এসো, তুমি কি ছুরি ধরতে শেখোনি?

তিনি দ্রুত ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। দড়ি কাটতে কাটতে বলেছিলেন-কোন একজন চাকরকে ডাকলে পারতে তো?

মেলিনা উত্তর দেননি।

ডেমিরিস দড়ি কেটে দিয়েছিলেন হয়েছে তো?

তিনি ছুরিটা রেখেছিলেন। মেলিনা আলতো করে ছুরিটা তুলে নিয়েছিলেন।

তারপর? মেলিনা বলেছেন-কোস্টা, এইভাবে চলতে পারে না। আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি। তুমিও হয়তো আমার প্রতি কিছু ভালোবাসা অবশেষ রেখেছ। ভেবে দেখো,

কী সুন্দর দিন না কেটে গেছে আমাদের মধ্যে। তোমার কি মনে আছে মধুচন্দ্রিমার সেই রাত।

ডেমিরিস চিৎকার করে উঠেছিলেন ঈশ্বরের দোহাই, এভাবে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। তোমার সাহচর্য আমাকে শেষ করে দিয়েছে। তুমি এখনই আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি থাকলে আমি অসুস্থ বোধ করি।

মেলিনা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। সব শেষে শান্তভাবে বলেছিলেন–ঠিক আছে, আমরা আমাদের পথেই চলব।

তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ছুরিটা মনে করে হাতে নিলেন।

ডেমিরিস চিৎকার করে উঠলেন–তোমার প্যাকেটটা নিয়ে নাও।

মেলিনা চলে গিয়েছিলেন।

***

মেলিনা এলেন তার স্বামীর ড্রেসিং রুমে। একটা ক্লোসেটের দরজা খুললেন। অসংখ্য স্যুট ঝুলছে। একটা দিকে কেবল স্পোর্টস জ্যাকেট রয়েছে। তিনি একটা জ্যাকেটের কাছে পৌঁছোলেন। সোনার বোতামটা জ্যাকেট থেকে খুলে নিলেন। সেটা রেখে দিলেন নিজের পকেটের মধ্যে।

এবার কী করবেন? ড্রয়ার খুললেন। স্বামীর সাঁতারের পোশাক। বেছে নিলেন। সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। শান্তভাবে, কোনো ঝামেলা হয়নি। মেলিনা ভাবলেন।

***

ক্যাটেলানোস ডিটেকটিভ এজেন্সি সোফকলিয়স স্ট্রিটে অবস্থিত। পুরোনো দিনের একটা ধূসর বাড়ি। একেবারে কোণের দিকে। মেলিনা অফিসে ঢুকে পড়লেন। মালিকের সাথে কথা বললেন। ভদ্রলোকের নাম ক্যাটেলানোস। মাঝবয়সি টাকমাথা, পাতলা গোঁফ আছে।

–শুভ সকাল শ্রীমতী ডেমিরিস। বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

–আপনার সহযোগিতা চাইছি।

কী ধরনের সহযোগিতা?

–আমার স্বামীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে।

ক্যাটেল।নোস অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বিপদের গন্ধ পেয়েছেন। যে ধরনের মামলা তার হাতে আসে। এটা সেই পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিরুদ্ধে যাবেন। কী করে। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো।

–আপনি কেন পুলিশের সাহায্য নিচ্ছেন না?

উনি জানতে চেয়েছিলেন।

-না, আমি চাই না, সকলে এই ঘটনাটার কথা জানুক। আমি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছি। আমি আমার স্বামীকে বলেছি যে, আমি তাকে ডিভোর্স দেব। সে আমাকে হত্যা করবে বলে শাসিয়েছে। তাই আপনার কাছে এসেছি।

-ঠিক আছে, বলুন তো আপনাকে কী ধরনের নিরাপত্তা দিতে হবে?

কয়েকজন শক্তসমর্থ লোক দরকার, যারা সবসময় আমার সঙ্গে থাকবে।

ক্যাটেলানোস মেলিনার মুখের দিকে তাকালেন। আহা, এমন লাবণ্যবতী মহিলা, মনে হচ্ছে নিউরোটিক রোগী। ওঁর স্বামী এই ধরনের ব্যবহার করতেই পারে না। এটা বোধহয় কোনো পারিবারিক সমস্যা। মনোমালিন্যের ব্যাপার। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা, এঁনার কাছ থেকে ভালো টাকা আদায় করা যেতে পারে। ক্যাটেলানোস ঠিক করলেন, তাহলে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করলে কেমন হয়। হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে কিন্তু তাতে কী? এই পেশার মধ্যে তো গোলমাল লেগেই আছে।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি একজন ভালো চেহারার শক্তসমর্থ লোককে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। কবে থেকে কাজ শুরু হবে?

–সোমবার থেকে।

তার মানে? একটু সময় আছে।

মেলিনা ডেমিরিস বললেন আমি আপনাকে টেলিফোন করে সব খবর দেব। আপনার কোনো বিজনেস কার্ড আছে কি?

ক্যাটেলানোস বলেছিলেন–অবশ্যই আছে। তিনি মেলিনার হাতে নিজের বিজনেস কার্ডটি তুলে দিলেন। আহা, এমন সুন্দর খদ্দের, এই নামটাই যথেষ্ট, নামটা বাঁধিয়ে রাখতে হবে। তাহলেই সহজে আমরা অন্যদের প্রভাবিত করতে পারব।

***

মেলিনা বাড়িতে ফিরে এলেন। ভাইকে ফোন করলেন।

–স্পাইরস, তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। কোস্টাকে ফঁদে ফেলার সব বন্দোবস্ত পাকা।

কী বলছ? আমি ওকে বিশ্বাস করি না। কোস্টা তোমার সঙ্গে সন্ধি করতে চায়? মেলিনা, এটা মনে হচ্ছে, ওর কোনো একটা চাল। সবদিক বিবেচনা করে দেখ। এই জালে পা দিও না।

–না-না, অত চিন্তা কোরো না। ওকে দেখে অনুতপ্ত বলে মনে হচ্ছে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছে, তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। ও পরিবারের শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইছে।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা।

–আমি বিশ্বাস করছি না।

-ওকে একটা সুযোগ দিলে কী ক্ষতি? ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার লজে। অ্যাক্রোকোরিন্থে। আজ তিনটের সময়।

-তিন ঘণ্টা লাগবে সেখানে পৌঁছোতে। আমরা শহরের মধ্যে কোথাও দেখা করতে পারি না?

না, মেলিনা বলেছেন, ওখানে গেলেই ব্যাপারটা নিরাপদে থাকবে।

–ঠিক আছে, আমি ওখানে পৌঁছে যাব। দেখি তোমার জন্য কী করা যায়।

মেলিনা বলেছিলেন- শুধু আমার একার জন্য নয়, আমাদের দুজনের জন্য। এখনকার মতো গুডবাই।

–গুডবাই।

.

মেলিনা কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের অফিসে ফোন করলেন। ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কী হয়েছে? আমি এখন ব্যস্ত।

–এইমাত্র স্পাইরসের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছি। সে তোমার সাথে বিবাদ মেটাতে চাইছে।

হাসির শব্দ–আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, এই ব্যাপারটায় সে রাজি হবে না। অনেকবার আমি এই প্রস্তাব রেখেছি। সে কিন্তু রাজি হয়নি।

ভবিষ্যতে সে আর কখনও তোমার পথের কাঁটা হবে না। কোস্টা, তুমি শেষবারের মতো আমাকে বিশ্বাস করো। সে তার সমস্ত জাহাজ তোমাকে বিক্রি করতে চাইছে।

–আমাকে বিক্রি করবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ডেমিরিসের কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য আগ্রহ এবং আতিশয্য।

-হ্যাঁ, সে বলেছে, অনেক হয়েছে, আর ঝগড়াঝাটি নয়। এবার শান্তিতে থাকবে।

–ঠিক আছে, তার অ্যাকাউটেন্টকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও।

না, সে তোমার সাথে নিজেই কথা বলতে চাইছে। তোমাকে আজ বিকেল তিনটের সময় তার অ্যাক্রোকোরিন্থ লজে যেতে হবে।

–ওর লজে?

–হ্যাঁ, ওটা একটা শান্ত নিরাপদ জায়গা। তোমরা দুজন ছাড়া কেউ থাকবে না। সে চায় না, এই খবরটা বাইরে পৌঁছে যাক।

ডেমিরিস ভাবতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত মস্ত বড়ো এক যুদ্ধে জিততে চলেছেন তিনি। – ঠিক আছে, ডেমিরিস বললেন, তুমি জানিয়ে দাও, আমি ঠিক সময়ে ওখানে পৌঁছে যাব।

.

অ্যাক্রোকোরি জায়গাটা খুব একটা কাছে নয়। শহর ছাড়িয়ে দীর্ঘ রাস্তা চলে গেছে। দুপাশে সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। আহা, আঙুরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পাতিলেবু। ধান পেকে গেছে কী? স্পাইরস লামব্রো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে এড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। এলিফসিসের উঁচু স্তম্ভগুলো দেখা যাচ্ছে। ছোটো ছোটো দেবতাদের বেদী। ডেমিরিসের কথা মনে হল তার।

.

লজে পা রাখলেন তিনি। কেবিনের দরজাটা খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। একটু পরে কোন্ ঘটনা ঘটবে? মনের মধ্যে তোলপাড়। সত্যি সত্যি কনস্ট্যানটিন সন্ধি চাইছে? নাকি এটা তার আর একটা চাল? যদি ভয়ংকর কিছু ঘটে যায়, মেলিনা সব খবর ঠিক মতো পাবে কী? স্পাইস গাড়ির বাইরে চলে এলেন। সেই ফাঁকা লজের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

এই লজটা একটা পুরোনো কাঠের বাড়ি। এখান থেকে দূরের কোরিন্থের দৃশ্যাবলি, দেখা যায়। ছোট্টবেলায় স্পাইরস এখানে আসতেন। বাবা সঙ্গে থাকতেন। পাহাড় চূড়ার এখানে সেখানে শিকারের খেলা চলত। তিনি এখন একটা বড়ো শিকার ধরতে এখানে এসেছেন।

.

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এসে গেলেন। স্পাইরসকে দেখতে পেলেন। স্পাইরস তার জন্য অপেক্ষা করছেন। আহা, মুখে আনন্দের চিহ্ন। অনেকদিন বাদে, দিন কেন অনেক বছর কেটে গেছে। এবার সব থেকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেই পরাজয় স্বীকার করতে চাইছে। এর থেকে আনন্দের খবর আর কী হতে পারে।

ডেমিরিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন মুখোমুখি বসে আছেন। একে অন্যকে মাপবার চেষ্টা করছেন।

ডেমিরিস নীরবতা ভেঙে বললেন–কী প্রিয় ভগ্নিপতি, শেষ অব্দি আমরা পথের প্রান্তে এসে পৌঁছোতে পেরেছি, তাই তো?

–এই উন্মত্ততা বন্ধ করতে হবে কোস্টা, অনেক হয়েছে, আর নয়।

–আমিও তোমার সাথে একমত। তোমার হাতে কতগুলো জাহাজ আছে স্পাইরস?

লামব্রো অবাক হলেন- তুমি কী বলছ?

-তোমার হাতে কতগুলো জাহাজ আছে? সঙ্গি করে বলো তো? আমি সব কটা কিনে নেব। তবে একটু কম টাকা দেব। তুমি তো আমার আত্মীয়।

লামব্রো কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

–আমার জাহাজ কিনবে?

-হ্যাঁ, আমি সব কটা কিনে নেব। তাহলে আমি পৃথিবীর সবথেকে বড় জাহাজ বাহিনীর অধীশ্বর হব।

–তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি কেন এই কথাটা ভাবছ বলো তো? আমি কি পাগল! আমার জাহাজ তোমার হাতে তুলে দেব?

এবার ডেমিরিসের অবাক হওয়ার পালা।

-কেন এই জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। আমি তো তাই শুনেছি।

–আমরা এখানে এসেছি, যেহেতু তুমি সন্ধি করতে চাইছ।

ডেমিরিসের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে–আমি সন্ধি করতে চাইছি? তোমাকে কে বলল?

–মেলিনা।

এবার দুজনেই সরল সত্যটা উপলব্ধি করতে পারলেন।

-মেলিনা বলেছে, তোমার সাথে আমি সন্ধি করতে চাইছি।

–মেলিনা বলেছে, আমি আমার জাহাজ বিক্রি করব?

ডেমিরিস চিৎকার করে বললেন–ওই কুত্তীর বাচ্চা, আমার মনে হচ্ছে, এইভাবে সে আমাদের দুজনকে এক টেবিলে বসাতে চেয়েছে। আহা, সে একটা মস্ত বড় বোকা। লামব্রো, তুমি নিজের বোনকে চিনতে পারলে না। তোমার জন্য আমি গোটা সন্ধ্যেটা নষ্ট করলাম।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। দরজা দিয়ে ছিটকে বাইরে এলেন।

স্পাইরস লামব্রো তার দিকে তাকিয়েছিলেন। মেলিনা মিথ্যে কথা বলতে পারে না। মেলিনা হয়তো ভেবেছিল, স্বামী এবং আমাকে একটেবিলে বসাতে না পারলে উপায় নেই। কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে, বড় দেরি, মেলিনাকে বোধহয় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

.

ডেমলিনা বলেছে তোমার সপ্রলব্ধি করতে, নিজের বোনকে টেবিলে বলেন–ওইজ বিক্রি

একটা বেজে তিরিশ মিনিট। মেলিনা তাঁর কাজের মেয়েটিকে ডাকল–আনড্রিয়া, তুমি আমার জন্য একটু চা আনবে?

এখুনি আনছি ম্যাডাম।

কাজের মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যখন সে ফিরে এল, দশ মিনিট কেটে গেছে, শুনতে পেল তার মালকিন টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর

না কোস্টা, আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি তোমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছি। আমি জনসমক্ষে এটা প্রচার করব, যতটা সম্ভব।

আনড্রিয়া অবাক হয়েছে। ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে দিল। হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই মেলিনা হাত নেড়ে তাকে থাকতে বললেন।

মেলিনা তখন মৃত ফোনে কথা বলছেন–তুমি আমাকে এভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরো না। কোনো অবস্থাতেই আমি আমার মত পরিবর্তন করব না। না, তুমি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কোস্টা? তুমি আমার কী করবে? ঠিক আছে, আমি বীচ হাউসে তোমার সাথে দেখা করতে যাব। তুমি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা কোরো না কিন্তু। হ্যাঁ, আমি একাই যাব। আধ ঘণ্টার মধ্যে। ঠিক আছে।

মেলিনা রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রাখলেন। মুখের ওপর উদ্বিগ্নতার ছাপ। আনড্রিয়ার দিকে তাকালেন।

–আমি আমার স্বামীর সাথে দেখা করতে বীচ হাউসে যাচ্ছি। যদি ছটার মধ্যে আমি না ফিরি, তাহলে তুমি অবশ্যই পুলিশের কাছে খবর দিও।

আনড্রিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে ড্রাইভার কি আপনাকে নিয়ে যাবে ম্যাডাম?

না, ডেমিরিস বলেছেন, আমি যেন একলা যাই।

–ঠিক আছে, ম্যাডাম।

.

আর একটা কাজ করতে হবে। ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জীবন এখন সুতোর ওপর ঝুলছে। তাকে সাবধান করতে হবে। ওই প্রতিনিধি দলের মধ্যে আততায়ী লুকিয়ে আছে। তারপর? ওই মেয়েটিকে আর দেখা যাবে না। তাকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে কেউ জীবন্ত ফিরে আসতে পারে না। মেলিনা লন্ডন অফিসে ফোন করল।

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার এখানে কাজ করেন?

–এই মুহূর্তে তিনি এখানে নেই। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব?

মেলিনা ইতস্তত করতে থাকেন। এই খবরটা দিতেই হবে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে দেওয়া যায় কি?নাকি মেলিনা আর একটু অপেক্ষা করবেন। কোস্টার কথা মনে পড়ল।উইম ভ্যানডিন নামে এক ভদ্রলোকের কথা কোস্টা বলেছিল। তাকে ফোনে পেলে ভালো হত।

–আমি কি মিঃ ভ্যানডিনের সাথে কথা বলতে পারি?

–আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

একজন মানুষের গলা শোনা গেল–হ্যালো?

মেলিনা উইমকে কী করে চিনবেন?

মেলিনা বললেন–ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। আপনি দেখবেন যে, এই খবরটা যেন যথাসময়ে তার কানে পৌঁছে যায়।

ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার?

-হ্যাঁ, বলবেন, তার জীবন এখন নিরাপদ নয়। কেউ বা কারা তাকে হত্যা করতে চাইছে। এথেন্স থেকে যে প্রতিনিধি দল লন্ডনে গেছেন, তাদের মধ্যে আততায়ী লুকিয়ে আছে। কথাটা দয়া করে বলবেন তো?

-এথেন্স?

–হ্যাঁ।

–এথেন্সের জনসংখ্যা...

মেলিনা কিছুই বুঝতে পারছেন না, লোকটার কি মাথা খারাপ? তিনি ফোনটা রেখে দিলেন। তিনি চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ, পরে কিছু ঘটে গেলে তিনি আর নিজেকে দোষারোপ করতে পারবেন না।

উইম ডেস্কে গিয়ে বসলেন। টেলিফোনের কথাগুলো তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে। কেউ ক্যাথেরিনকে হত্যা করতে চাইছে। এ বছর ইংল্যান্ডে ১১৪টি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাথেরিন হবে ১১৫ নম্বর বলি। এথেন্স থেকে কেউ একজন এসেছে। কেউ না কারা? জেরি হ্যালি, ইভেস রেনার্ড, ডিনো মাত্তুসি? তাঁদের কেউ একজন ক্যাথেরিনকে মেরে ফেলবেন। উইমের কম্পিউটার কাজ করতে শুরু করে। এই তিনটে লোকের সমস্ত তথ্য তার মগজে ঢুকে, গেছে। ধীরে ধীরে তিনি সবকিছু ভাবতে থাকেন।

ক্যাথেরিন ফিরে এল। উইম এই টেলিফোনের ব্যাপারে তাকে কিছুই জানালেন না।

তিনি ভাবছিলেন, দেখাই যাক না। সত্যি সত্যি দুর্ঘটনাটা ঘটে কিনা।

.

ক্যাথেরিনকে তখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা কাবোর না কারোর সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে। থিয়েটার হল অথবা মিউজিক্যাল ক্লাবে। ভোর থেকেই আবার কাজ শুরু হচ্ছে। উইমের সঙ্গে দেখা হয়েছে। উইম বোধহয় ক্যাথেরিনকে আর পছন্দ করছেন না।

কখন এই ঘটনাটা ঘটবে–উইম ভাবতে থাকেন। মাঝে মধ্যেই ভাবছেন, টেলিফোনের; খবরটা দেওয়া উচিত। কিন্তু না দিলেই বা কী ক্ষতি হবে?

.

২৫.

কুড়ি বছরের স্মৃতি, এক ঘণ্টার যাত্রা শহর থেকে বীচ হাউস পর্যন্ত। মেলিনা অনেক কিছু ভাবছিলেন। কোস্টা, তরুণ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। বলেছিল–তুমি আর আমি এখানেই স্বর্গ তৈরি করব। তোমার সৌন্দর্য, আমি বর্ণনা করতে পারব না। হায় ঈশ্বর।

সেই অসাধারণ প্রমোদ তরণী। সারাতে কাটানো ছুটির অবসর। দিনগুলো পরিপূর্ণ ছিল ভালোবাসার স্মারক চিহ্নতে। রাতগুলো? বন্য ভালোবাসায় ভরা। তারপর ওই গর্ভপাত? একটির পর একটি রক্ষিতার আবির্ভাব। নোয়েলে পেজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। জনসমক্ষে অপমান। আরও কত কী? প্রেম মরে গেল। ঘৃণা জেগে উঠল। তুমি কেন নিজেকে হত্যা করছ না? শেষ পর্যন্ত স্পাইরসকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াসে মত্ত হয়েছ।

স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন, মেলিনা আর কোনো কিছু ভাবতে পারছেন না।

.

মেলিনা বীচ হাউসে পৌঁছে গেলেন। একেবারে ফাঁকা। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ঠান্ডা বাতাস বইছে সমুদ্রের দিক থেকে। শয়তানের পদচিহ্ন, মেলিনা ভাবলেন।

তিনি ওই সুন্দর বাড়িটার দিকে হেঁটে গেলেন। শেষবারের মতো দেখলেন তার দিকে।

তারপর? ফার্নিচারগুলো এলোমেলো করে দিলেন। ল্যাম্পশেডগুলো ভেঙে দিলেন। নিজের পোশাকটা নিজেই ছিঁড়ে ফেললেন। মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ডিটেকটিভ এজেন্সির কার্ডটা বের করলেন। টেবিলে রাখলেন। কম্বলের তলায় ওই

সোনার বোতামটা ঢুকিয়ে দিলেন। কোস্টা তাকে যে সোনার রিস্টওয়াচটা দিয়েছিল, সেটা ভেঙে চুরে টেবিলের ওপর ফেলে রাখলেন।

স্বামীর সাঁতারের পোশাকটা নিয়ে এলেন। সেগুলোকে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছোতে হবে। সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে দিলেন। বাড়িতে ফিরে এলেন। আরও একটা কাজ বাকি আছে। এবার? দীর্ঘ নিশ্বাস নিলেন তিনি। ওই কসাইয়ের ছুরিটা। সাবধানে খুললেন। টিসু পেপারে হাতলটা চেপে দিলেন। না, হাতের চিহ্ন যেন উঠে না যায়। মেলিনা সেটা এক হাতে ধরলেন। তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। মাথা ঠিক রাখতে । হবে। নিজেকেই আঘাত করতে হবে। ব্যাপারটা কষ্টদায়ক। হত্যা করার মতো। আহা, তারপর? ষড়যন্ত্রের বাকিটুকু...

উনি চোখ বন্ধ করলেন, ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলেন।

অসম্ভব যন্ত্রণা, গল গলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। মেলিনা সাঁতারের পোশাকটা পাশে রাখলেন, দেখলেন সেখানে রক্ত জমেছে। ক্লোসেটের কাছে পৌঁছে গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরলেন। আচ্ছন্নের মতো অবস্থা। ব্যাপারটা ঠিক হয়েছে কি? কোনো কিছু পড়ে নেই তো? চারদিকে তাকালেন। এবার ভোলা দরজা দিয়ে সাগর সৈকতের দিকে ছুটে গেলেন। কার্পেটের ওপর রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ, ক্রিমসন রঙের আলপনা।

তিনি সমুদ্রের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। রক্তের স্রোত আরও দ্রুত। তিনি ভাবলেন, কোস্টা কি জিতে যাবে এই খেলাতে? আমি কখনও তা হতে দেব না।

এত দূর? আর পারছি না। আরও আরও একটা পদক্ষেপ–আরও একটা পদক্ষেপ বাকি আছে।

এভাবেই উনি হাঁটছিলেন। লড়াই করছিলেন। আর বোধহয় পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। পড়ে গেলেন হুড়মুড়িয়ে। কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না। দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে আবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর? শেষ অব্দি সমুদ্রের ঠান্ডা জল তাকে কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিল। সকল যন্ত্রণার উপশম।

প্রথমে লবণাক্ত জল তার ক্ষতে আঘাত করেছিল। উনি চিৎকার করেছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা। স্পাইরসের জন্য এ যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতেই হবে। প্রিয় দাদা আমার।

অনেক দূরে, মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এখন একটু সাঁতার দিতে পারলে ভালো হত। রক্তের সমুদ্র। তখনই কী যেন ঘটে গেল! একটা অলৌকিক ঘটনা! আকাশ থেকে মেঘ নেমে এল। কে যেন সাদা মোলায়েম হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গে। আঃ, এত আনন্দ, যন্ত্রণা চলে গেছে। মনে হল, তিনি বুঝি শান্তির সমুদ্রে স্নান করছেন।

আমি বাড়ি যাব, শেষ অব্দি আমি বাড়ি যাব। মেলিনা ভাবলেন, অনেক রক্ত সঞ্জাত সন্ধ্যার পর আমি একটি নির্বিঘ্ন রাত্রির সন্ধান পেয়েছি।

অ্যারেস্ট

২৬.

–আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল, নিজের স্ত্রীকে আপনি হত্যা করেছেন।

সব ঘটনা ঘটে চলেছে, সিনেমায় দেখা এক-একটি ছবির মতো। আবার তার হাতের ছাপ নেওয়া হল। ছবি নেওয়া হল। তাকে প্রিজন সেলে বন্দি রাখা হল। উনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ তাকে এইভাবে চোর-ঘঁচোরদের সঙ্গে দিন কাটাতে হবে।

–পিটার ডেমোনিসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।

মিঃ ডেমোনিডাস তার চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। ঠিক অবসর নয়, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রাখা হয়েছে।

তাহলে? কে এখন আমাকে সাহায্য করবেন? এই অন্ধকার বিবর থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। আমি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস, পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী মানুষ।

তিনি স্পেশ্যাল প্রসিকিউটরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন।

ঠিক সময়ে ডেলমা এলেন, এক ঘণ্টা বাদে। বললেন–আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?

–হ্যাঁ, ডেমিরিস বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? দুপুর তিনটের সময় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, ব্যাপারটা কি ঠিক?

–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–তাহলে? আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে কিছু কথা আমার কাছ থেকে শুনবেন তো? আমি তখন বীচ হাউসে ছিলাম না। আমি অন্য কোথাও ছিলাম।

–আপনি কি তা প্রমাণ করতে পারবেন?

–হ্যাঁ, আমার একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে।

.

স্পাইরস লামব্রো এসে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনারের অফিসে। স্পাইরসকে দেখে ডেমিরিসের মুখে আশার আলো ফুটে উঠল।

স্পাইরস, ভগবান তোমাকে ঠিক সময়ে এখানে পাঠিয়েছেন। এই বোকারা মনে করছে, আমি মেলিনাকে হত্যা করেছি। তুমি তো জানো আমি তা করতে পারি না। তুমি পরিষ্কার করে বলল।

স্পাইরস বললেন–কী বলব?

–মেলিনাকে তিনটের সময় হত্যা করা হয়েছে। গতকাল দুপুরবেলা। তখন তুমি আর আমি আক্রোকরিন্থে বসেছিলাম। আমি কি অত তাড়াতাড়ি বীচ হাউসে পৌঁছোতে পারি? অন্তত ঘণ্টা চারেক সময় তো লাগবে। তুমি ওই ব্যাপারে সব কথা খুলে বলল।

স্পাইরস লামব্রো অবাক হলেন–কী ব্যাপারে?

এবার ডেমিরিসের মুখে রক্তের ছটা–কেন? তুমি আর আমি গতকাল আলোচনা সভায় বসেছিলাম। অ্যাক্রোকরিন্থের লজে?

–তোমার ভুল হচ্ছে কোস্টা। আমি কাল দুপুরে একা একাই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। আমি তোমার জন্য মিথ্যে কথা বলব কেন?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মুখ এখন রাগে পরিপূর্ণ।

তুমি এটা করতে পারো না। তিনি এগিয়ে গেলেন, লামব্রোর গলা চেপে ধরলেন, ঈশ্বরের দোহাই, সত্যি কথাটা বলল।

স্পাইরস লামব্রো তাঁকে সরিয়ে দিলেন–সত্যিটা হল, আমার বোন মারা গেছে। তুমি ঠান্ডা মাথায় তাকে হত্যা করেছ।

মিথ্যুক, ডেমিরিস চিন্তা করলেন। মিথ্যক। তিনি লামব্রোর দিকে কঠিন চোখে তাকালেন, না, দুজন পুলিশ তাকে আটকে রেখেছে।

কুকুরির সন্তান, তুমি জানো আমি নির্দোষ।

–এটা বিচারকরা বিচার করবেন। তোমার একটা ভালো আইনজীবী দরকার। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বুঝতে পারলেন, এখন কেবল একজনই তাকে সাহায্য করতে পারেন।

তিনি হলেন নেপোলিয়ান ছোটাস। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি কি আর বেঁচে আছেন!

.

২৭.

কনফিডেনসিয়াল ফাইল–

ক্যাথেরিন ডগলাসের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তগুলিঃ

ক্যাথেরিন– অ্যালান, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমরা ভবিষ্যতের কথা আগে থেকে জানতে পারি?

অ্যালান- বিজ্ঞানীরা তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কোনো কোনো সময় আমরা চোখ বন্ধ করলে ভবিষ্যতের স্পষ্ট ছবি দেখতে পাই। ক্যাথরিন, আপনি এমন কোনো ছবি দেখেন কি?

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে আমার জীবনে।

অ্যালান–এটা কি আপনার পুরোনো স্বপ্নের অংশ?

ক্যাথেরিন না, আমি তো বলেছি, এথেন্স থেকে কয়েক জন প্রতিনিধি এসেছেন।

অ্যালান–হ্যাঁ ।

ক্যাথেরিন– ডেমিরিস বলেছেন, তাঁদের দেখাশোনা করতে হবে। তাদের সকলের সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক।

অ্যালান– তাঁদের কারও সাহচর্য কি আপনি পছন্দ করছেন না?

ক্যাথেরিন– না, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তারা এখনও পর্যন্ত আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যাবে। আমি কি আমার মনের অবস্থা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি?

অ্যালান- ঠিক আছে। ওই প্রতিনিধি দল সম্পর্কে গুছিয়ে বলুন তো?

ক্যাথেরিন– একজন ফরাসি এসেছেন ইভেস রেনার্ড, তিনি বারবার মিউজিয়ামে যেতে চান। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখেন না। ইতিহাসের কোনো ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তিনি শনিবার আমাকে নিয়ে স্টোনহেঞ্জে যাবেন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আর একজনের নাম জেরি হ্যালি। তিনি এসেছেন আমেরিকা থেকে। তার ব্যবহার খুব একটা খারাপ নয়। তিনি কখনও আমাকে বিরক্ত করেন না।

তৃতীয় প্রতিনিধি ডিনো মাত্তুসি। তিনি বোধহয় মিঃ ডেমিরিসের কোম্পানির এক মস্ত বড়ো আধিকারিক। তিনি আমার অতীত জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন, যেসব প্রশ্ন করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে আমাকে লং ড্রাইভে যেতে হয়। আমি একবার উইমকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম। তিনি রাজি হননি।

অ্যালান– আর কিছু কথা?

ক্যাথেরিন–উইম এখন অদ্ভুত আচরণ করছেন।

অ্যালান- গুছিয়ে বলুন তো?

ক্যাথেরিন–সকালে আমি অফিসে আসি। উইম আমার জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি মুখ ফুটে কখনও তার অপেক্ষা করার কথা স্বীকার করেন না। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা রাগে থমথম করতে থাকে। কেন এমন হয় বলুন তো?

অ্যালান– ক্যাথেরিন, আর কোনো স্বপ্ন? বলুন তো?

ক্যাথেরিন–হ্যাঁ, কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নটা অদ্ভুত!

অ্যালান- স্বপ্নের কিছুটা কি আপনার মনে আছে?

ক্যাথেরিন–আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি আমার প্রতি সদয় আচরণ কেন করছেন? তিনি কেন আমাকে এত বড়ো চাকরির দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। থাকার জন্য সুন্দর ফ্ল্যাট দিয়েছেন, কেন আমার হাতে সোনার ওই স্মারকচিহ্নটি তুলে দিয়েছেন?

অ্যালান- উনি কী উত্তর দিয়েছিলেন?

ক্যাথেরিন– আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল।

ডঃ অ্যালান হ্যামিল্টন কথোপকথনের এই পত্রটা ভালোভাবে পড়লেন। কোথাও কোথাও দাগ দিলেন। আহা, অবচেতন মনের উদ্ভাস। একটা সুত্র পাওয়া যাচ্ছে কী? কেন ক্যাথেরিনের মন এত চঞ্চল? ওই তিনজনের মধ্যে কি তার সম্ভাব্য আততায়ী লুকিয়ে আছেন? উইম এই নাটকে কোন ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন? নাকি সবই ক্যাথেরিনের মনের কল্পনা। উইমের আচরণের মধ্যে কি মানসিক প্রতিবন্ধকতার ছাপ রয়েছে। সব কিছু খতিয়ে দেখতে হবে। উইমের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অ্যালান ভাবলেন। একদিন তার সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার।

অ্যালান বসে বসে ক্যাথেরিনের কথা চিন্তা করছেন। তিনি কখনও কোনো পেশেন্টের সাথে আবেগসঞ্জাত আচরণ করেন না। ক্যাথেরিনের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। ক্যাথেরিন সত্যিই সুন্দরী, দারুণ ঐশ্বর্যশালিনী, তাকে আমি কীভাবে সাহায্য করব? আরও একটু বেশি সহযোগিতা? কোনো একটা ব্যাপারে মনস্থির করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

.

ক্যাথেরিনের মনেও অ্যালান হ্যামিল্টনের ছবি। আমি কী বোকা? ক্যাথেরিন ভাবল, উনি একজন বিবাহিত পুরুষ। সব পেশেন্টরা এমন ব্যবহার করলে কী করে হবে? ক্যাথেরিন কিন্তু মনের আবেগ চেপে রাখতে পারছে না। আর একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত।

দুদিন বাদে অ্যালানের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ক্যাথেরিন ভাবল। আমি যদি এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করে দিই? পরক্ষণেই অন্য চিন্তা। নাঃ, এখন আর তা করার উপায় নেই।

.

সকালবেলা, সেদিনই বিকেলে অ্যালানের সঙ্গে দেখা হবে, ক্যাথেরিন সুন্দরভাবে সাজল। অনেকদিন বাদে বিউটি পার্লারে গেল। আঃ, কতক্ষণ তাকে দেখিনি আমি। ক্যাথেরিন মনকে বোঝাবার চেষ্টা করল। নিজেকে সাজানো কি অন্যায়? অপরাধ প্রবণতা? না, তা কেন হবে!

ক্যাথেরিন অ্যালানের অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার মন ভাঙতে শুরু করেছে। উনি কি আমাকে তারিফ করবেন? ওঁনার বিয়ের আগে কেন যে দেখা হল না, কেন? কেন? আমি তো একজন সাধারণ রমণী। ভালো পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে তো চাইবই। আমি তো এক তৃষিত রমণী। আঃ, অনেক ভাবনা আসছে মনের মধ্যে।

–আমি কি আসব?

ক্যাথেরিন বুঝতে পারল, সে একটু জোরে কথা বলে ফেলেছে। এটাই বোধহয় তার শেষতম সাক্ষাৎকার।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল–অ্যালান, একটা ফাটোগ্রাফের দিকে তাকাল, কফিটেবিলের ওপর পড়ে আছে, কতদিন আগে আপনার বিয়ে হয়েছে?

ক্যাথেরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে অ্যালান হেসে ফেললেন বিয়ে? ও এই ছবি, আমার বোন আর তার ছোট্ট ছেলে।

ক্যাথেরিনের মনের ভেতর ঝরনার কলতান।

–ওহ, অসাধারণ, এত সুন্দরী মহিলা!

–আপনি কি ঠিক আছেন ক্যাথেরিন?

কির্ক রেনল্ডসের স্মৃতি এখনও ক্যাথেরিনের মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে।

আমি ঠিক নেই, কোনো দিন ঠিক হতে পারব না। ক্যাথেরিন ভাবল। কিন্তু মুখে সেই ভাবনার প্রতিফলন আনল না। সে বলল–আমি ভালো আছি। তা হলে আপনি বিয়ে করেননি?

না।

তুমি কি আজ রাতে আমার সাথে ডিনারে যাবে? তুমি কি আমাকে নিয়ে বিছানাতে শোবে? তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? না, ক্যাথেরিন এই কথাগুলো মনে মনে ভেবেছিল। মুখে বলতে পারেনি।

অ্যালান সন্তর্পণে তার এই রোগিনীটিকে নজর করছিলেন। তিনি বললেন–ক্যাথেরিন, মনে হচ্ছে, আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। আজই আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার।

ক্যাথেরিনের হৃদয় দুলতে শুরু করেছে কেন? আমি কি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছি?

না, এভাবে ভাববেন না। আমার আর আপনার মধ্যে একটা পেশাগত সম্পর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমরা একে অন্যকে উন্মাদের মতো ভালোবাসতে শুরু করেছি। আমি বোধহয় আরও বেশি আবেগসঞ্জাত হয়ে উঠছি।

-হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এটাই আমার খারাপ লাগছে।

–সত্যি আপনাকে না দেখলে আমার ভীষণ মন কেমন করে।

কথাগুলো বলতে পেরে ক্যাথেরিন খুবই খুশি হয়েছে।

আজ কি আপনার হাতে সময় আছে? ডিনারে যাবেন?

বলি-বলি করে শেষপর্যন্ত ক্যাথেরিন কথাটা বলেই ফেলল।

.

তারা একটা ছোট্ট ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে বসে নৈশ আহার সেরেছিল। সোহোতে এই রেস্টুরেন্টটির অবস্থান। খাবারটা খুব একটা ভালো নয়। তাতে কী হয়েছে? তারা পরস্পরকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছে। একে অন্যের অভাব-অভিযোগ বুঝেছে।

ক্যাথেরিন বলেছে–অ্যালান, তুমি তো জানো আমার সম্পর্কে সব কিছু। তোমার অতীত? বলবে না? তুমি কি কখনও বিয়ে করেছিলে?

না, তবে আমি একজনকে কথা দিয়েছিলাম। বলতে পারো আমি তার বাগদত্তা।

তারপর কী হয়েছিল?

–এটা যুদ্ধের সময়। আমরা একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকতাম। চারিদিকে বোমা বিস্ফোরণ। হাসপাতালে কাজ করতে হচ্ছে। একরাতে বাড়ি ফিরে এলাম।

ক্যাথেরিন বুঝতে পারল, মাঝে ভয়ংকর কোনো ঘটনা ঘটে গেছে।

বাড়িটা একেবারে বিধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কোনো কিছুই ছিল না।

সে অ্যালানের হাতে হাত রাখল। বলল–আমি দুঃখিত।

অনেকদিন পরে আমি শোকটাকে ভুলতে পেরেছি। তাই আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না।

অ্যালান চোখ নামালেন। মনে মনে বললেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত, কিন্তু এখন আমি আমার মনকে পালটাতে পেরেছি।

চার ঘণ্টা তারা সেখানে বসেছিল। সব বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেছিল। থিয়েটার থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, পৃথিবীর অবস্থা। আসল কথা কিন্তু বলা হয়নি, আহা, মাঝে এত বড়ো বাধা? তারা বুঝতে পেরেছে। শেষ অব্দি তাদের মধ্যে জেগেছে এক ধরনের যৌন উত্তেজনা।

অ্যালান আসল বিষয়টাতে এসে গেলেন ক্যাথেরিন, আজ সকালে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তোমার সাথে, ডাক্তার এবং পেশেন্টের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত।

-না, এখানে বসে শুনব না। আমি এখনই তোমার সাথে ফ্ল্যাটে যাব। বাকি কথা সেখানে হবে।

.

তারা একসঙ্গে পোশাক খুলে ফেলল। দ্রুত এবং উৎসুক চিত্তে। ক্যাথেরিন যখন তার পোশাক খুলছিল, ভাবছিল, কির্ক রেনল্ডসের সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তগুলোর কথা। এখন সব কিছু পালটে গেছে। প্রতিটি ভালোবাসার মধ্যে নতুন কবিতা লেখা হয় কি? ক্যাথেরিন আর একবার ভাবল। এখন আমি এই মানুষটিকে উন্মাদের মতো ভালোবাসছি।

সে উলঙ্গ হয়ে বিছানাতে শুয়ে আছে। ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে।

অ্যালান এসে দাঁড়ালেন, আহা, একটি দৃঢ় আলিঙ্গন। সব দুর্দশা কোথায় হারিয়ে গেল। মৃত্যুর উন্মাদনা, মনে হল, না, কেউ আর কখনও আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা একে অন্যকে আঘাত করল। ভালোবাসার আদর। প্রথমে আস্তে-আস্তে। তারপর বন্য উন্মত্ততায়। শেষ অব্দি তারা আরণ্যক এবং ভয়ংকর হয়ে উঠল। দুটো শরীর মিলেমিশে একাকার। ক্যাথেরিনের মুখ থেকে শিৎকারের শব্দ, খুশির উন্মাদনা। আমি আবার পরিপূর্ণ নারী হলাম। সে ভাবল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

সেখানে তারা অনেকক্ষণ শুয়েছিল। ক্যাথেরিন অ্যালানকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিছুতেই সে অ্যালানকে ছাড়বে না। না, পৃথিবীর সবথেকে মহার্ঘ্য বস্তু হাতে পেলেও নয়।

অবশেষে সে কথা বলল, তার কণ্ঠস্বর কেমন ভেঙে গেছে। সে বলল–ডাক্তার, এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, কীভাবে একজন পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করতে হয়।

.

২৮.

কনস্টনটিন ডেমিরিসের গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা পৌঁছে গেছে ক্যাথেরিনের কানে। খবরের কাগজে হেডলাইন। আচমকা আঘাত। ক্যাথেরিন তখন অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সবকিছু কেমন ধূসর হয়ে গেল।

ইভলিন গুঙিয়ে উঠলেন- খবরটা শুনেছ? এখন আমরা কী করব?

–আমরা কাজ চালিয়ে যাব। মনে হচ্ছে, কোথাও একটা মস্ত বড়ো ভুল হয়েছে। আমি ওঁনার সাথে টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করব।

কিন্তু কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে আর পাওয়া গেল না।

.

এথেন্সের সেন্ট্রাল প্রিজনে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস হলেন সবথেকে দামি বন্দি। তাঁর মতন নামি-দামি কেউ এর আগে ওখানে বন্দি হিসেবে আসেননি। প্রসিকিউটর বলেছেন, ডেমিরিস যেসব বিশেষ জিনিস চেয়েছেন, টেলিফোন করার অধিকার, টেলেক্স মেশিন, কুরিয়ার সার্ভিস, তার এই অনুরোধগুলো রাখা হয়নি।

ডেমিরিস বেশির ভাগ সময় জেগে কাটান। তাঁর সব স্বপ্ন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মেলিনাকে তিনি হত্যা করেননি, কিন্তু হত্যার ঘটনাটা ঘটল কী করে?

প্রথম দিকে ডেমিরিস ভেবেছিলেন, একদল ছিঁচকে চোর ওই ভিলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই চোরগুলোকে মেলিনাই বোধহয় ভাড়া করেছিল। তারা সবকিছু তছনছ করেছে। তারাই মেলিনাকে হত্যা করেছে। কিন্তু যখন পুলিশ বলল, সাক্ষ্যপ্রমাণ তার বিরুদ্ধে গেছে, ডেমিরিস বুঝতে পারলেন, এটা একটা ষড়যন্ত্র। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা কে করেছে? স্পাইরস লামব্রোর নামটাই প্রথমে মনে পড়ছে। তবে এই ভাবনার একটা দুর্বলতর জায়গা আছে। লামব্রো তার বোনকে ভালোবাসে একথা সত্যি। পৃথিবীতে আর

কোনো বস্তুকে সে এতখানি ভালোবাসে না। সেই বোনের এত বড়ো ক্ষতি সে কখনোই করবে না। তার মানে এই প্রকল্পনাটা টিকছে না।

ডেমিরিস এবার টনি রিজোলির কথা ভাবলেন। টনির মস্তানবাহিনী কি শেষপর্যন্ত প্রতিশোধ নিল? তারা জানে রিজোলির হত্যাকাণ্ডের আন্তরালে কে আছে? তারা বোধহয় এভাবেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস এই ভাবনাটাও মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। মাফিয়া গুণ্ডারা যদি প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবত, তারা তাকেই পৃথিবী থেকে সরাত। এত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা করত না।

তাহলে? ছোট্ট সেলের মধ্যে বসে ডেমিরিস নানা কথা ভাবতে থাকেন। অঙ্কের একটা ধাঁধা- ইচ্ছে করেই খেলছেন তিনি। কী হতে পারে তিনি জানেন না। শেষ অব্দি আশাহত হয়ে উঠলেন। একটি মাত্র উপসংহার পড়ে আছে মেলিনা আত্মহত্যা করেছে। নিজেকে নিজেই হত্যা করেছে সে। তার আগে একটা সুন্দর প্লট সাজিয়েছে। ডেমিরিস ভাবলেন, এখন নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের মতো অবস্থা। এখন ব্যাপারটা ঘুরে গেছে। একই জায়গায় তাকে থাকতে হচ্ছে। তাকে এমন একটি হত্যার জন্য অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে, যে হত্যাকাণ্ড তিনি কখনও করেননি। ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস!

.

জেলারকে দেখা গেল সেল দরজার সামনে আপনার আইনজ্ঞ এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

ডেমিরিস উঠে দাঁড়ালেন। জেলারের সঙ্গে বাইরে এলেন। ছোট্ট আলোচনা কক্ষ। আইনজ্ঞ বসেছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ভাসিলিকি। মধ্য পঞ্চাশ। মাথায় ঘন ঝোঁপের মতো ধূসর রঙের চুল। মুভি স্টারের মতো চেহারাটা। তিনি নাকি নাম করা ক্রিমিনাল অ্যার্টনি। আমার কেসে কতটা সাহয্য করবেন?

জেলার বললেন–আপনাকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে।

তিনি চলে গেলেন। আইনজ্ঞ এবং সম্ভাব্য অপরাধী ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

ডেমিরিস বললেন–আপনি আমার কাছ থেকে কী তথ্য শুনতে চাইছেন? বলুন আপনাকে কত টাকা দিতে হবে?

–মিঃ ডেমিরি, ব্যাপারটা খুব একটা সোজা নয়। চিফ প্রসিকিউটর কিন্তু এতে রাজি হননি।

চিফ প্রসিকিউটরের মাথাটা মোটা। ওরা আমাকে কিছুতেই এখানে আটকে রাখতে পারবে না। জামিনের কী হল? আমি জিজ্ঞাসা করছি, কত টাকা লাগবে?

ভাসিলিকি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। বললেন–জামিন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। পুলিশের । কাছে পরিষ্কার প্রমাণ আছে। মিঃ ডেমিরিস, আপনি ব্যাপারটা অত সহজ ভাববেন না।

–আমি মেলিনাকে হত্যা করিনি। আমি অসহায়। অ্যাটর্নি আমতা আমতা করতে থাকেন– হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে কেউ তো হত্যা করেছে।

–কেউ না। আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

অ্যাটর্নি তাকালেন–আমায় ক্ষমা করবেন মিঃ ডেমিরিস। মনে হয় না এই ব্যাপারটা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করুন। এমন একটা তথ্য, যার সাহায্যে হয়তো শেষপর্যন্ত বাঁচতে পারবেন। আপনার এই তথ্যটা খুবই দুর্বল।

হৃদয় কাঁপতে শুরু করেছে। ডেমিরিস জানেন, অ্যাটর্নির কথাই সঠিক। পৃথিবীর কোনো জুরি এই বানানো গল্পটা বিশ্বাস করবে না। তাহলে উপায়?

.

পরের দিন সকালবেলা, অ্যাটর্নি আবার এসেছেন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

–আপনার জন্য একটা খারাপ খবর আছে।

ডেমিরিস হাসলেন। সেই হাসিতে বিষণ্ণতার চিহ্ন মাখা আছে। তিনি একটা জেলখানায় বন্দি, মৃত্যুদণ্ড শোনার জন্য অপেক্ষা করেছেন, আর এই মাথামোটা অ্যাটর্নিটা বলছেন, আরও খারাপ খবর? এর থেকে খারাপ খবর আর কী হতে পারে?

-বলুন?

–এটা আপনার শালাবাবু সম্পর্কে।

স্পাইরস? কী হয়েছে?

–আমার কাছে খবর আছে, উনি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছেন। উনি ক্যাথেরিন ডগলাস নামে এক ভদ্রমহিলার কথা বলেছেন। ওই মহিলা নাকি বেঁচে আছেন। আমি জানি না, নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের বিচারে ঠিক কী হয়েছিল। তবে বুঝতে পারছি, ক্যাথেরিনকে হত্যা করার অপরাধে তাদের ফাঁসি হয়েছিল।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস আর শুনতে পারছেন না। সব ব্যাপার তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। ক্যাথেরিনকে তিনি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন। যদি ক্যাথেরিনকে খুঁজে পাওয়া যায়, আর ক্যাথেরিন মুখ খুলতে শুরু করে। তাহলে কী হবে? তাহলে নোয়েলে এবং ল্যারিকে হত্যা করার অপরাধে আবার অভিযুক্ত করা হবে আমাকে আঃ, লন্ডনে এখন আছে ক্যাথেরিন। তার সঙ্গে দেখা করাটা খুবই দরকার।

তিনি ঝুঁকলেন, অ্যাটর্নির হাত ধরলেন।

লন্ডনে একটা খবর পাঠাতে হবে, এখুনি।

.

খবরটা দুবার পড়লেন। প্রথম দিকটা আর একটু ভালো করলে ভালো হত। আঃ, ঈশ্বর, ঘটনাটা তাড়াতাড়ি ঘটাতেই হবে। অসীম ক্ষমতা একদিন আমার হাতে ছিল। এখন আমি সবকিছু হারিয়েছি। শেষ অব্দি? শেষ অব্দি খবরটা যাবে তো? যা কিছু করতে হবে আজ রাতের মধ্যে। ব্যাপারটা সুন্দর করে সাজাতে হবে। দেহের কোনো চিহ্ন যেন না থাকে। যা কিছু করতে হবে, আজ রাতের মধ্যে।

.

২৯.

কনফিডেনশিয়াল ফাইল—

উইম ভ্যানডিলের সঙ্গে কথোপকথনের সারাংশঃ

অ্যালান- আজ আপনি কেমন আছেন?

উইম–আমি ভালোই আছি ডাক্তার। আমি ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসেছি। ড্রাইভারের নাম রোনাল্ড ক্রিস্টি, লাইসেন্সের প্লেট ৩২৭১। ট্যাক্সি সার্টিফিকেট নাম্বার ৩৭। আমরা ৩৭টি রোভার পার করেছি। একটা বেন্টলে, দশটা জাগুয়ার, ছটা অস্টিন, একটা রোলস রয়েস, ২৭টি মোটর সাইকেল, ছটা বাইসাইকেল।

অ্যালান–আপনি কেন এখানে এসেছেন জানেন কি?

উইম–আপনি জানেন।

অ্যালান– আমাকে বলুন তো?

উইম- আমি সব মানুষকে ঘেন্না করি।

অ্যালান– ক্যাথেরিন আলেকজান্ডার সম্পর্কে আপনার কী মত? উইম, বলুন, কথা বলুন?

উইম–ওখানে তিনি আর কাজ করতে পারবেন না।

অ্যালান- আপনি কী করে জানলেন?

উইম- তাকে হত্যা করা হবে।

অ্যালান–কে আপনাকে একথা বলেছে?

উইম- উনি আমাকে বলেছেন।

অ্যালান– ক্যাথেরিন বলেছে, তাকে হত্যা করা হবে?

উইম- না, অন্য একজন।

অ্যালান– কে সেই লোক?

উইম–একজনের স্ত্রী।

অ্যালান–কার স্ত্রী, উইম?

উইম–কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের।

অ্যালান–ক্যাথেরিন আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হবে, এটা ডেমিরিস নিজে বলেছেন?

উইম- না, শ্রীমতী ডেমিরিস, ওঁনার স্ত্রী, গ্রিস থেকে ফোন করেছিলেন।

অ্যালান- কে ক্যাথরিনকে হত্যা করবে?

উইম- কেউ একজন।

অ্যালান– তার মানে যাঁরা এথেন্স থেকে এখানে এসেছেন?

উইম- হ্যাঁ।

অ্যালান– আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ হল। আমাকে এখনই যেতে হবে।

উইম–ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

.

৩০.

হেলেনিক ট্রেড করপোরেশনের অফিস ছটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। ছটা বাজার কিছুক্ষণ বাকি আছে। ইভলিন এবং আর সকলে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন।

ইভলিন ক্যাথেরিনের অফিসের দিকে হেঁটে গেলেন। প্রশ্ন করলেন–মিরাকল অন থার্টিফোর স্ট্রিট দেখতে যাবে নাকি? ক্রাইটেরিয়নে এই নাটকটা হচ্ছে। রিভিউ করেছে। আজ রাতে তুমি ফাঁকা আছো?

ক্যাথেরিন জবাব দিল না, আমি পারব না। ইভলিন, জেরি হ্যালিকে কথা দেওয়া আছে, আজ তার সঙ্গে থিয়েটারে যেতেই হবে।

–ওঁরা সব সময় তোমাকে ব্যস্ত রাখেন, তাই তো? ঠিক আছে, ভালো থেকো, কেমন?

.

ক্যাথেরিন শুনতে পেল, একে একে সকলে অফিস থেকে চলে যাচ্ছে। আহা, এখন এখানে শুধু নৈঃশব্দ্য। সে শেষবারের মতো তার ডেস্কের দিকে তাকাল। সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো? কোট পরে নিল। পার্সটা হাতে নিল। ধীর পদক্ষেপে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোনের আর্তনাদ। ক্যাথেরিন চিন্তা করল, এখন ফোনে উত্তর দেওয়া উচিত হবে কি? ঘড়ির দিকে তাকাল, এখনই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। টেলিফোনটা চিৎকার করছে। সে ছুটে এল। রিসিভার তুলে বলল–হ্যালো।

ক্যাথেরিন, অ্যালান হ্যামিল্টনের গলা। নিশ্বাসের শব্দ, হায় ঈশ্বর, শেষপর্যন্ত তোমাকে ধরতে পেরেছি।

কিছু হয়েছে কি?

–তোমার জীবন এখন দারুণ সংশয়ের মধ্যে। কেউ তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।

ক্যাথেরিন গোঙানির শব্দ করল, সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটা আবার তাকে তাড়া করছে। সে জানতে চাইল, কে?

–আমি ঠিক জানি না। তুমি যেখানে আছে সেখানেই থাকো। অফিস ছেড়ে কোথাও যেও না। কারও সঙ্গে কথা বলো না। আমি এখুনি আসছি।

–অ্যালান...

–না, ভয় পেও না। আমি রাস্তায় আছি। নিজেকে বন্ধ করে রাখো। আমি গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

লাইনটা কেটে গেল।

ক্যাথেরিন রিসিভারটা রেখে দিল- ওঃ হায় ঈশ্বর!

আটানসকে দরজার সামনে দেখা গেল। সে ক্যাথেরিনের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাল। বলল–ম্যাডাম, কিছু হয়েছে কি?

ক্যাথেরিনের কণ্ঠস্বরে ভয়–কেউ আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।

ছেলেটি বলল–কে? কেন?

–আমি ঠিক জানি না।

সামনের দরজায় শব্দ পাওয়া গেল।

আটানস ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে বলল–আমি কি দরজা খুলব?

ক্যাথেরিন বলল–না, কাউকে ঢুকতে দিও না। ডাক্তার হ্যামিল্টন আসছেন।

আবার আবার জোরে জোরে শব্দ হল।

আটানস ফিসফিসিয়ে বলল–ইচ্ছে করলে আপনি বেসমেন্টে লুকোতে পারেন।

ক্যাথেরিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল–তুমি ঠিকই বলেছ।

তারা পেছনের করিডরে চলে গেল। এখানে একটা পথ আছে বেসমেন্টের দিকে।

ডাক্তার হ্যামিল্টন এলে বলল, ততক্ষণ আমি ওখানে আছি।

–এখানে লাফিয়ে পড়তে আপনি ভয় পাবেন না তো?

না, ক্যাথেরিন জবাব দিল। আটানস আলো দেখাল। বেসমেন্টের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

–কেউ আপনাকে এখানে খুঁজে পাবে না। আটানস বলল, কে বা কারা আপনাকে মারতে চাইছে? আপনি কিছু বলবেন কি?

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মুখখানা মনে পড়ে গেল। দুঃস্বপ্ন আবার তাকে তাড়া করল। দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখেছি, ডেমিরিস আমাকে মারতে চাইছেন।

কিন্তু এটা তো একটা স্বপ্ন।

ক্যাথেরিন বলল–আমি জানি না।

আটানস তাকাল তার দিকে আমি জানি।

ক্যাথেরিন বলল–কী?

–আমি। দেখা গেল তার হাতে একটা ব্লেড রয়েছে। সে ধীরে ধীরে সেই ব্লেডটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

–আটানস, ক্যাথেরিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, এখন ছেলেমানুষি কোরো না।

ক্যাথেরিনের মনে হল, কেউ বোধহয় একটা ছুরি তার ভেতর চালিয়ে দিয়েছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা ছবিটা দেখেছেন ক্যাথেরিন? হয়তো দেখার সুযোগ পাননি। কেউ একজন মৃত্যুর কাছ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। সে সামারার কাছে চলে যায়। সে জানত না, সামারার কাছেই মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আমি হলাম আপনার সামারা, ক্যাথেরিন।

ওফ, এই শব্দগুলো শুনতে ভালো লাগছে না, এই বোকা বোকা মুখের ছেলেটি এমন সাজিয়ে কথা বলতে পারে?

–আটানস, প্লিজ, এমন আচরণ কোরো না।...

সে একটা চড় মেরে দিল ক্যাথেরিনের মুখের ওপর।

–আমি এটা করতে পারি, কারণ আমি কিশোর নই। আমি কি আপনাকে অবাক করে দিয়েছি? হ্যাঁ, আমি খুব ভালো অভিনেতা। আমার তিরিশ বছর বয়স। কেন আমার চেহারাটা এমন, আপনি জানেন কি? যখন আমি বড়ো হয়ে উঠেছিলাম, দুবেলা দুমুঠো খাবার পাইনি। রাস্তায় শুয়ে দিন কাটিয়েছি। লোকে যা ফেলে দিয়েছে, তাই খেয়েছি।

এখনও ছুরিটা তার হাতে ধরা আছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। ক্যাথেরিন পিছোতে পিছোতে দেওয়ালের কাছে চলে গেছে।

যখন আমি এক কিশোর ছিলাম, আমি দেখেছি, সৈন্যরা এসে আমার মাকে ধর্ষণ করেছে। আমার মা আর বাবা- দুজনকেই তারা মেরে ফেলে। তারপর? তারা আমাকে ধর্ষণ করে। আমাকে মরা ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়। আটানস আরও সামনে এগিয়ে বেসমেন্টের মধ্যে।

–আটানস, আমি তো কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিনি। তুমি কেন এভাবে আমাকে আঘাত করছ?

আটানস হাসল, সেই হাসি সরলতায় ভরা ম্যাডাম, এখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু নেই। এটা একটা ব্যবসা। আপনার জীবনের দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার। কিন্তু জীবন নয়, আপনার মৃত্যু। আপনাকে হত্যা করলে এই টাকাটা আমার হাতে আসবে।

পর্দাটা এবার উঠে যাচ্ছে। ক্যাথেরিন সবকিছু দেখতে পাচ্ছে, লাল আলোর মধ্যে। তার সমস্ত পৃথিবী এখন অন্ধকার। একটু বাদে কী ঘটবে সে জানে।

–এটা একটা সুন্দর পরিকল্পনা। কিন্তু আর সময় নেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। খেলাটা এখানেই শেষ করা দরকার।

ক্যাথেরিন বুঝতে পারল, এই ছুরিটা এবার তার গলার ভেতর ঢুকে পড়েছে। কিন্তু, ছেলেটি ছুরি সরিয়ে নিয়েছে। তার পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে।

সে বলল–সুন্দর, খুবই সুন্দর! এসো, আগে একটু মিলনের দৃশ্য অভিনীত হোক। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। একটু বাদে আবার তোমার ওই প্রেমিকটা এসে পড়বে। তাই তো? আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। তুমি কি তা বুঝতে পারো সুন্দরী?

ক্যাথেরিন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সে বোধহয় আর নিশ্বাস নিতে পারছে না।

আটানস তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা বোতল বের করল। ঘন তরল, গোলাপী রঙের।

–তুমি কি কখনও স্লিভভাভিক খেয়েছ? আহা, তোমার মৃত্যু উপলক্ষে আজ আমি এটা পান করব।

সে ছুরি দিয়ে বোতলটা খুলে ফেলল। ক্যাথেরিন পালাতে চেয়েছিল।

আটানস শান্তভাবে বলল–চেষ্টা করো, কোথাও যেতে পারবে না।

ক্যাথেরিন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল–আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাকে টাকা দেব।

চুপ করো! আটানস ঝপ করে খানিকটা মদ তার গলায় ঢালল। বোতলটা ক্যাথেরিনের হাতে দিল, খেয়ে নাও, জীবনের শেষ খাওয়া।

-না, আমি খাব না।

–তোমাকে খেতেই হবে।

আদেশ করছ।

ক্যাথেরিন বোতলটা নিল। একটুখানি খেল। আঃ, এই ব্রান্ডি বোধহয় তার দেহ জ্বালিয়ে দেবে। আটানস বোতলটা ফেরত নিল। অনেকটা খেয়ে ফেলল।

ডাক্তারকে কে বলেছে? কে বলেছে তোমাকে মেরে ফেলা হবে?

–আমি জানি না।

–তবে জানলেও কিছু আসে যায় না। আটানস এবার সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছে। একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি দেখিয়ে বলেছে ওখানে চলে যাও।

ক্যাথেরিন ইচ্ছুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, মৃত্যু এসে গেছে। সে বলল তুমি এভাবে আমাকে মেরে ফেলবে?

আটানস চিৎকার করে উঠল তুমি আমাকে একদম প্রভাবিত করার চেষ্টা কোরো না।

ক্যাথেরিন কাঠের থামের আড়ালে চলে গেল।

বাঃ, এই তো আমার খুকুমণি। আটানস বলল, এবার ওখানে চুপটি করে বসো। সে এক মুহূর্ত ক্যাথেরিনের দিকে তাকাল এবার বোধহয় সব কিছুর অবসান হয়ে যাবে।

এবার কি ক্যাথেরিন ছুটে পালাবে, সিঁড়ি ধরে? বুকের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছে সে। জীবনের জন্য তাকে এই কাজটা করতেই হবে। সে প্রথম সিঁড়িতে পা রাখল। দ্বিতীয় সিঁড়িতে। যখন সে চলে যাবে, কে যেন তাকে ল্যাং মেরেছে। সে পড়ে গেছে। না, নোকটাকে দেখতে ছোটোখাটো, কিন্তু পায়ে অসীম শক্তি ধরে।

কুকুরির বাচ্চা! এবার চুলের মুঠি ধরে সে তাকে টানল। তার মুখটা মেঝের সঙ্গে ঘষে দিয়েছে। তুই আবার এটা করার চেষ্টা কর, আমি তোর দুটো পা ভেঙে দেব।

আবার ক্যাথেরিন বুঝতে পারল, ছুরিটা তার শরীরের সাথে আটকে রয়েছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চল, ওই থামের কাছে গিয়ে দাঁড়া।

আটানস তাকে থামের কাঠের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। বলল–এখানেই থাক।

.

ক্যাথেরিন সব কিছু তাকিয়ে দেখছিল। আটানস কার্ডবোর্ড বাক্সের ওপর হেঁটে চলেছে। সে একটা দড়ি দুভাবে ভাগ করল। আরও ভালোভাবে তাকে বেঁধে ফেলল। শেষবারের মতো ক্যাথেরিন প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তার এই ভিক্ষা রাখা হয়নি।

সে বলেছিল- আটানস, এভাবে আমাকে কষ্ট দেবে?

আটানস চড় কষিয়ে দিল ক্যাথেরিনের মুখের ওপর। আহা, কী তীব্র যন্ত্রণা।

ফিসফিসিয়ে সে বলল–আমার কথার অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমি বলেছি ততা, খুন করার আগে তোকে ধর্ষণ করব। তারপর...

ছেলেটি হাসছে। ছেলে, না যুবক কী নামে তাকে ডাকব! ক্যাথেরিনের হাত-পা শক্ত করে বাধা। সে বুঝতে পারল, এই বাঁধন সহজে খুলবে না। তার মনে হল রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

সে বলল–একটু-একটু আলগা করবে?

লোকটা গুঙিয়ে উঠেছে- ঠিক আছে। সে সামান্য আলগা করল। কিন্তু পা দুটো বেঁধে দিয়েছে। বলল, এখানে আমরা থাকব। আহা, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। আর একটু মদ গিলে ফেলল সে। আধ ফাঁকা বোতলটা ক্যাথেরিনের হাতে তুলে দিল- তুমি একটু খাবে নাকি, সুন্দরী?

ক্যাথেরিন মাথা নাড়ল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল–ঠিক আছে।

ক্যাথেরিন সভয়ে দেখল, আরও কিছু মদ সে গিলে ফেলেছে। আহা, মদ গিলে সে যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে কেমন হয়? বেঁচে থাকার এটাই বোধহয় শেষ রাস্তা।

আটানস বলল–আমি রোজ প্রচুর মদ খাই। আমার কিছু হবে না। ফাঁকা বোতলটা সে সিমেন্টের মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিল। ঠিক আছে, এবার আসল কাজটা শুরু হোক।

-তুমি কী করতে চাইছ?

আমি একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটাব। ব্যাপারটা সুন্দর করে সাজানো হবে। তাহলে হয়তো ডেমিরিসের কাছ থেকে আমি দ্বিগুণ টাকা পাব।

ডেমিরিস? তাহলে এটা স্বপ্ন নয়! সমস্ত ঘটনার অন্তরালে ওই কুৎসিত মানুষটা বসে আছেন? কিন্তু কেন?

ক্যাথেরিন দেখতে পেল, আটানস বয়লার ঘরের দিকে এগিয়ে গেছে। সে বাইরের প্লেট সরিয়ে দিয়েছে। পাইলট লাইটটা ভালোভাবে দেখছে। আটটা বয়লার প্লেট সেখানে আছে। প্রত্যেকটিই গরম। সেফটিভাটা একটা মেটাল ফ্রেমের ওপর বসানো আছে। আটানস একটা ছোট্ট কাঠের টুকরো তুলে নিল। সেফটি ভালটাকে থামিয়ে দিল। ১৫০ ডিগ্রি। ক্যাথেরিন দেখতে পেল, আটানস ডায়ালটাকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেছে। এবার সে ক্যাথেরিনের কাছে ফিরে এল।

-বুঝতে পারছ, এই ফার্নেসে কী আছে? গনগনে আগুন। এটাকে খুলে দিলে কী হবে?

সে ক্যাথেরিনের আরও কাছে এগিয়ে গেল।

যখন এই ডায়ালটা ৪০০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে, বয়লারটা নিজেই বিস্ফোরিত হবে। তুমি বুঝতে পারছ কী হবে? গ্যাস লাইনগুলো ভেঙে পড়বে। বার্নার প্লেটগুলো চারদিকে ছিটকে যাবে। গোটা বাড়িটা বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হবে।

–তুমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এই বাড়িতে অনেক সাধারণ অসহায় মানুষ থাকে, তাদের এইভাবে মেরে ফেলবে?

–পৃথিবীতে কোনো অসহায় মানুষ নেই। তোমরা, আমেরিকানরা একথা বলো। তোমরা সব গল্পের একটা সুখী শেষ দেখতে চাও। তোমরা বোকা, পৃথিবীতে কোনো গল্পেই সুখী সমাপ্তি হয় কি?

সে নীচে নেমে এল। দড়িটা ভালোভাবে পরীক্ষা করছে। ক্যাথেরিনকে পোস্টের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। আঃ, কবজি দিয়ে রক্ত ঝরছে। দড়ি বোধহয় তার মাংস কেটে শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আটানস ক্যাথেরিনের নগ্নবুকের ওপর হাত রাখল। বৃন্ত নিয়ে ছেলেখেলা । খেলল। তারপর মুখে চুমু দিল।

–আহা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তুমি কি জানতে তোমাকে আমি কত ভালোবাসতাম।

সে ক্যাথেরিনের সোনালি চুল দু হাতে সরিয়ে দিল। ওপর ঠোঁটে চুমু খেল। তার নিশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে। সে বলল বরাবরের জন্য বিদায় ক্যাথেরিন।

আটানস উঠে দাঁড়াল। ক্যাথেরিন চিৎকার করছে আমাকে এভাবে একা ছেড়ে যেও না।

–আমাকে এখুনি যেতে হবে, প্লেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি এথেন্সে চলে যাব।

অসহায়ের মতো ক্যাথেরিন তাকিয়ে থাকল চলে যাচ্ছে, ওই দস্যুটা চলে যাচ্ছে।

–তুমি ঘড়ি দেখবে, তাহলে আমি কিছু আলোর ব্যবস্থা করতাম। এটা তোমার জানা দরকার।

এক মুহূর্ত কেটে গেছে। ক্যাথেরিন শুনতে পেল বেসমেন্টের দরজা বন্ধ করার শব্দ। তাহলে? এখন শুধু নীরব প্রতীক্ষা। নৈঃশব্দ্যের জগৎ। ক্যাথেরিন সেখানে একা। সে

বয়লারের ডায়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে তা ওপরে উঠছে। ক্যাথেরিনের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠছে। ১৬০ ডিগ্রি থেকে ১৭০ ডিগ্রি। ক্যাথেরিন ছটফট করছে। যতই চেষ্টা করছে, দড়িগুলো ততই তাকে আরও জোরে–আরও জোরে বেঁধে ফেলছে। সে চারদিকে তাকাল। ডায়াল ১৮০ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে।, জীবনের বিন্দুমাত্র আশা নেই। এই পৃথিবীতে কেউ নেই, যে তাকে সাহায্য করবে।

.

অ্যালান হ্যামিল্টন উন্মাদের মতো ছুটে আসছেন, উইমপোল স্ট্রিটের ওপর দিয়ে। ট্রাফিকের বাধা মানছেন না। আঃ, ড্রাইভারদের হর্নের ধ্বনি, কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। রাস্তাটা বন্ধ কেন? তিনি বাঁদিকে ঢুকে পড়লেন। পোর্টল্যান্ড প্লেস, অক্সফোর্ড সাকাস। নাঃ, এখানেও ট্রাফিকের বড় বাড়াবাড়ি।

.

ওদিকে ২১৭ বন্ড স্ট্রিট। বয়লার ২০০ ডিগ্রিতে পোঁছে গেছে। বেসমেন্ট আরও গরু হয়ে উঠেছে।

ট্রাফিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষজন চিৎকার করছে। কেউ বাড়ি ফিরবে। কেউ ডিনারের আসরে যোগ দেবে। কেউ থিয়েটার দেখতে যাবে। অ্যালান হ্যামিল্টন তার গাড়িতে বসে আছেন। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। আমি কি পুলিশকে ডাকব? কিন্তু পুলিশ কীভাবে সাহায্য করবে? আমি বলব, আমার এক নিওরোটিক পেশেন্ট বলেছে, তাকে হত্যা করা

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হবে? পুলিশ আমার কথা শুনে হেসে উঠবে। না, এখুনি ওর কাছে পৌঁছোতে হবে। ট্রাফিক আবার চলতে শুরু করেছে।

.

বেসমেন্টে তখন নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। তিনশোতে সূচক পৌঁছে গেছে। ঘরটা অসম্ভব গরম। ক্যাথেরিন চেষ্টা করছে, নিজেকে মুক্ত করার। না, কিছুতেই পারছে না সে।

অ্যালান অক্সফোর্ড স্ট্রিটে এসে পড়েছেন। পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা রাস্তা পার হচ্ছিলেন। পুলিশের হুইসেলের শব্দ শোনা গেল। এক মুহূর্তের জন্য অ্যালান থমকে দাঁড়ালেন। সাহায্যের জন্য চেষ্টা করলেন। না, এখন তাকে যেতেই হবে।

মস্ত বড়ো একটা ট্রাক সামনে দিয়ে চলেছে। পুরো রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। অ্যালান, হ্যামিল্টনকে অসহায় মনে হল। তিনি বললেন, একটু তাড়াতাড়ি ভাই।

ট্রাক ড্রাইভার তার দিকে তাকালেন–কী হয়েছে? তুমি কি আগুন জ্বালাতে যাচ্ছো, না নেভাতে?

আবার ট্রাফিক বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ট্রাফিক পরিষ্কার হল। অ্যালান হ্যামিল্টন অতি দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করেছেন। বন্ড স্ট্রিট পার হলেন।

.

বেসমেন্টের তাপমাত্রা চারশো ডিগ্রিতে উঠে গেছে।

.

শেষ পর্যন্ত বাড়িটা দেখা গেল। অ্যালান হ্যামিল্টন দেখতে পেলেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আঃ, কেউ কি আছে কোথাও? এত গন্ধ কীসের? মনে হল, গোটা বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশাল বোমা দিয়ে সেটাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাতাসে মৃত্যুর ইশারা। চারপাশে হৈ-হট্টগোল।

এখানে এখানে শুধুই ধ্বংস আর বীভৎস বিভীষিকা।

.

৩১.

আটানসকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা ভীষণ ভালো কাজ সে শেষ করেছে। শেষ অব্দি কাজটা ভালোভাবেই করেছে। আহা, সবসময় সে তার শিকারের সাথে যৌনতার খেলা খেলে, পুরুষ অথবা নারী, বাছবিচার করে না। তারপর হত্যা করে। জীবনে উত্তেজনা পছন্দ করে। এখানে বেশি সময় তার হাতে ছিল না, তাই ক্যাথেরিনকে বেশি অত্যাচার করতে পারেনি। আটানস ঘড়ির দিকে তাকাল। অনেকটা সময় আছে এখনও প্লেনটা আকাশের বুকে উড়তে শুরু করেনি। রাত এগারোটার সময় উড়বে। সে একটা ট্যাক্সি

নিল। শেফার্ড মাকের্টে চলে গেল। ড্রাইভারকে টাকা দিল রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। দু-ধারে শিকারি মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। সকলকে ডাকাডাকি করছে।

–হ্যালো, তুমি কি আমার কাছ থেকে ফরাসি শিখবে নাকি?

–একটা ছোটো পাখি হলে কেমন হয়?

–তুমি কি গ্রিক ভালোবাসো?

কেউ কিন্তু আটানসের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে একটা লম্বা সোনালি চুলের মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল। মেয়েটা ছোট্ট চামড়ার স্কার্ট আর, ব্লাউজ পরেছে। স্টিলেটো হিলের জুতো তার পায়ে।

আটানস শান্তভাবে বলল–শুভ সন্ধ্যা।

মেয়েটি তার দিকে তাকাল- হ্যালো, ছোট্ট খোকা। তোমার মা কি জানে তুমি এখানে এসেছ? মেয়েদের দেখতে?

আটানস হাসল- হা, ম্যাডাম। তুমি কি এখন ব্যস্ত আছো?

বেশ্যা মেয়েটি হেসে ফেলল–না, তুমি কী চাইছ? আমি সবসময় ব্যস্ত থাকি। তুমি কখনও কোনো মেয়ের কাছে এসেছ কী?

আটানস শান্তভাবে বলল–একবার। আমার এটা ভালো লাগে।

বেশ্যাটা খিলখিলিয়ে হাসল। সত্যি? আমি তোমার ওই জিনিসটা দেখতে চাইছি। ওটা কত বড়ো? তোমাদের মতো ছোট্ট ঘোড়াদের আমি ফিরিয়ে দিই। কিন্তু আজ বাজারটা ভালো নয়। তোমার পকেটে পয়সা আছে তো?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম, সেদিকে কোনো সমস্যা নেই।

চলো, তাহলে আমরা ওপরে চলে যাই।

মেয়েটা আটানসকে নিয়ে একটা দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল। কয়েকটা সিঁড়ি, তারপর এক ঘরের এক একটি অ্যাপার্টমেন্ট।

আটানস মেয়েটার হাতে পয়সা তুলে দিল।

–দেখি, ওটা নিয়ে তুমি কীভাবে আমাকে খুশি করতে পারো।

মেয়েটা চটপট ল্যাংটো হচ্ছে। সে দেখল আটানসও তার পোশাক খুলছে। আটানসের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল।

হায় ঈশ্বর! তোমার ওটা তো মস্ত বড়ো!

–ঠিক আছে?

মেয়েটা বিছানাতে শুয়ে পড়ল। বলল–ভাই, আস্তে আস্তে করো। আমার যেন বেশি কষ্ট না হয়।

আটানস বিছানার দিকে এগিয়ে গেছে। সে এইসব বেশ্যাদের নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। বেশ্যাদের শারীরিক আঘাত করে একটা অদ্ভুত যৌন তৃপ্তি পায়। কিন্তু এখন এসব করার সময় নেই। পুলিশ হয়তো এসে যাবে। তাকে তাড়াতাড়ি সব কিছু করতে হবে।

সে বলল–এটা তোমার জীবনের একটা সুন্দর সুখী রাত।

–কী? কী চাইছ তুমি?

–কিছুই না। আটানস মেয়েটার ঘাড়ের ওপর চেপে বসল। চোখ বন্ধ করল। তার মধ্যে নিজের সবটুকু সত্তা ঢুকিয়ে দিল। তাকে আঘাত করল। মনে হল ক্যাথেরিন যেন দয়া ভিক্ষা করছে। সে দয়া করবে না। আঃ, এখানে-সেখানে আঘাত করছে। উত্তেজনা বাড়ছে। উত্তেজনার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে বেশ্যা মেয়েটি। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত বিস্ফোরণটা ঘটল।

–আঃ, মেয়েটি বলল, তোমার সাহচর্য আমার মনে থাকবে।

আটানস চোখ খুলল–কই ক্যাথেরিন কোথায়? সে তো একটা দম বন্ধ করা ঘরে বাজারি মেয়ের সাথে সঙ্গমের খেলায় মেতেছিল। চট করে পোশাকটা পরে নিল। সে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে চলে এল। চটপট এখান থেকে পালাতে হবে।

এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে আটানস। নটা তিরিশ মিনিট। এখনও অনেকটা সময় তার হাতে আছে।

.

অলিম্পিক এয়ারওয়েজে ছোট্ট লাইন পড়েছে। আটানস ওই লাইনের সামনে এগিয়ে গেল ক্লার্কের হাতে টিকিট তুলে দিল।

ফ্লাইট কখন ছাড়বে?

ক্লার্ক তাকাল, টিকিটে নাম লেখা আছে–আটানস স্টাভিচ। সে আটানসের দিকে আরও একবার তাকাল। তারপর কাছেই দাঁড়ানো একজন লোকের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল। লোকটি এগিয়ে এসে আটানসকে জিজ্ঞাসা করল- টিকিট কোথায়?

আটানস টিকিটটা লোকটার হাতে দিল- কিছু ভুল হয়েছে কি?

ভদ্রলোক বলল–এই ফ্লাইটে জায়গা হবে না। আপনি আমাদের অফিসে আসবেন কি? আমি আরও একবার সবকিছু দেখতে চাইছি।

আটানস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল–ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

সে লোকটিকে অনুসরণ করল। অফিসে পৌঁছে গেল। তার মনের ভেতর একটা অদ্ভুত ধারণার জন্ম হয়েছে।

এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইছে না আটানস। ডেমিরিস এতক্ষণে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই। আইন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সব কিছু নিখুঁতভাবে ঘটে গেছে। পঞ্চাশ হাজার ডলার। সুইস ব্যাংকে জমা দিতে হবে। ছোট্ট ছুটি, সে রিভিয়ারাতে চলে যাবে। কিংবা রিওতে। রিওর ছেলেবেশ্যাগুলোর সংসর্গ খুবই ভালোবাসে সে।

আটানস অফিসে গেল। কিন্তু? কী হয়েছে? সে নিজের অজান্তে চিৎকার করে উঠল।

–এ হতে পারে না! এ অসম্ভব! আমি নিজের হাতে তোমাকে খুন করেছি!

আটানসের গলা থেকে এই শব্দগুলি বেরিয়ে এসেছে কী? তাকে একটা পুলিশ ভ্যানের ভেতর তুলে ফেলা হয়েছে।

অ্যালান হ্যামিল্টন ক্যাথেরিনের দিকে তাকালেন, বললেন–শেষ অব্দি, শেষ খেলাটায় আমরা জিতে গিয়েছি। এসো, এখন অত ভাববার কী আছে!

.

৩২.

কয়েক ঘণ্টা আগে, বেসমেন্টের নাটক, চরম পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ক্যাথেরিন নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। যতই চেষ্টা করেছে, দড়ির বাঁধন ততই দৃঢ় হয়েছে। তার হাত-পা কেটে গেছে। সে ডায়ালের দিকে তাকাল- ২৫০ ডিগ্রি।

ডায়াল যখন ৪০০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে বয়লারটা ফেটে যাবে। এখান থেকে বেরোবার সব আশা শেষ হয়ে যাবে। ক্যাথেরিন এক মুহূর্ত ভাবল। ব্র্যান্ডির বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকল। আটানস সেটা মেঝেতে ফেলে গিয়েছে। অবাক চোখে তাকাল। মাথাটা কাজ করতে শুরু করেছে। শেষ সুযোগ, যদি সে আর একটু এগোতে পারে। ক্যাথেরিন কেঁকার চেষ্টা করল। পা-টা সামনের দিকে এগিয়ে দিল। আর এক ইঞ্চি নাঃ, কিছুতেই বোতলটার হদিশ পাচ্ছে না সে। আরও একবার চেষ্টা করল। কাঠের পিলারটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। আর এক ইঞ্চি। ক্যাথেরিনের চোখে জল এসেছে। আর একটু চেষ্টা করতে হবে আর একবার সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করল সে। দেহটাতে আঁকানি দিল। মনে হচ্ছে, শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। সে সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করল। না, এটা যেন দূরে না চলে যায়। আস্তে আস্তে সে বোতলটাকে ধরার চেষ্টা করল। খুব সাবধানে। শেষ অব্দি বোতলটাকে আয়ত্ত করতে পারল।

সে ডায়ালের দিকে তাকাল–২৮০ ডিগ্রি। ভয় জেগেছে, আতঙ্ক আর বিভীষিকা। ধীরে ধীরে সে বোতলটাকে পা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আনল। পায়ের আঙুলকে কাজে লাগাল। মার্গো, হাতের থেকে রক্ত ঝরছে।

কী হবে এবার? বেসমেন্ট আরও গরম হয়ে উঠেছে। শেষ চেষ্টা করতেই হবে। বোতলটা পিছলে গেল। ক্যাথেরিন ডায়ালের দিকে তাকাল–৩০০ ডিগ্রি। ডায়ালটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এবার বোধহয় বয়লারে ফাটল ধরবে। চিৎকার করার চেষ্টা করল সে। আঃ, বোতলটা হাতে এসে গেছে। সেটাকে সে শক্ত করে ধরল। চেষ্টা করল বাঁধন কেটে দিতে। কিছুতেই পারছে না। কোন কিছুই হচ্ছে না। সে চিৎকার করছে-ভয়ে এবং হতাশায়। আবার চেষ্টা করল। কিছুই হল না। ডায়াল ৩৫০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে।

ক্যাথেরিন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল। সমস্ত শক্তিকে আবার একসঙ্গে জড়ো করল। বোতলটা ভেঙে গেছে। আঃ, এবার শেষ কাজটা করতেই হবে। ভাঙা বোতলের প্রান্তভাগ দিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করল, হাতের কবজি কেটে গেল। যন্ত্রণাটাকে উপেক্ষা করল সে। আরও আরও একবার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ আবিষ্কার করল একটা নতুন তথ্য! একটা দড়ি খুলে গেছে। অন্য দড়িটা সে নিজের হাতে খুলে দিল। পায়ের বাঁধন মুক্ত করল।

ডায়াল ৩৮০ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ফার্নের্স গরম হয়ে উঠেছে। ক্যাথেরিনকে পালাতে হবে। আটানস দরজা বন্ধ করেছে। কিন্তু সে পালাবে কী করে? একটু পরেই বিস্ফোরণটা ঘটবে। ক্যাথেরিন ফার্নেসের ওপর এগিয়ে গেল। আঃ, সেফটিভাটা বন্ধ করতে হবে। ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

এক মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে দূরের দরজার দিকে ছুটে গেল। এখানে বোম শেলটারটা আছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল সে। দরজাটা বন্ধ করে দিল। কংক্রিটের মস্ত বড় একটা পাটাতন। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। পাঁচ সেকেন্ড কেটে গেছে। মস্ত বড়ো বিস্ফোরণ, গোটা বাড়িটা ভেঙে পড়েছে। সে অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আছে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে মাটির তলার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তা না হলে বেঁচে থাকত না। আগুন ধরে গেছে। তার মানে আমি এখনও বেঁচে আছি। বিপদটা কেটে গেছে। নাঃ, আরও কিছু করতে হবে, তা না হলে?...

এক ঘণ্টা কেটে গেছে অ্যালান হ্যামিল্টন সেখানে পৌঁছে গেছেন। ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরেছেন তিনি। বলেছেন ক্যাথেরিন, ডার্লিং, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। কী করে এসব ঘটনা ঘটল?

ক্যাথেরিন বলল–পরে, পরে বলব। এখনই আটানস স্টাভিচের কাছে পৌঁছোতে হবে। লোকটা একটা পাকা শয়তান।

.

৩৩.

সাসেক্সের একটা ছোটো শহর। চার্চে বিয়ের কাজ শেষ হল। অ্যালানের বোন ভীষণ ভালো স্বভাবের মহিলা। তিনি সবকিছু ঠিকমতো সাজিয়েছেন। অ্যালানের বোনের দিকে তাকিয়ে ক্যাথেরিন অবাক হয়ে গেল–এই ছবিটাই তো ধরা আছে অ্যালানের অফিসে। তার ছেলে স্কুলে পড়ে, আবাসিক বিদ্যালয়। ক্যাথেরিন এবং অ্যালান ছুটি কাটাচ্ছে একটি ফার্মের মধ্যে, তারপর তারা ভেনিসে উড়ে যাবে, মধুচন্দ্রিমার রাত কাটাতে।

.

ভেনিসকে আমরা মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ শহর বলতে পারি। যে শহরে বেশ কটি সুন্দর খাল আছে, আছে ১২০টি দ্বীপপুঞ্জ, ৪০০টি সেতু। অ্যালান এবং ক্যাথেরিন হ্যামিল্টন ভেনিসের এয়ারোপোর্টো মার্কোপোলোতে ঘুরে বেড়াল। মেসট্রেতে গাছের তলায় বসে হৃদয় বিনিময় করল। পিয়াজা সান মার্কোতে

সন্ধ্যা কাটাল। রয়্যাল ডানিয়েলিতে বেশ কিছুটা সময় উপভোগ করল। আহা, একটা হোটেল ডগস প্যালেস,–প্রেমিক প্রেমিকার আদর্শ বিচরণভূমি।

স্যুইটটি চমৎকার। প্রাচীন যুগের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। গ্রান্ড ক্যানাল চোখে পড়ছে।

–তুমি প্রথমে কী করতে চাও?

অ্যালান জানতে চাইলেন।

ক্যাথেরিন অ্যালানের কাছে পৌঁছে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল কল্পনা করতে পারি।

তারপর? ভেনিসের এই সুন্দর শহর, ক্যাথেরিন তার দুঃস্বপ্ন ভুলে গেছে। অতীত আর এখন তাকে আঘাত করে না।

সে এবং অ্যালান সব কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। সেন্ট মার্কস স্কোয়ার। হোটেল থেকে মাত্র কয়েক শো গজ দূরে তার অবস্থিতি। ইতিহাসের পাতা উলটোদিকে ঘুরে যাচ্ছে। সেন্ট মার্কস চার্চ, আর্ট গ্যালারি, ক্যাথিড্রাল সিঁড়ি এবং সিলিং, মোজেক আর ফ্রেসকোতে পরিপূর্ণ।

ডগস প্যালেস, অসাধারণ চেম্বার। ব্রিজ অফ সাইটস। কত বছর আগে এখান থেকে বন্দিদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হত।

তারা একটির পর একটি মিউজিয়ামে গেল। চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করল। সেই ছোটোখাটো দ্বীপে মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন কাটাল। মুরানোতে বসে গ্লাসব্লোয়িং খেলা দেখল।

বুরাননাতে গিয়ে দেখল মহিলাদের, তারা অসাধারণ নৃত্যপটিয়সী। মোটর লঞ্চের সওয়ার হয়ে চলে গেল টরসেলোতে। লোক্যান্ডা কিপ্রিয়ানিতে রাতের খাওয়া সারলো। ফুলে পরিপূর্ণ একটা উদ্যানের মধ্যে হাতে হাত রেখে হেঁটে গেল।

ক্যাথেরিনের মনে পড়ে গেল কনভেন্টের সেই পুষ্পিত উদ্যানটির কথা। সেখানেই তার জীবনের চাকা ঘুরতে থাকে। আহা, অ্যালানকে পাশে নিয়ে সে বসে আছে। হায় ঈশ্বর, তুমি কত করুণাময়!

.

মার্সেরি হল এখানকার প্রধান বাজার। তারা নানান জিনিস দেখতে পেয়েছে। একটির পর একটি দোকান। রুবেলিতে গিয়ে ফেব্রিকের জিনিসপত্র কিনল। ক্যাসালা থেকে দামি জুতো, জিওকনডো ক্যাসিনি থেকে প্রাচীন যুগের স্মারকচিহ্ন। কোয়াদ্রিতে বসে রাতের খাবার খেল। আলগ্রাসপোতে গিয়ে কিছুটা বিয়ার ঢেলে ফেলল গলার ভেতর। এইভাবেই দিন । কাটল আনন্দে, গল্পে এবং অতীতের রোমন্থনে।

শুক্রবার, মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ বৃষ্টি এল। আকাশে বজ্রপাত। ক্যাথেরিন এবং অ্যালান হোটেলে ফিরে এল। তারা ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল।

শ্রীমতী হ্যামিল্টন, এই বৃষ্টিপাতের জন্য দুঃখিত, রিপোর্ট বলেছিল আজ সূর্য উঠবে।

ক্যাথেরিন হাসল বৃষ্টি কোথায়? আমি তো সুখী, খুবই সুখী।

বজ্রালোক, মাঝে মধ্যে আকাশ উদ্ভাস। কড়কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ছে। ক্যাথেরিনের। মনের ভেতর অন্য শব্দ। চোখ বন্ধ করলে সে বয়লারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

সে অ্যালানের দিকে তাকিয়ে বলল–আজই বোধহয় জুরিরা তাদের মন্তব্য জানাবেন, তাই তো?

অ্যালান কথা বলতে চাননি না, আমি ওসব জগৎ থেকে দূরে আছি।

–আমি জানতে চাইছি।

ক্যাথেরিনের দিকে তাকিয়ে অ্যালান বলল–ঠিক আছে, আমি দেখছি।

ক্যাথেরিন দেখল, অ্যালান রেডিয়ো শোনার জন্য ঘরের এক কোণে চলে গেল। রেডিয়োটা খুলে দিল। বিবিসি স্টেশন ধরা পড়েছে। কে যেন গমগমে কণ্ঠস্বরে খবর পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী তার পদত্যাগপত্র আজই দাখিল করেছেন। তিনি নতুন সরকার গঠন করার চেষ্টা করবেন।

শব্দটা ভালো, শোনা যাচ্ছে না, কিড়মিড়ে আওয়াজ আসছে।

অ্যালান মন্তব্য করল ঝড়বাদলের জন্য এমনটি হচ্ছে।

আবার শব্দ শোনা গেল- এথেন্সে কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিচার শেষপর্বে এসে পৌঁছেছে। কিছুক্ষণ আগে জুরিরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সকলে অবাক হয়ে গেছেন।

বিচারটা হল...

রেডিয়ো স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ক্যাথেরিন অ্যালানের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল বিচার কী হতে পারে?

ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে দুষ্টুমির স্বরে অ্যালান বলল জানি না, তুমি কী চাইছ? গল্পটা ভালোভাবে শেষ হোক!

.

৩৪.

উপসংহার

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিচার শুরু হবে। পাঁচদিন বাকি আছে। জেলার সেলের দরজাটা খুলে দিলেন। একজন এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস সামনের দিকে তাকালেন অ্যাটর্নি ছাড়া আর কাউকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না। এখনও পর্যন্ত কেউ তো আসেনি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন

না। তাকে সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হয়েছে। কিন্তু কে? এখন আবেগ দেখালে চলবে কি? তিনি জেলারকে অনুসরণ করলেন। ছোট্ট আলোচনা কক্ষে গিয়ে পৌঁছোলেন।

উনি ওখানে বসে আছেন।

ডেমিরিস ভেতরে ঢুকলেন, থমকে থামলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, হুইলচেয়ারে বসে আছেন। তার চুল তুষারের মতো সাদা। তার মুখে ভৌতিক অপচ্ছায়া। বেশ বোঝা যাচ্ছে অনেক বয়স হয়েছে। ঠোঁট দুটো একেবারে শুকিয়ে গেছে। হাসবার চেষ্টা করছেন। ওই ভদ্রলোককে দেখে ডেমিরিস অবাক হয়ে গেলেন। স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন। তাঁ, চিনতে পেরেছেন কি?

–আমি ভূত নই, নেপোলিয়ান ছোটাস বললেন। তার কণ্ঠস্বর খড়খড়ে শোনাচ্ছে। আসুন, আসুন কোস্টা।

ডেমিরিস চিৎকার করলেন আপনি!

–আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। আমার কোমর ভেঙে গেছে। আমার বাটলার ঠিক সময়ে খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি এটা আপনাকে জানতে দিতে চাইনি। বেঁচে আছি জানলে আপনি হয়তো অখুশি হতেন। আপনার সঙ্গে আর যুদ্ধ করার মতো মানসিকতা আমার ছিল না।

–কিন্তু ওরা একটা অগ্নিদগ্ধ দেহ আবিষ্কার করেছিল।

–ওটা আমার চাকরের।

ডেমিরিস ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন–আপনাকে জীবন্ত দেখে কী যে ভালো লাগছে।

–ভালো লাগারই কথা। আমি আপনার জীবন বাঁচাতে এসেছি।

ডেমিরিস বললেন–সত্যি? সত্যি!

–হ্যাঁ, আমি এই কেসটা লড়ব।

ডেমিরিস হাসলেন–সত্যি লিয়ন। এত দিন বাদে? আপনি কি আমাকে বোকা বলে মনে করছেন? আমি আমার জীবন আপনার হাতে তুলে দেব?

কারণ আপনি জানেন কোস্টা, এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই আপনাকে বাঁচাতে পারি। আপনার বাঁচা-মরা আমার ওপর নির্ভর করছে।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–না, ধন্যবাদ।

তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমি স্পাইরস লামব্রোর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাকে দিয়ে বলাব, আপনি তার। সাথে ব্যস্ত ছিলেন, যখন আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ডেমিরিস অবাক হয়ে গেলেন ও কী বলেছে?

ছোটাস হুইলচেয়ারে ঝুঁকে পড়লেন–আমি ওঁকে সবকিছু বুঝিয়েছি। আমি বলেছি, ভবিষ্যতে ওঁর জন্য একটা সুখী দিন অপেক্ষা করে আছে। এভাবে প্রতিশোধ নিয়ে কী লাভ?

–আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!

–আমি বলেছি, যদি লামব্রো এইভাবে সাক্ষ্য দেন, তা হলে আপনার সমস্ত সম্পত্তি আপনি এঁকে দিয়ে দেবেন। আপনার জাহাজ, আপনার কোম্পানি, সবকিছু ওঁর হাতে চলে যাবে।

–আপনি একথা বললেন কী করে?

–আমি কি ভুল বলেছি? কোস্টা, একবার চিন্তা করুন তো। এইভাবে হয়তো আপনি ফাঁসির দড়ি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এখন এই বিচারটা আপনাকেই করতে হবে। কোন্টা বেশি মূল্যবান? জীবন, নাকি অশেষ ধনসম্পত্তি?

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা। ডেমিরিস বসে পড়লেন। তিনি ছোটাসকে ভালোভাবে দেখলেন।

–লামব্রো সত্যি সত্যি একথা বলবে? মেলিনার যখন মৃত্যু হয় তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম? সমুদ্র সৈকত থেকে অনেক দূরে?

–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

–এর বিনিময়ে সে কী চাইছে?

–আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের সবটুকু।

ডেমিরিস মাথা নাড়লেন–না, আমি সেটা কখনও চাইব না।

–আপনাকে ছাড়তেই হবে। উনি আপনাকে নিঃস্ব করবে। এটাই হল ওঁনার প্রতিশোধ।

ডেমিরিস তার মন স্থির করতে পারছিলেন না।

–লিয়ন, আপনি কথা দিচ্ছেন, এই অন্ধকার অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন?

ছোটাসের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল আমি কথা দিচ্ছি।

–আমি বুঝতে পারছি না।...।

–হেলেনিক ট্রেড করপোরেশনকে লামব্রোর হাতে তুলে দিতে হবে। তার আগে আমি একটা ছোট্ট খেলা খেলাব। আপনি এই কোম্পানির সমস্ত অ্যাসেট একটি নতুন কোম্পানিতে পাঠিয়ে দেবেন। ওই কোম্পানিটার মালিক হব আমি।

ডেমিরিস বললেন–তার মানে লাবব্রো আসলে কিছুই পাবে না?

ছোটাস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন–এই পৃথিবীতে কাউকে জিততে হয়, কেউ আবার হেরে যায়।

–লামব্রো সন্দেহ করবে না তো?

–পুরো ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমার অভিজ্ঞতার ওপর আপনার আস্থা আছে তো?

ডেমিরিস বললেন–লামব্রোর সাথে আপনি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করছেন? কিন্তু আপনি আমাকেও যে ঠকাবেন না, তা কী করে বুঝব?

–এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার কোস্টা। আপনার জীবন আমার ওপর নির্ভর করছে। আমার সঙ্গে আপনার একটা চুক্তিপত্র সই করা হবে। আপনি এই নতুন কোম্পানির দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দেবেন। অবশ্য তখনই, যখন আপনি মুক্ত হবেন। আর যদি শেষপর্যন্ত এই বিচারে আপনার মৃত্যুদণ্ড হয়, আমি কিছুই পাব না।

এই প্রথম কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মনে হল, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। তিনি ওই প্রতিবন্ধী আইনজ্ঞের পাশে কিছুক্ষণ বসলেন। এবার বিচার শুরু হবে। বিচারের ফলাফল কী হবে তা ডেমিরিস বুঝতেই পারছেন। না, এত বোকা তিনি নন।

ডেমিরিস শান্তভাবে জবাব দিলেন- ঠিক আছে, ছোটাস, আপনার প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি।

ছোটাস বললেন–ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। কোস্টা, এভাবেই আপনি নিজের জীবন বাঁচালেন।

ডেমিরিস ভাবতে থাকলেন, আরও অনেক কিছু আমি বাঁচাব। আমি বাঁচিয়ে রাখব আমার এক কোটি মিলিয়ন ডলার। সেটা কোথায় আছে, একমাত্র আমি জানি। আপনি অথবা অন্য কেউ তার হদিস করতে পারবেন না।

স্পাইরসের সাথে ছোটাসের কথাবার্তা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা খুব একটা সহজ ছিল । প্রথমবার তিনি ছোটাসকে তার অফিস থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন।

-আপনি কী ভাবছেন? ওই দৈত্যটার জীবন আমি বাঁচাব? আমার চোখের সামনে থেকে এখনই বেরিয়ে যান।

আপনি প্রতিশোধ নেবেন তো? এটাই আপনার আসল অভিপ্রায়?

ছোটাস শান্তভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

–হ্যাঁ, আমি প্রতিশোধ নিতে পেরেছি।

–সত্যি-সত্যি? কোস্টার ব্যাপারে আপনি সব কিছুই জানেন। জীবন চলে গেলেও তার সম্পত্তি বিনষ্ট হবে না। যদি কোস্টাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কয়েক মুহূর্তের যন্ত্রণা আর যদি আপনি তার কাছ থেকে সব নিয়ে নেন? কপর্দকশূন্য জীবন তাকে কাটাতে হবে। ভেবে দেখুন তো এটা কি বড়ো শাস্তি নয়?

আইনবিশারদের কথার মধ্যে সত্যি লুকিয়ে আছে। সত্যিই তো, ডেমিরিসকে এভাবে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দিয়ে কী লাভ? ডেমিরিস এক লোভী মানুষ। টাকা ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না।

–আপনি কোস্টার সব কিছু আমার হাতে তুলে দেবেন?

–হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি, ওঁনার সমস্ত জাহাজ, ব্যবসা সব কিছু। সব কটা কোম্পানি।

ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো।

স্পাইরস বললেন–আমায় কিছু সময় দিন।

উনি অবাক চোখে আইনবিশারদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আহা, এই লোকটার কি এত ক্ষমতা আছে? দেখাই যাক।

.

মধ্যরাত। স্পাইরসলামব্রো নেপোলিয়ান ছোটাসকে বললেন–আমি মনস্থির করেছি। চুক্তিটা পাকা করতে হবে।

প্রেসের লোকজন অবাক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের বিচার শুরু হবে। নিজের স্ত্রীকে তিনি হত্যা করেছেন এই অপরাধে। আর যে মানুষটি তাঁর হয়ে মামলা লড়বেন তিনি মৃত্যুর কোল থেকে উঠে এসেছেন। এই দেশের সবথেকে বিখ্যাত ক্রিমিনাল অ্যাটর্নি। মনে করা হয়েছিল, তিনি অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন।

.

বিচার শুরু হল, সেই কোর্টরুমে যেখানে নোয়েলে পেজ এবং ল্যারি ডগলাসের বিচার হয়েছিল। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে আনা হল অভিযুক্তের নির্দিষ্ট জায়গাতে। হুইল চেয়ারে চড়ে নেপোলিয়ান ছোটাস এলেন। সরকার পক্ষের উকিল হলেন স্পেশ্যাল প্রসিকিউটর ডেলমা।

ডেলমা জুরিবৃন্দকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করলেন- কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে আমরা পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি বলতে পারি। অনন্ত অর্থের অধিকারী তিনি। তাই আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেছেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত, উনি ঠান্ডা মাথায় খুন করেছেন।

ডেলমা ডেমিরিসের দিকে তাকালেন–কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার স্ত্রীকে মেরেছেন। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না। একটির পর একটি প্রমাণ আমি আপনাদের হাতে তুলে দেব। সবকিছু দেখার পর আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন, এটি হল প্রথম ডিগ্রির হত্যাকাণ্ড।

উনি সিটে গিয়ে বসলেন। প্রধান বিচারপতি এবার নেপোলিয়ান ছোটাসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন- আপনি কি কোনো বক্তব্য রাখবেন?

ছোটাস বললেন–হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে চাইছি।

তিনি জুরিদের মুখের দিকে তাকালেন। সকলের মুখেই প্রশ্ন জেগেছে।

বলা শুরু হল–কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ধনী অথবা শক্তিশালী বলে এই কাঠগড়ায় আসেন নি। তাকে এখানে আনা হয়েছে জোর করে। আমরা সকলেই জানি, ধনী মানুষকে কেউ কেউ ঘৃণা করে থাকেন। মিঃ ডেমিরিসকে আমরা এই ব্যাপারে অভিযুক্ত কেন করব? তিনি কখনোই তার স্ত্রীকে হত্যা করেননি। আমার কাছে আসল যুক্তি লুকিয়ে আছে।

এবার বিচার শুরু হল।

.

প্রসিকিউটর ডেলমা পুলিশ লেফটেন্যান্ট থিওফলিসকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করালেন।

প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হল।

প্রথম প্রশ্ন–অপনি যখন ডেমিরিসের বীচ হাউসে গিয়েছিলেন, তখন কী দেখেছিলেন? লেফটেন্যান্ট থিওফলিস, সব কথা খুলে বলবেন আদালতের সামনে?

–টেবিল চেয়ারগুলো ভেঙে পড়ে আছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে একদল চোর ঢুকে পড়েছিল।

-মনে কি হয়নি সেখানে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে?

–ইয়েস স্যার। মনে হয়েছে, সেখানে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে।

–সেখান থেকে আপনি একটা রক্তামাখা ছুরি পেয়েছেন তো?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–হ্যাঁ, স্যার।

ছুরির ওপরে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ।

কার হাতের ছাপ?

–কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের।

জুরিরা ডেমিরিসের দিকে তাকালেন।

–যখন আপনারা বাড়িটি সার্চ করলেন, আর কী পাওয়া গিয়েছিল?

-ক্লোসেটের মধ্যে আমরা রক্তমাখা সাঁতারের পোশাক পেয়েছি। এতে ডেমিরিসের নামের আদ্যাক্ষর লেখা ছিল।

–পোশাকগুলো কি অনেক দিন ওখানে পড়ে ছিল?

–না, স্যার। সেগুলো সমুদ্রের জলে ভেজা ছিল।

–অনেক ধন্যবাদ।

এবার নেপোলিয়ান ছোটাসের পালা। তিনি বললেন–ডিটেকটিভ থিওফলিস, আপনি ওই অভিযুক্তের সাথে কি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন?

–হ্যাঁ, স্যার।

-উনি কী বলেছেন?

–উনি বলেছেন, ডেমিরিসের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, উনি কী বলেছেন, সেটা এখানে বলতে হবে কি?

–ওঁনাকে কি শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে? মানে, শরীরের দিক থেকে উনি কতখানি শক্তিশালী বলে আপনার মনে হয়?

–আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

একজন তার স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য এমন কাজ করবে কেন? ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

ডেলমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–মহামান্য বিচারপতি, আমি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি।

–এ ব্যাপারে আপনি আর কিছু বলবেন না, সাক্ষ্যকে বিরক্ত করবেন না।

–আমি ক্ষমা চাইছি, মাননীয় মহাশয়। ছোটাস ওই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ ডেমিরিসের সাথে আপনার কী কথা হয়েছিল? তার থেকে আপনার কি মনে হয়েছে ভদ্রলোক কি বুদ্ধিমান নন?

–হ্যাঁ, স্যার। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধনী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উনি বুদ্ধিমান, সেটাও মানতে হবে।

–লেফটেন্যান্ট, আর একটি প্রশ্ন করার আছে। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মতো মানুষ কি এইভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারেন? হত্যার সব চিহ্ন চোখের সামনে ফেলে পালাতে পারেন? যে রক্তমাখা ছুরির ওপর তার হাতের দাগ আছে, সেটিও সামনে রাখবেন কেন? রক্তমাখা সাঁতারের পোশাক? ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয় না কি?

অনেক সময় উত্তেজনার মুহূর্তে আমরা সবকিছু গুলিয়ে ফেলি। এর আগে এমন অনেক ঘটনা আমি চোখের সামনে দেখেছি।

–পুলিশ একটা সোনার বোতাম পেয়েছে। ডেমিরিসের জ্যাকেট থেকে বোতামটা পাওয়া গেছে। সেই জ্যাকেটটি কি ডেমিরিস পরেছিলেন?

–হ্যাঁ, স্যার।

–এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুলিশের তথ্যানুসারে তার স্ত্রী লড়াই করার সময় এই জ্যাকেটটা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন।

–হুঁ, ঠিকই বলেছেন।

–আমরা ডেমিরিস সম্পর্কে যতটুকু জানি, তিনি ভালো পোশাক পরতে ভালোবাসেন। বোতামটা ছেঁড়া, অথচ তিনি তা খেয়াল করলেন না। তিনি বাড়িতে বসেছিলেন জ্যাকেট পরে? তা কি সম্ভব? জ্যাকেটটা খুলে রাখলেন। ক্লোসেটে টাঙিয়ে দিলেন। তখনও কোনো কিছু তার নজরে পড়ল না। এভাবে কি কেউ নিজেকে হত্যাকারী সাজায়। অন্ধরাও বোধহয় এমন কাজ করবে না।

.

মিঃ কাটালানোস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালেন। তিনি একটা ডিটেকটিভ সংস্থার প্রধান। ডেলমার সাথে এবার শুরু হল তার প্রশ্নোত্তরের পালা।

–আপনি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির মালিক, তাই তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

কদিন আগে মিসেস ডেমিরিসকে হত্যা করা হয়। এই ভদ্রমহিলা কি আপনার কাছে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

–কী ধরনের সাহায্য উনি প্রার্থনা করেছিলেন?

নিরাপত্তা। উনি বলেছিলেন যে, ওঁনার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ আসন্ন। স্বামী বারবার ওঁনাকে হত্যা করবেন বলে শাসিয়েছেন।

দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল।

শ্রীমতী ডেমিরিস খুবই ভেঙে পড়েছিলেন, তাই তো?

–হ্যাঁ, উনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন।

উনি আপনাকে নিযুক্ত করেছিলেন স্বামীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। ঠিক বলছি তো?

–হ্যাঁ, স্যার।

আমার আর কিছু প্রশ্ন নেই, ডেলমা এবার ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি প্রশ্ন করবেন তো?

ছোটাস তার হুইলচেয়ার নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন–বললেন, মিঃ কাটালানোস, কতদিন ধরে আপনি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত?

–পনেরো বছর ধরে।

ছোটাস খুশি হলেন–বাঃ, অনেক বছর! আপনি আপনার কাজটা কি ভালোভাবে করেন?

–আমার তো তাই মনে হয়। অন্তত আমার ক্লায়েন্টদের তাই অভিমত।

–তাহলে এই ব্যাপারে আপনার অশেষ অভিজ্ঞতা, তাই তো? যেসব মানুষেরা সমস্যার মুখোমুখি হয়, তাদের মন কেমন, তা তো আপনি জানেন?

কাটালানোস বললেন–হ্যাঁ, এ জন্যই তো তারা আমাদের কাছে আসেন।

–যখন মিসেস ডেমিরিস আপনার কাছে এসেছিলেন, তাকে কি খুব উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছিল?

–হ্যাঁ, তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ ছিল।

বুঝতে পেরেছি, তার মনে ভয় ঢুকেছিল। স্বামী তাকে যে-কোনো মুহূর্তে হত্যা করতে। পারেন, তাই তো?

–আপনি ঠিকই বলেছেন।

তিনি যখন আপনার অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আপনি কতজনকে তার সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন? একজন, নাকি দুজন?

না, তখনই আমি কাউকে পাঠাইনি।

ছোটাস আবাক হয়ে গেলেন কেন? এই কাজ আপনি কেন করেননি?

উনি বলেছিলেন, সোমবারের আগে লোক দরকার নেই। ছোটাস অবাক চোখে তাকালেন।

–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ কাটালানোস। ওই ভদ্রমহিলা, আপনার কাছে এসেছিলেন, ভয়ে কাঁপছেন, স্বামী তাকে যে-কোনো মুহূর্তে হত্যা করতে পারে, অথচ অফিস থেকে বেরোবার সময় উনি মন পালটে ফেললেন। সোমবার অব্দি ওঁনার কোনো সাহায্য লাগবে না, একথা বললেন!

–ঠিকই বলেছেন।

নেপোলিয়ান ছোটাস এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে দিচ্ছে, সত্যি সত্যি মিসেস ডেমিরিস কি ভয় পেয়েছিলেন? নাকি এসবই তাঁর সাজানো অভিনয়? কেন তিনি সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিলেন।

.

ডেমিরিসের কাজের মেয়েটিকে ডাকা হল।

–এখন সত্যি করে বলো তো, মিসেস ডেমিরিস এবং তার স্বামীর মধ্যে টেলিফোনে যা কথা হয়েছিল, তুমি তা শুনেছিলে কী?

হ্যাঁ, স্যার।

–কী কথা হয়েছিল তা গুছিয়ে বলল।

মিসেস ডেমিরিস তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন উনি ডির্ভোস চাইছেন। স্বামী বলেছিলেন, এ ডির্ভোস তিনি দেবেন না।

ডেলমা জুরিদের দিকে তাকালেন–ঠিক আছে। আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এছাড়া তুমি আর কী, শুনেছিলে?

মিঃ ডেমিরিস বলেছিলেন বীচ হাউসে দেখা করতে। তিনটের সময়। একা আসতে।

মিঃ ডেমিরিস বলেছিলেন ওঁনার স্ত্রী বীচ হাউসে একা আসবেন, তাই তো?

–হ্যাঁ, স্যার। আরও বলেছিলেন, যদি আমার মালকিন ছটার মধ্যে ফিরে না আসেন, তাহলে আমি যেন পুলিশের শরণাপন্ন হই।

এই কথা শুনে জুরিদের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তারা সকলে ডেমিরিসের দিকে তাকালেন।

-তোমাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না। ডেলমা এবার ছোটাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন?

নেপোলিয়ান ছোটাস হুইল চেয়ারটা আর একটু কাছে এগিয়ে নিয়ে এলেন তোমার নাম আনড্রিয়া, তাই তো?

-হ্যাঁ স্যার।

আনড্রিয়াকে দেখে বুঝতে পারা গেল, সে খুব ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভয়টাকে চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

–আনড্রিয়া, তুমি বলেছ, মিসেস ডেমিরিস তাঁর স্বামী সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমাকে দিয়েছেন। তার স্বামীকে তিনি ডির্ভোস দিতে চাইছেন, মিঃ ডেমিরিস ডির্ভোস দেবেন না বলেছেন। মিঃ ডেমিরিস বলেছেন, তাঁর স্ত্রীকে একা বীচ হাউসে আসতে। আমি কি ঠিক : বলছি?

-হ্যাঁ, স্যার।

–তুমি কিন্তু শপথ নিয়ে বলেছ, আনড্রিয়া, কী শুনেছ ঠিক করে বলল।

–হ্যাঁ, স্যার, আমি এই শুনেছি।

–যখন এই কথা হচ্ছিল তখন ওই ঘরে কটা টেলিফোন ছিল?

–কেন স্যার, মাত্র একটা।

নেপোলিয়ান ছোটাস এবার বললেন–তাহলে? অন্য প্রান্তে কী কথা হচ্ছে, তুমি তা শুনতে পাওনি?

না, স্যার। আমি তা জানি না।

–তাহলে আসল সত্যিটা আমিই বলি। মিসেস ডেমিরিসের কথাই তুমি শুনেছ, তার স্বামী কী বলছেন, সেটা তোমার পক্ষে শোনা সম্ভব হয়নি।

-না, আমি তা শুনব কেমন করে?

–তার মানে, তুমি শোনোনি যে মিঃ ডেমিরিস তার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছেন। মিঃ ডেমিরিস তার স্ত্রীকে একা বীচ হাউসে আসতে বলেছেন। এসব তোমার কল্পনা, কেননা শ্রীমতী ডেমিরিস তোমাকে এসব কথা বলেছিলেন।

আনড্রিয়া রেগে গেল। বলল–হ্যাঁ, এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে।

–আমি যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করি- ডেমিরিস যখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

উনি আমাকে চা আনতে বললেন।

–তুমি চা আনতে গিয়েছিলে?

–ইয়েস, স্যার।

–তুমি চা-টা টেবিলে রেখেছিলে?

–ইয়েস, স্যার।

–তুমি ঘর ছেড়ে যাওনি কেন?

–মিসেস ডেমিরিস আমাকে থাকতে বলেছিলেন।

–মিসেস ডেমিরিস চেয়েছিলেন, তুমি যাতে এই ফোনের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করো। অথবা তোমাকে শোনানোর চেষ্টা করা হয়।

আমতা আমতা করে মেয়েটি বলল–হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে।

এবার ছোটাসের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠেছে এক জাগ্রত উন্মাদনা।

–তার মানে, তুমি জানো না সত্যি সত্যি ভদ্রমহিলা তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলেন কিনা। হয়তো উনি কারোর সঙ্গেই কথা বলেননি। কথা বলার অভিনয় করছিলেন।

ছোটাস চেয়ারটা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এলেন–ব্যাপারটা তোমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগেনি কি? উনি ব্যক্তিগত কথা বলছেন, তোমাকে সেখানে থাকতে বললেন কেন? আমি তো এব্যাপারটা কখনও ভাবতেই পারি না। ব্যক্তিগত কথার সময় আমরা বাড়ির কোনো কাজের মেয়েকে সেখানে থাকার অনুমতি দিই না। মিসেস ডেমিরিসের এই আচরণটা সত্যি সন্দেহজনক। এই ব্যাপারে আর একটু বেশি নজর দেওয়া দরকার। আমার মনে হয়, উনি বোধহয়, স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস তার স্ত্রীকে হত্যা করেননি। সাক্ষ্যপ্রমাণ হয়তো তার বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু এই সবই সাজানো। সব কিছু দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হয়েছে। যে-

কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাছেই এই যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে যাবে। দেখা যাক কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে কী করে আমরা আরও বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত করতে পারি।

দশদিন ধরে এই সওয়াল-জবাব চলেছিল। একটির পর একটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তীব্র বাদানুবাদ, ধারা, উপধারা বিশ্লেষণ। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে করোনার। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে শেষ পর্যন্ত অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে কী? প্রেসের লোকেরা তখন উদগ্রীব।

নেপোলিয়ান ছোটাস শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। স্পাইরস লামব্রোকে সাক্ষী হিসাবে ডেকে পাঠানো হল। ডেমিরিস এর মধ্যেই ওই চুক্তিপত্রে সই করেছেন। হেলেনিক ট্রেড করপোরেশন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি স্পাইরস লামব্রার হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। একদিন আগে এইসব সম্পত্তি গোপনে নেপোলিয়ান ছোটাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যদি কনস্ট্যানটিন ডেমিরস ওই বিচারে মুক্তি পান, তাহলেই এই চুক্তিটা কাজ করবে।

–মিঃ লামব্রো আপনি এবং আপনার ভগ্নিপতি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস মাঝে মধ্যেই নানা জায়গাতে দেখা করতেন?

-না, আমরা কখনও দেখা করিনি।

–সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা মোটেই ভালো ছিল না, তাই তো? আপনারা একে অন্যকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করতেন।

লামব্রো কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের দিকে তাকালেন–হ্যাঁ, তবে মাঝে মধ্যে আমরা কিছুটা সুসম্পর্ক কাটিয়েছি।

–যেদিন আপনার বোন অদৃশ্য হয়ে যান, সেদিন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বীচ হাউসে যাননি বলে জানিয়েছেন। তিনটের সময় তিনি নাকি আপনার সাথে একটি গোপন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ওই সভাটা হয়েছিল অ্যাক্রোকরিন্থের একটি লজে? এই বক্তব্য কি সত্যি? যখন পুলিশ আপনাকে এই মিটিং সম্পর্কে প্রশ্ন করে আপনি তা অস্বীকার করেছিলেন।

-হ্যাঁ, আমি করেছিলাম।

–কেন?

লামব্রো অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দুচোখে রাগ ভেসে উঠল–ডেমিরিস, আমার বোনের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। সে সব সময় আমার বোনকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাত করত। আমি তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। আমার একটা অ্যালিবাই দরকার ছিল। তাই আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

এখন কী বলবেন?

–মিথ্যেকে নিয়ে দীর্ঘদিন কেউ বাঁচাতে পারে না। আমি সত্যিটা বলতে চাইছি।

–তাহলে ভেবেচিন্তে বলুন তো ওইদিন কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কিনা দুপুর তিনটের সময় অ্যাক্রোকরিস্থের লজে?

-হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে বসেছিলাম।

কোর্টরুমে আবার চিৎকার শুরু হল। ডেলমা উঠে দাঁড়ালেন। ডেলমা বললেন ইয়োর অনার, আমি প্রতিবাদ করছি।

প্রতিবাদ আগ্রাহ্য করা হল।

ডেলমা চেয়ারে বসে পড়লেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে মনে হল, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

–ওই মিটিং সম্পর্কে সব কিছু বলুন। এটা কি আপনার বুদ্ধি?

না, মেলিনা এই কথাটা বলেছিল। সে আমাদের দুজনকেই বোকা বানিয়েছে।

–বোকা বানিয়েছে কীভাবে?

–মেলিনা আমাকে ফোন করে বলে তার স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আমার লজে। সে একটা ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলবে। মেলিনা আবার ডেমিরিসকেও ফোন করেছিল। বলেছিল, আমি নাকি তার স্বামীর সাথে কথা বলতে উদগ্রীব। আমরা । দুজনে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে আমরা একটা সরল সত্য আবিষ্কার করলাম, তা হল,

আমাদের দুজনকেই বোকা বানানো হয়েছে। বলার মতো কোনো কথা আমাদের ছিল না।

তার মানে? ইচ্ছে করেই ওই মিটিংটা ডাকা হয়েছিল। ওই সময়টার সাথে মিসেস ডেমিরিসের মৃত্যুর সময়টা মিলে গেছে তাই তো?

–আপনার অনুমান সঠিক।

–অ্যাক্রোকরিন্থ থেকে বিচে পৌঁছোতে গেলে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। আমি যেতে যেতে তা মেপে নিয়েছি। নেপোলিয়ান ছোটাস জুরিদের দিকে তাকালেন–তাহলে? অ্যাক্রোকরিন্থে যদি তিনটের সময় কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস বসে থাকেন, তিনি সাতটার আগে এথেন্সে পৌঁছোতে পারবেন না।

এবার ছোটাস স্পাইরাস লামব্রোর দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি বাইবেল স্পর্শ করে শপথ নিয়েছেন, যা বলবেন সত্যি বলবেন।

–হ্যাঁ, আমি কোনো মিথ্যে কথা বলছি না।

নেপোলিয়ান ছোটাস আবার জুরিদের মুখের দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি বলতে থাকলেন, একটি মাত্র সঠিক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারছি। যদি মনে করা হয় যে, ডেমিরিস কজন ভাড়াটে গুণ্ডাকে লাগিয়ে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন, তাহলেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ যে-সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, তাতে মনে করা যেতেই পারে যে তিনি নিজেই স্ত্রীকে হত্যা

করেছেন। মহামান্য বিচারপতিরা এই ব্যাপারটা ভাবনাচিন্তা করবেন, যে-কোনো বিচারে দুটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। উদ্দেশ্য এবং সুযোগ।

...উদ্দেশ্য এবং সুযোগের কথা আমরা বলছি না। আমরা কিন্তু উদ্দেশ্য এবং সুযোগ, দুটোকে একসঙ্গে করতে চাইছি। আইনের চোখে শ্যামদেশীয় সেই যমজের গল্প আছে। তাদের কাটা সম্ভব ছিল না। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রহোদয়গণ, এক্ষেত্রে হত্যাকারীর কী উদ্দেশ্য? কীভাবে সুযোগকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন? আশা করি, সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আপনারা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। যে অপরাধ কখনও করা হয়নি, তার জন্য কেউ শাস্তি পাক, এটা নিশ্চয়ই আমাদের অভিপ্রেত নয়।

.

চার ঘণ্টা বাদে জুরিরা আবার এসে বসলেন। কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসকে দেখা গেল আকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন। তার মুখে বিবর্ণতার ছাপ। মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ছোটাস কিন্তু জুরিদের দিকে তাকাননি। তিনি কনস্ট্যানটিন ডেমিরিসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, মুখের সেই উদ্ধতভাব কোথায় হারিয়ে গেছে। যে মানুষটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, সে তো এমন উদ্বিগ্ন হবেই।

চিফ জাস্টিস বললেন–এবার জুরিরা একটি রায় ঘোষণা করবেন।

-ইয়োর অনার। জুরিদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ালেন। তার হাতে একটা কাগজ।

–বেলিফের হাতে কাগজটা তুলে দিন।

বেলিফ জুরিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাগজটা নিয়ে এলেন। সেটা বিচারকের হাতে তুলে দিলেন। বিচারক ওই কাগজটা খুললেন। দেখলেন, জুরিরা বলছে, ওই অভিযুক্তকে কোনো মতেই দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়।

কোর্টরুমে তখন চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। অনেকে আনন্দ প্রকাশ করছে। অনেকে মুখে। শব্দ করছে। তাদের সকলেই কোনো না কোনো ভাবে ডেমিরিসের কাছে কৃতজ্ঞ। ।

ডেমিরিসের মুখে আনন্দের ছাপ। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উঠে দাঁড়ালেন। নেপোলিয়ান। ছোটাসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

–শেষ পর্যন্ত আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। আপনার এই ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।

ছোটাস বললেন–না-না, এভাবে আমাকে প্রশংসা করতে হবে না। আমি ভীষণ বড়োলোক, আপনি কপর্দকহীন। আসুন, আমরা এই মুহূর্তটাকে আনন্দে উদ্বেল করে তুলি।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস ছোটাসের হুইল চেয়ারটাকে ধীরে ধীরে টান দিলেন। দুপাশে হাজার মানুষের ভিড়। রিপোর্টাররা হেঁকে ধরেছে। তিনি পার্কিং লটে এলেন। ছোটাস একটা সেডান গাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার গাড়ি তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেমিরিস বললেন–আপনার কোনো ড্রাইভার নেই?

–আমার ড্রাইভারের দরকার হয় না। এই গাড়িটা আমার জন্য বিশেষভাবে তৈরি। আমি ওটা চালাব। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

ডেমিরিস দরজা খুলে দিলেন। ছোটাস গাড়িতে গিয়ে বসলেন। তিনি হুইলচেয়ারটা পাশে রাখলেন। ব্যাকসিটে ঢুকিয়ে দিলেন। ডেমিরিস গাড়িতে ছোেটাসের পাশে বসলেন।

কনস্ট্যানটিন ডেমিরিস হেসে বললেন–আপনাকে কেন পৃথিবীর সেরা আইনবিশারদ বলা হয় তা বুঝতে পারছি।

হ্যাঁ, নেপোলিয়ান ছোটাস গাড়ির গিয়ারে চাপ দিলেন–আমরা এখন কোথায় যাব কোস্টা?

ডেমিরিস বললেন–আমি অন্য কোথাও যেতে চাইছি।

এক কোটি ডলার আমার সাম্রাজ্য আমি আবার গড়ে তুলব। ডেমিরিস মনে মনে ভাবলেন। মুখে কিছু বললেন না। তারপর? মুখে বললেন, স্পাইরস যখন জানতে পারবে তাকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে, সে তখন আপনাকে আঘাত করার চেষ্টা করবে।

স্পাইরস আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ উনি এমন একটা কোম্পানি কিনেছেন, খাতায়কমে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

তারা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন, ডেমিরিস ছোেটাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছোটাস ভীষণ ভালোভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন।

–বাঃ, আপনি তো পাকা ড্রাইভার।

ছোটাস বললেন–এসব আপনার কাছ থেকেই শিখেছি।

তারা একটা উঁচু রাস্তার ওপর ধীরে ধীরে উঠছেন।

-কোথায় চলেছি আমরা?

পাহাড়ের মাথায় আমার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। আপনার জন্য শ্যাম্পেনের বোতল তৈরি আছে। আমি না হয় ট্যাক্সি ডেকে দেব। আপনি আবার শহরে ফিরে আসবেন। কোস্টা, অনেক কিছু ভাবনাচিন্তা করতে হবে। যা কিছু ঘটে গেছে, তার জন্য আমরা কি দায়বদ্ধ? নোয়েলের মৃত্যু, ল্যারি ডগলাসের মৃত্যু, আহা, স্টারস আমাদের কেউ কি এভাবে ভাগ্যকে মেনে নেব?

তিনি ডেমিরিসের দিকে তাকালেন। শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। ঘৃণা আর ভালোবাসা।

–আপনি সত্যি সত্যি নোয়েলেকে ভালোবাসতেন, তাই তো?

কেমন অসংলগ্ন কথা বলছেন ছোটাস। বোঝা যাচ্ছে, বিবেকের কাছে বারবার দংশিত হতে হচ্ছে তাকে।

ডেমিরিস বললেন–হ্যাঁ, এই জীবনে আমি একমাত্র নোয়েলেকেই ভালোবেসেছিলাম।

–আমিও তাকে খুব ভালোবাসতাম। ছোটাস বললেন। আপনি কি তা জানতেন?

ডেমিরিস অবাক হয়ে গেছেন না!

–আমি আপনাকে সাহায্য করেছি, তাকে হত্যা করতে, এ জন্য সবসময় নিজেকে দোষী বলে মনে হয়। কোস্টা, আপনি কি নিজেকে দায়মুক্ত করতে পেরেছেন?

না, তবে আমার কি মনে হয় জানেন, মেয়েটিকে আমরা তার প্রাপ্যের বেশি দিয়েছিলাম।

সব খেলার শেষে এটাই বোধহয় আমাদের আসল পুরস্কার। একটা কথা, কোস্টা, আপনাকে আমি বলেনি, সেই আগুনটা,...আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। ডাক্তাররা আমাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি, দেখছেন তো, ওই অগ্নিকাণ্ডই আজ আমাকে সব দিক থেকে কেমন পঙ্গু করে দিয়েছে।

উনি একটা লিভারে চাপ দিলেন। গাড়িটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আরও দূর আরও দূরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এক-একটা বাঁক, বিপজ্জনক, আরও উঁচুতে, দূরে আজিয়ান সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

-সত্যি কথা বলতে কী,...ছোটাসের কণ্ঠস্বরে তীব্রতা, আমাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, মাঝে মাঝে ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব।

উনি লিভারে চাপ দিলেন। গাড়িটা আরও গতিশীল হয়ে উঠেছে।

ডেমিরিস চিৎকার করছেন কী করছেন কী? আর একটু আস্তে করুন।

–আমি আর কতদিন বেঁচে থাকব? কতদিন? আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনি আর আমি একসঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।

ডেমিরিসের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। তিনি চিৎকার করলেন আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? গাড়িটার গতি কমান। দেখছি, আপনি একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবেন।

ছোটাস হাসলেন, শয়তানের হাসি- আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

তিনি লিভারে চাপ দিলেন। গাড়িটা ওপর দিকে উঠে গেল।

ডেমিরিস চিৎকার করছেন–আপনার অনেক টাকা আছে। আপনি কেন এভাবে মৃত্যুকে বরণ করছেন?

ছোটাসের ঠোঁটে আবার শয়তানের হাসি।

না-না, আমি খুব একটা ধনী নই। কে বলেছে, আমি ধনী? আপনার বন্ধু, সিস্টার থেরেসা, আমি সমস্ত টাকা তাকে দিয়ে দিয়েছি। মনে আছে সেই কনভেন্টের কথা, অনাথ ছেলেমেয়েদের যেখানে বড়ো করা হয়। আমি আজ কপর্দকশূন্য। আমার সব অর্থ আইওনিনাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটা অন্ধ বাঁকের সামনে গাড়িটা থমকে থেমেছে। সামনে উঁচু পাহাড়ি পথ।

–এখনই থামান। ঈশ্বরের দোহাই। ডেমিরিসের আর্তনাদ শোনা গেল। ডেমিরিস চেষ্টা করেছিলেন ছোটাসের হাত থেকে গাড়ির চাবি কেড়ে নিতে। কিন্তু পারেননি।

–আমি আপনাকে সব দেব, আপনি যা চাইছেন।

ছোটাস বললেন কেটে কেটে- যা কিছু স্বপ্ন, তা তো আমার সফল হয়েছে। আমি, আর কিছু চাইছি না।

মনে হল, গাড়িটার বুঝি দুটো পাখা গাজিয়েছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো সেটা আকাশ পথে উড়ে চলেছে। একটু বাদে? কোথায় তলিয়ে গেল সেই গাড়িটা। যান্ত্রিক শব্দ, মৃত্যুর আর্তনাদ, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে গেল সে। অনেক দূর থেকেও শোনা গেল সেই বিস্ফোরণের শব্দ। তারপর? তারপর আর কী থাকে? নাটক শেষ হয়ে গেছে। এখন সেখানে বিরাজ করছে চিরন্তন নৈঃশব্দ্য!